বিবাহ ডট কম

বনানী শিকদার

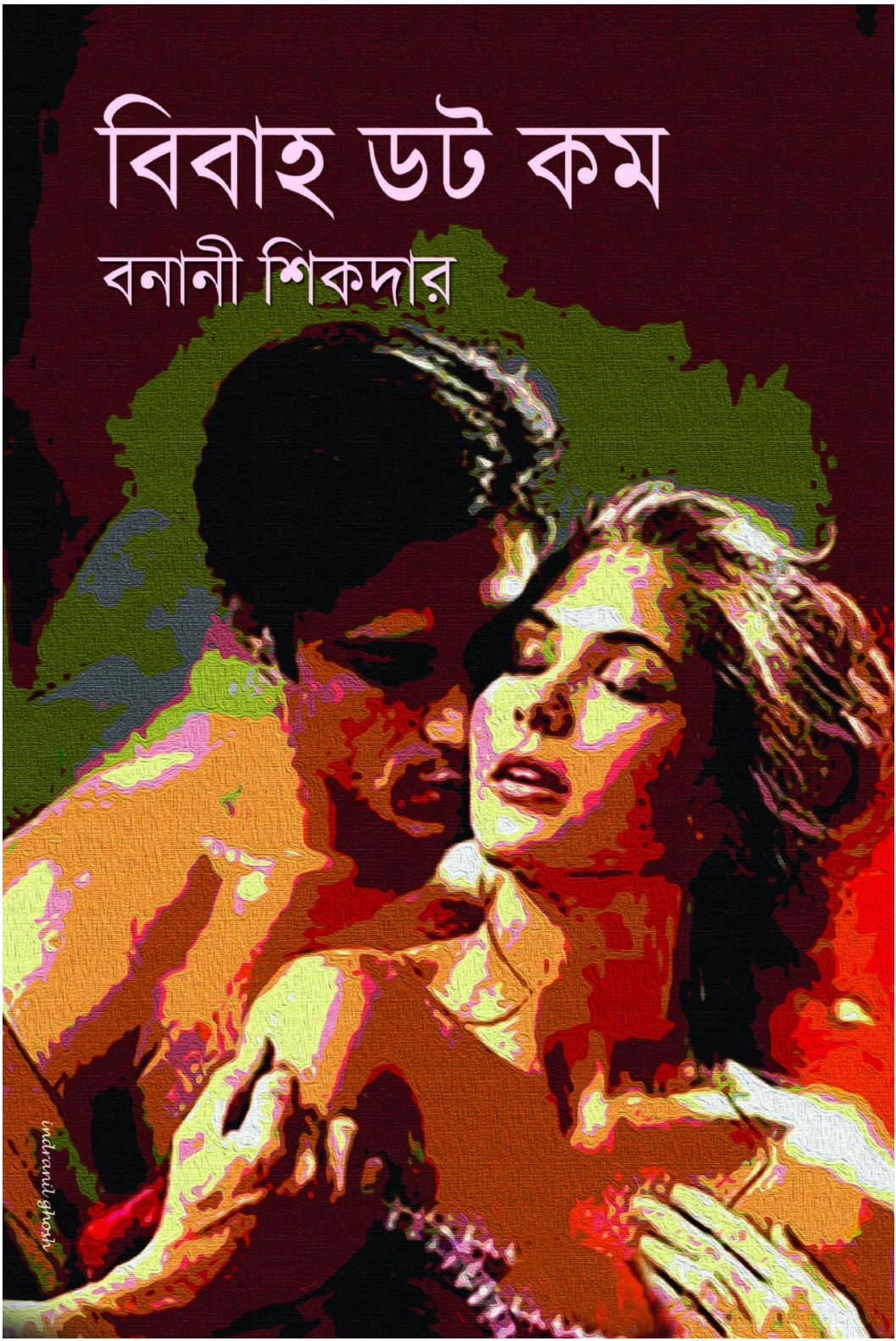

বিবাহ ডট কম

বিবাহ ডট কম

বনানী শিকদার

প্রিয়া বুক হাউস
৬৪, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

BIBAHA DOT COM
A Novel by Banani Sikdar

₹ : 250.00

গ্রন্থস্বত্ব : লেখিকা
প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা ২০২০

প্রকাশক
দুলাল চন্দ্র সিংহ
৪, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯
মোবাইল : ৯৪৩৩৩২৪৪৬৩
E-mail: priyabookhouse64@gmail.com
Website: wwwpriyabookhouse.org
ISBN : 978-93-81827-97-0

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
লেখকের অথবা স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ে (যেমন গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক, বা অন্য কোনও মাধ্যম যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় রাখার কোনও পদ্ধতি)-এর মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না অথবা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অক্ষর বিন্যাস
ড্রিম স্কেচ
২১ই ঝিল রোড, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৩১

মুদ্রক
এন. বসাক অ্যান্ড এসোসিয়েটস
৯এ, রামধন মিত্র লেন, কলকাতা -৭০০ ০০৬
প্রচ্ছদ
ইন্দ্রনীল ঘোষ

মূল্য : দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ
আমার প্রাণহর্তা প্রাণত্রাতা রাজাকে

ভূমিকা

বনানী শিকদারের উপন্যাস আমি আগেও পড়েছি। সবকটিই প্রশংসনীয়। তাঁর 'বিবাহ ডট কম' উপন্যাসটি নামের দিক থেকে যেমন অভিনব চরিত্র বর্ণনাতেও তেমনই অভিনব। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রূপা এবং সন্দীপ। বেঙ্গলি ম্যাট্রিমোনিতে তাদের পরিচয়। রূপা একটি চব্বিশ বছরের মেয়ের মা। ডিভোর্সি। সন্দীপ তেইশ বছরের মেয়ের বাবা। সে ডিভোর্সের জন্য অপেক্ষা করছে। সন্দীপ সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়েতে ই ডি পি ম্যানেজার। বছরখানেক মুম্বাই, ভুবনেশ্বর ঘুরে সে এখন কলকাতায় নতুন পোস্টে জয়েন করবে বলে ফিরে এসেছে। সন্দীপ রূপাকে বলে সে দিল্লি 'আই আই টি'র স্টুডেন্ট ছিল। রূপা সন্দীপের কাছে তার বিনম্রতা দেখায় সে সন্দীপের মতো মেধাবী নয় বলে। সন্দীপ রূপাকে খুব স্মার্ট এবং একজন সুন্দরী মহিলা বলে এবং রূপার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করে। সে জানতে পারে যে রূপা একজন লেখিকা। লেখার সূত্রে আজকাল কলকাতায় বেশি সময় সে কাটায় কিন্তু তার স্থায়ী বাসস্থান অন্য শহরে। একটা সার্জারি হওয়ায় রূপা এখন সেখানে মেয়ে রিলির কাছেই আছে। সন্দীপের সঙ্গে দেখা করার জন্য দু'মাস সময় চায় সে।

ম্যাট্রিমোনি থেকে আসা অনেকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরেকজন হল স্কুল ইনস্পেক্টর শৈবাল ঘোড়াই। লোকচোখে সম্মানীয় শৈবার ঘোড়াই রূপাকে বিয়ে করতে চান এবং তাতে রূপার অনাগ্রহ দেখে রূপার সঙ্গে অবিলম্বে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব দেন। সন্দীপও তার কাছে রূপাকে সহজ করার নানা চেষ্টা করে। ভি ডি ও কল করে তাকে বিভিন্ন খোলামেলা পোশাকে দেখতে চায়, ফ্রক পরে দেখতে চায়। রূপা আপত্তি করলে জোর করে, বোঝায় শরীরের ঊর্ধ্বাংশ দেখা গেলে কি ক্ষতি আছে! সেক্স এবং বিবাহ প্রায় সমার্থক। ভালবাসার সুর মিশিয়ে এমনভাবে যুক্তি পেশ করে সন্দীপ যে রূপা সম্মোহিত হয়ে যায়, কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভাবে সন্দীপ যা বলছে তাই-ই ঠিক। বনানী শিকদার এই উপন্যাসে জীবনের বিস্তর ঘাত-প্রতিঘাতের, উত্থান-পতনের মধ্যে যেসব চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন তা আমাদের প্রাত্যহিক জীবন থেকে উঠে আসা। প্রত্যেক পাঠকের ভালো লাগবে। কাহিনী নিখুঁতভাবে এগিয়ে চলেছে। এ যেন আপনার নিজের কথা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

লেখাপড়া করে চাকুরিক্ষেত্রে বড় পোস্টে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেও জীবন আমাদের অসম্পূর্ণ মনে হয়, কঠিন হয়ে যায় দু'পা ফেলা যদি চলার পথে ভালবাসার সঙ্গী না পাই। তাই আমরা প্রণয়ের সম্পর্কে বাঁধা পড়ি। বিয়ে করে স্থাপন করি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। ছোটবেলায় জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই মানুষ এই সত্যটাকে মনের মধ্যে গেঁথে বড় হয় যে মা-বাবা, ভাইবোন এবং আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তাদের আমৃত্যু রক্তের সম্পর্ক। কোন রাগ-বিদ্বেষ, ভুল বোঝাবুঝি সম্পর্ককে মেরে ফেলতে পারে না। কোন অবস্থাতেই মা-বাবা, ভাইবোন, সন্তান-সন্ততিকে তারা নতুন লোক দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে পারে না। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তেমন নয়। স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে বোঝাপড়া এবং বিশ্বাস ছাড়াও শারীরিক সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য অবস্থান থাকে। কোন উপাদানের মৌলিকতা নষ্ট হলে অথবা একজনকে হারালে অনেকেই শুরু করে দেয় নতুন সঙ্গীর সন্ধান। শরণাপন্ন হয় বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার যেমন শাদি ডট কম, ভারত ম্যাট্রিমোনি, জীবনসাথী ইত্যাদি। সুতরাং শাদি ডট কম, ভারত ম্যাট্রিমোনি বা জীবনসাথী শুধুমাত্র অল্পবয়সি যুবক যুবতীর জন্যই নয় উপরন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত সকলের জন্য। সেসব জায়গাতে নাম নথিভুক্ত করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগত প্রমাণপত্রের প্রয়োজন হয় না।

উপন্যাসটিকে কাল্পনিক উপন্যাসের রূপ দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হল না। জীবনের এক টুকরো হয়ে বাস্তব সীমানার ধার ঘেঁষেই থেকে গেল উপন্যাস। উপন্যাসের প্রধান পুরুষ এবং প্রধান নারী চরিত্র থেকে শুরু করে আরও অনেক চরিত্রই বাস্তব থেকে উঠে এসেছে। অনেক চরিত্রগুলির মধ্যে বেশিরভাগই আমার বন্ধুবান্ধব। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ আমাকে তাদের নিয়ে লেখার স্বাধীনতা দিয়েছে বলে। বস্তুত তারাই আমাকে উৎসাহ দিয়েছে লেখার। উৎসাহ দেওয়ার সবথেকে বেশি কৃতিত্ব দাবি করে আমার ইন্দোরের বান্ধবী অপর্ণা এবং পুনের বান্ধবী সুনন্দা ও জবা। আমি ধন্য তাদের মতো বান্ধবী পেয়ে। তারা আমার সুখে নিজেদের দুঃখ ভুলে যায়। আমার দুঃখেও দুঃখ ভুলে যায় তারা। তাদের কাছ থেকে এর চেয়ে বড় পাওয়া আমার আর কি হতে পারে!

বনানী শিকদার

৯

মে মাসের সাত তারিখের সেই সকালে—তখনও আমার চোখ সম্পূর্ণ খুলে গিয়ে সতেজ হয়নি, তখনও আলস্যের জড়তায় আবিষ্ট হয়ে আছে আমার সারা শরীর, তবু জোর করে মোবাইল ডেটা অন করি। ডেটা অন করার সঙ্গে সঙ্গে অর্ধনিমীলিত চোখে দেখি পিং প্যাং আওয়াজ করে কিছু মেসেজ হোয়াটসঅ্যাপে ঢুকে পড়েছে। সবার উপরের মেজেসটি ছিল এরকম—হেলো, আমি এস রায়, বেঙ্গলি ম্যাট্রিমোনিতে প্রোফাইল দেখে আপনার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী হয়েছি। আপনি কি আমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক?"

উত্তর টাইপ করি, ''হ্যাঁ।"

''কখন?"

''এখন।"

এক মিনিটের মধ্যেই ভদ্রলোক ফোন করেন। জিজ্ঞেস করি, ''আপনার পুরো নাম?"

''সন্দীপ রায়।"

''দেখুন সন্দীপ, আমি এখানে বিয়ের একান্ত ইচ্ছে নিয়ে তো আই ডি খুলিনি..."

''তাহলে?"

বেঙ্গলি ম্যাট্রিমোনির সাইটে আমি আমার নাম রেজিস্ট্রি করিয়েছিলাম দুটো কারণে। প্রথমত, সেখানে কি ধরনের লোক আসে এবং তাদের বেশিরভাগের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তা জানার জন্য। কারণ আমি অনেক লোকজনকেই বলতে শুনেছি ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটগুলো একদম ভালো না। সেখানে যতসব বাজে বাজে লোক বিয়ের নাম করে মেয়েদের সঙ্গে উল্টোপাল্টা চ্যাট করতে যায়। দ্বিতীয়ত, যদি কিছু আশ্চর্যজনক ঘটনা আমার জীবনে ঘটে। আমি খুঁজে বেড়াব না। কিন্তু অনেক পুরুষ যারা অনেক বছর একা হেঁটে হেঁটে হয়ে পড়েছে অসম্ভব ক্লান্ত, একা থেকে থেকে হয়ে পড়েছে ভয়ানক নিঃসঙ্গ, যারা আর না পেরে ঝেড়ে ফেলতে চায় শরীরের সমস্ত অবসাদ, বেরিয়ে আসতে চায় একাকীত্বের ঘুটঘুটে অন্ধকার থেকে, মনের মতো এক সঙ্গীর হাত ধরে জীবনের বাকি বছরগুলোতে রঙিন পথে টুকটুক করে চলে ছুঁয়ে ফেলতে চায় দিগন্তের নীলাকাশ, তারা তো খুঁজে বেড়াতে পারে 'আমি মহিলা'র মতো মহিলাকে!

বলি, ''তাহলে...মানে ভালো কাউকে পেলে বিয়ে করব না এমনও নয়। কিন্তু তেমন লোক পাওয়ার স্বপ্ন না রাখাই উচিত।"

''কেন?"

আমি একজন শিক্ষিত, সৎ, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, সহানুভূতিপ্রবণ, ভদ্র-সভ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং অসম্ভব মেনে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে এমন একজন পুরুষ চাই। কিন্তু..."

''কিন্তু কি?''

''দেখছি তো লোকজনকে। বিয়ের ইচ্ছে কম, অন্য ইচ্ছে বেশি। বয়স বাড়ছে। এখন এমনিতেই... মানে বিয়ে হলেও নিজেকে সেভাবে প্রেজেন্ট করতে ইচ্ছে করবে না।''

''দেখুন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক তো থাকবেই। সেটা যেই বয়সেই হোক না কেন। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ আগেভাগেই সেক্স নিয়ে কথা বলতে শুরু করে তাহলে বুঝতে হবে তার উদ্দেশ্য ঠিক নয়।''

''আপনি কোথায় চাকরি করেন?''

''ইন্ডিয়ান রেলে আছি। আমি আমার 'আই ডি'টা বলছি, আপনি আরেকবার চেক করে নিতে পারেন।''

''আমি আই ডি দেখে চেক করতে পারি না। সরি।'' ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটে কি করে কি করতে হয় সে ব্যাপারে পারদর্শিতা না থাকার লজ্জা না রেখে বলি, ''আপনি আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলে ভালো হয়।''

''বলুন।''

''আপনার ম্যারিটাল স্টেটাস?''

''ডিভোর্সের জন্য অপেক্ষা করছি।''

''ছেলেমেয়ে?''

''একটি মেয়ে। মায়ের সঙ্গে থাকে।''

''কত বড় সে?''

''যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করছে।''

''আপনার স্যালারি কত?''

''আমি দিল্লি আই আই টি থেকে পাশ করেছি। সওয়া দু'লাখ মতো মাইনে পাই। সেখান থেকে ওয়াইফকে প্রতি মাসে কিছু দিতে হয়...কোর্ট বলেছে দিতে।''

''কোর্ট কেন দিতে বলেছে? আপনাদের কি সেটলমেন্ট হয়ে গেছে?''

''না, না, যতদিন সেটলমেন্ট না হয়েছে ততদিন...কি যেন বলে ওটাকে...''

''ইন্টেরিম অর্ডার?''

''হ্যাঁ হ্যাঁ, ইন্টেরিম অর্ডার।''

''ওয়াইফ কি অ্যালিমনি চেয়েছেন?''

''ওকে মনে হয় একটা ফ্ল্যাট দিতে হবে...''

''ওয়ান-টাইম অ্যালিমনি?''

''হ্যাঁ। তারপরে ওর প্রতি আমার আর কোন দায়িত্ব থাকবে না...''

''কিন্তু আপনার মেয়ে? বাবা হিসেবে মেয়ের প্রতি আপনার দুর্বলতা থাকাটা খুবই স্বাভাবিক তাই না?'' আমার প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক হ্যাঁ এবং না এর মাঝখানে ঝুলে থাকেন। উত্তর দিতে পারেন না। তাই আমিই বলি, ''ডিভোর্সের পরে আপনার সেকেন্ড ওয়াইফ এবং মেয়ের প্রতি আপনার দায়িত্ব ভাগ হয়ে যাবে তাই তো?'' এবারও উনি হ্যাঁ এবং না এর মাঝখানে ঝোলেন। স্পষ্ট করে বোঝাতে অক্ষম হন মেয়ের প্রতি উনি কতটা দুর্বলতা রাখেন। আমার বিবেক বলে দ্বিতীয় বিয়ে করলেও

মেয়েকে অর্থনৈতিক দিক থেকে বঞ্চিত করা ঠিক হবে না। আমি নিজেও একটি সমবয়সি মেয়ের মা। মায়ের অনুভূতি দিয়ে এক বাবার অনুভূতিকে না বোঝার তো কিছু নেই।

জিজ্ঞেস করি, ''আপনি কোথায় থাকেন?''

''কলকাতাতেই। আনোয়ার শাহ্ রোডের কাছে আমার একটা ছোট ফ্ল্যাট আছে।''

''এই ফ্ল্যাটটাই আপনি ওয়াইফকে দিয়ে দেওয়ার কথা বলছিলেন বুঝি?''

''হ্যাঁ।''

''তারপরে আপনি কোথায় যাবেন? আপনার কি অন্য কোন থাকার জায়গা আছে?''

''না।''

ডিভোর্সের কেস কিভাবে ফাইল করা হয়েছে আমার তা জানা নেই। শর্ত বুঝে, সমস্যা বুঝে কোর্ট কি ডিক্রি দিতে পারে তার কোন অনুমানও লাগানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি এই মুহূর্তে একেবারেই অন্ধকারে ডুবে আছি। জানতে চাই, ব্যাংক ব্যালান্স কেমন আছে আপনার?''

''বিশেষ কিছু নেই''

বেঙ্গলি ম্যাট্রিমোনি থেকে পাওয়া এই লোকটির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে বাঁধা পড়তে পারি কি পারি না সে ভাবনাকে অনেক দূরে রেখে আমি শুধুমাত্র লোকটিকে অনুভব করার চেষ্টা করছি। বোঝানোর চেষ্টা করছি, ''মানুষ তো ভালভাবে বাঁচার জন্য ভালো চাকরি করে, অথবা ভালো চাকরি করে ভালভাবে বাঁচতে চায়...তাই না?''

''ভালভাবে বাঁচা বলতে আপনি কি বোঝেন? আপনার আগে আমি একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। সে বলেছে তার প্রতি মাসে চল্লিশ হাজার টাকা হাতখরচা চাই।''

''এসব ফালতু কথা। আমি সেরকম কিছু বলতে চাইছি না। আমার এমন কোন চাহিদা নেই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে টাকাপয়সা ভাগ করে দিয়ে সংসার চলে না। সংসার পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝে তাদের সামাল দিতে দিতে এগিয়ে চলে। ভালভাবে বাঁচা বলতে আমি বলতে চেয়েছি অন্ততপক্ষে একটা থাকার জায়গা...সেটা এক বেডরুম ফ্ল্যাট হলেও চলবে, খাওয়া-পরার জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং একটা গাড়ি...''

''ডিপেন্ড করে। আমি আমার বাড়ি থেকে সাউথ সিটি পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারি...তার জন্য বাস, ট্যাক্সি বা রিকশার দরকার পড়ে না।''

''দেখুন, কোনকিছু করার জন্য বিশেষ এজ এবং বিশেষ স্টেজ থাকে। কলকাতাতে আমাকেও হেঁটে, অটোরিকশা করে, সাইকেল রিকশা করে, বাসে করে বেড়াতে হয়। কিন্তু সত্যি বলতে কি সবসময় বাধ্য হতে ভালো লাগে না। এতদিন তো করেছি। এখন এই বয়সে অটোতে চড়ো রে, নেমে মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত হাঁটো রে, সিঁড়ি দিয়ে নামো রে, ওঠো রে, দৌড়ঝাঁপ করে ট্রেনে উঠে ভিড়ের মধ্যে চ্যাপ্টা হয়ে দাঁড়াও রে, ট্রেন থেকে নেমে আবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠো রে, হাঁটো রে...বড্ড কষ্টকর মনে হয়।''

''সত্যি কথা। এই জন্যই আমি সাধারণত মেট্রোকে এড়িয়ে চলি।''

''নিজের গাড়ির মতো একটা বিকল্প থাকা উচিত।''

ভদ্রলোক বলেন, ''গাড়ি একটা কেনা যেতেই পারে। কিন্তু অডি ফডি চাইলে মুশকিল।''

''অডির দরকার নেই। কয়েকমাস আগে আমার দাদা বি এম ডব্লু কিনেছে,'' আমি হাসি। ''আমার একটা স্যান্ট্রো হলেই চলবে। তাছাড়া...''

''তাছাড়া কি?''

''ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য ব্যাংক ব্যালান্সও তো দরকার।''

''ভবিষ্যতের নিরাপত্তা বলতে?''

''এই যেমন অসুখবিসুখ। চাকরি তো আর সারাজীবন থাকবে না, তাই না?''

''অসুখবিসুখের জন্য মেডিক্যাল ইনসিওরেন্স আছে। আমি হিসেব করে দেখেছি রিটায়ারমন্টের পরে দেড় লাখ টাকা পেনশন পাব। তাতে আমার ভালমতই চলে যাবে।''

ভদ্রলোক আমাকে তাঁর আয়-ব্যয়-সঞ্চয়ের হিসেব দেন। নিজে থেকেই। বলেন, ''আমার দু'লাখ স্যালারি থেকে পঞ্চাশ হাজার ওয়াইফ নেয়, পঞ্চাশ হাজার ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয়, পঞ্চাশ হাজার নিজের খরচার জন্য রাখি এবং বাকি পঞ্চাশ হাজার 'পি এফ'-এ জমা করি।

''আপনি আপনার ওয়াইফ থেকে ডিভোর্স কেন চাইছেন?''

''আমরা গত দশ বছর ধরে আলাদাই আছি। আমাদের মধ্যে আসলে প্রথম থেকেই কোন বন্ধন তৈরি হয়নি। আমি তার সঙ্গে আমার কোন ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারিনি।''

''কেন?''

''সে করতে পারত না। আগ্রহও নিত না। হয়ত তার পক্ষে এটা সম্ভবও ছিল না। জিওগ্রাফি নিয়ে এম এ করেছিল বটে কিন্তু বইয়ের বিদ্যের বাইরে আর কোন বিদ্যে ছিল না।''

''আপনার কি লাভ ম্যারেজ ছিল নাকি সোশ্যাল ম্যারেজ?''

''সোশ্যাল ম্যারেজ। আমার বিয়ের কথা শুনলে আপনি আমাকে অনেক বোকা ভাববেন। মা-বাবা ঠিক করেছিলেন। আমি মেয়ে না দেখেই সোজা ছাঁদনাতলায় বসে পড়েছিলাম।''

''বইয়ের বিদ্যেও কিন্তু অনেক বিদ্যে জানেন? এই দেখুন না বাইরের অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান রাখতে গিয়ে 'এম এস সি'তে কি পড়েছিলাম আমি ভুলে গেছি। ভাবলে খুব খারাপ লাগে।''

''এটা একটা সামান্য ব্যাপার। আমিও আমার 'আই আই টি'র বিদ্যে ভুলে বসে আছি। দু'দিন বই নিয়ে বসলেই আবার সব মনে পড়বে।''

আমাদের প্রাথমিক কথাবার্তার পালা শেষ হয়। ভদ্রলোকের একটি কথা আমার কানে খুব বাজতে থাকে—আমি দিল্লি আই আই টি থেকে পাশ করেছি। কথা কানে বেজে বলে, ''রূপা বিশ্বাস, তুমি তো একজন অতি সাধারণ মহিলা। তোমার বিদ্যেবুদ্ধি

একদমই হার মেনে যাবে এঁর কাছে।" ছোটবেলা থেকে নিজের বাড়িতে অনেক বিদ্বান-বুদ্ধিমান দেখে এসেছি, হয়ত আমি নিজেও এতটাও গোবেচারা নই, লোকজন আমার কি দেখে জানি না, আমাকে অনেক বুদ্ধিমতী বলে, বলে আমি ভূগোল-বিজ্ঞান-আইন-রাজনীতির অনেকটাই বুঝি, তবু আত্মবিশ্বাসের অভাব। আমার সততা এবং কোমলতা আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দুটো জিনিস আমার শরীর-মন দিয়ে তৈরি পার্থিব অস্তিত্বের বাইরে একটা বোকামির আস্তরণ তৈরি করেছে। যারা অনেকটা আমার মতো তারা সেই আস্তরণের ভেতরের আমাকে দেখতে পায়, অতিরিক্ত চালাক চতুর এবং অতিরিক্ত বোকা লোকজন আস্তরণের বাইরে থেকেই ফেরত চলে যায়।

কয়েকদিন হল বেঙ্গলি ম্যাট্রিমোনিতেই আলাপ হওয়া একটি লোকের দ্বারা খুব বিরক্ত হচ্ছিলাম। সঞ্জয় ব্যানার্জি তার নাম। নবি মুম্বাইতে থাকে। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্টার। তার বক্তব্য, আমি এখন পুনেতে আছি তো ম্যাট্রিমোনিয়াল প্রোফাইলে প্লেস অফ রেসিডেন্স কলকাতা কেন দেওয়া হয়েছে? বলেছিলাম, আজকাল বেশি কলকাতায় থাকছি তাই। উত্তর লোকটির পছন্দ হয়নি। তার আরেক প্রশ্ন—পুনেতে আমি মেয়ের সঙ্গে আছি, তাহলে ম্যাট্রিমোনিয়াল প্রোফাইলে কেন বলা হয়েছে যে মেয়ে আলাদা থাকে? উত্তর তো সেই একটাই—পুনেতে আছি বলেই মেয়ে সঙ্গে রয়েছে, কলকাতায় আমি একাই থাকি। এবারও সে বোঝে না, নানাভাবে মেসেজ করে, ফোন করে বিদ্রূপ করে না হলে ভয় দেখায় ভুল খবর দিয়েছি বলে। শেষে একদিন মনে একগাদা সাহস সঞ্চয় করে লোকটির বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে পড়ি। বলি, ''দেখুন আপনি একজন রিপোর্টার হয়ে একজন মহিলাকে অকারণে বিব্রত করছেন। পুনের ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর আমার বন্ধু। তাকে দিয়ে মুম্বাইয়ের এডিশনে আমি আপনাকে নিয়ে খবর ছাপব। আপনার ফটো সমেত।"

লোকটি কোন উত্তর দেয় না। আমার সাহস বেড়ে যায়। লিখি, ''নিশ্চয় জানেন মুম্বাইতে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সার্কুলেশন খুব কম নয়। সুতরাং ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের মাধ্যমে পুরো টাইমস গ্রুপ জানবে।"

কোন উত্তর নেই।

আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়ের সোর্স প্রসঙ্গে বেঙ্গলি ম্যাট্রিমোনির নামও আসবে।

কোন উত্তর নেই।

''বেঙ্গলি ম্যাট্রিমোনি হল ভারত ম্যাট্রিমোনির একটা অংশ।"

কোন উত্তর নেই।

''ভারত ম্যাট্রিমোনির সঙ্গে টাইমস গ্রুপের রিপোর্টার জুড়ে গিয়ে ভালোই খবর তৈরি হবে বলুন?"

কোন উত্তর নেই।

''কালকেই বের করি?"

উত্তর নেই।

''প্রেসে চলে গেছে কিন্তু নিউজ।"

উত্তর নেই। একেবারে চুপ হয়ে গেল লোকটি।

ফোনে কথাশেষে সন্দীপ রায়কে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করি, ''আপনার সঙ্গে কথা বলে বেশ লাগল।'' বস্তুত টাইমস অফ ইন্ডিয়ার লোকটির সঙ্গে এমন কুৎসিত অভিজ্ঞতার পরে তাকে অনেকখানি সহনীয় বলে মনে হয়েছে।

''ধন্যবাদ। আমারও ভালো লেগেছে।''

''সত্যি?''

''সত্যি। আপনার কথা বলার স্টাইলটা খুব সুন্দর।''

''জেনে খুশি হলাম। আপনার জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল।''

সন্দীপ আমায় থাম্বস আপ পাঠায়।

''আপনি 'আই আই টি'র স্টুডেন্ট ছিলেন। আমি যে আপনার মতো মেধাবী নই?''

''আমিও মেধাবী নই। কিন্তু আপনি খুব স্মার্ট এবং একজন ভালো মহিলা। আপনি অন্ততপক্ষে আমার এডুকেশনকে সম্মান দিয়েছেন। একজন তো বলেছিলেন আই আই টি-ফাই আই টি আমি বুঝি না। আপনার স্যালারি কত বলুন।''

''আমিও তো আপনার স্যালারি জিজ্ঞেস করেছি।''

''না, আপনাকে দুটো লাইন একসঙ্গে পড়তে হবে—আই আই টি-ফাই আই টি আমি বুঝি না এবং আপনার স্যালারি কত। স্যালারি অবশ্যই জানা দরকার। কেননা মানুষের উপার্জন থেকে অনেককিছুর অনুমান লাগানো যায়। তাই বলে ওইভাবে নয় যেভাবে উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন।''

''আমি কিন্তু কোনওরকমে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করেছি।''

''কি বিষয়ে—সাইকোলজিতে নাকি ফিলসফিতে?''

''অল্পমেধাবী স্টুডেন্টরা সাধারণত এই দুটো বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে। হা হা হা। আমার বিষয় ছিল জার্নালিজম এবং জুওলজি।''

''বিষয়গুলো সম্পর্কে আমার বিশেষ ধারণা নেই।'' সে লেখে, ''ইউ হ্যাভ এ গ্রেট ভয়েস।''

ফোনে প্রথম কথার পরে আমাদের প্রথম মেসেজের পালা শেষ হয়। সন্দীপ আমাকে তার বেশ কয়েকটি ফটো পাঠায়—তার একার ফটো, দিদির সঙ্গে তোলা ফটো, দিদির গৃহপ্রবেশে আরও অন্যান্যদের সঙ্গে তোলা ফটো। ফটো দেখে লিখি, ''ভালো। কিন্তু আমি কারও চেহারা নিয়ে মোটেই উদবিগ্ন নই এবং এটা প্রোফাইলে স্পষ্ট করে উল্লেখও করেছি।''

সন্দীপ আবার থাম্বস আপ পাঠায়। তারপর সে যেটা করে তা হল আমার হোয়াটসআপ ডিসপ্লে পিকচার ডাউনলোড করে মুখের তরিফ। ''আপনি দেখতে খুব সুন্দর।''

''একসময় ছিলাম। মানুষের চেহারাকে এত গুরুত্ব না দিয়ে তার গুণগুলোকে দেখা উচিত।''

সন্দীপ আমার বিচার বিবেচনাকে সযত্নে এড়িয়ে চলে। লেখে, ''নিয়মিত জিমে যান?''

''না, ঘরে আমার মেয়ের ট্রেডমিল এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি আছে।''

''চেহারা খুব মেন্টেন করেছেন।''

''আপনার মতো মেয়েরাও যদি ছেলেদের চেহারাকে এত গুরুত্ব দেয় তাহলে অনেক মেয়েই কিন্তু আপনাকে পছন্দ করবে না।''

''আমি সুন্দর জিনিসের প্রশংসা করি। ধরুন কোন মেয়ে আমার চেহারাকে পছন্দ না করেও আমার সঙ্গে রইল, সেটা বরং আমার কাছে বেশি অস্বস্তিকর ব্যাপার হবে। ফোনে কথা বলার সময় আমি আপনাকে আরও ভালো করে বুঝিয়ে দেব।''

''ছাড়ুন এসব কথা। আপনি আমার বই পড়ুন।''

সন্দীপকে আমি বলিনি যে আমি বই লিখি। বই মানে উপন্যাস। তাই সে আমার কথা বুঝতে পারে না। ওকে জানাই বেঙ্গলি ম্যাট্রিমোনিতে যে নাম দিয়েছি সেটা আমার অফিশিয়াল নাম নয়। সে আমার লেখা বইয়ের নাম জানতে চায় এবং আমি তা বলতে চেয়েও যেন বলতে চাই না। পরে জানাবো বলে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু সন্দীপ থামে না। সকালে দাঁত ব্রাশের মাঝে, ব্রেকফাস্টের মাঝে এবং তারপর লেখার মাঝে আমি তার মেসেজ পেতে থাকি। আমার লেখার গতি কমে আসে। হাতের আঙ্গুল ল্যাপটপের কি প্যাড থেকে উঠে গিয়ে মোবাইলের কি প্যাডে বিচরণ করতে থাকে। সে আমাকে আমার কাজ করতে দেবে না মনে হচ্ছে। ওকে একটা গানের লিঙ্ক পাঠাই।

''মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে
স্মৃতি যেন আমার এ হৃদয়ে বেদনার রঙে রঙে ছবি আঁকে।''

বলি, ''বরং এই গানটি শুনুন। শুনে হতেই পারে যে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে গেল। নতুন করে নতুন রঙে আবার শুরু হল আপনাদের বৈবাহিক জীবন।''

''তার কোন সম্ভাবনা নেই।''

''পিপাসা যখন।''

উত্তরে অনেকগুলো প্রশ্নবোধক চিহ্ন পাঠায় সে।

''আমার লেখা বই।''

''আচ্ছা। কিন্তু আমি অনেক বছর কোন বাংলা বই পড়িনি।''

''তাহলে তো আমাকে নিয়ে জানা যাবে না।''

''আপনি আপনাকে নিয়ে বলবেন। আমি শুনব।''

সন্দীপ আমাকে বলেছে যে সে তার চাকরিজীবনের প্রায় সবটাই কলকাতাতেই কাটিয়েছে। গত একবছর শুধু কলকাতার বাইরে থাকতে হয়েছে ওকে। সেই এক বছর সময় মুম্বাই এবং ভুবনেশ্বরে ভাগ হয়ে গেছে। মাত্র কয়েকদিন আগে সে ভুবনেশ্বর থেকে কলকাতায় ফিরেছে। এখন ঘরে বসে বসে অপেক্ষা করছে জয়েনিং-এর ডেট-এর। আগে ছিল ইডিপি ডিপার্টমেন্টে। এখন কোন ডিপার্টমেন্টে পোস্টিং হবে জানে না। আমার মনে পড়ে আমিও মাস তিনেক আগে কয়েকদিনের জন্য ভুবনেশ্বরে গিয়েছিলাম। একটি ফিল্ম ফেস্টিভাল অ্যাটেন্ড করতে। কথাটা আমি সন্দীপকে মেসেজে না জানিয়ে থাকতে পারি না। কিন্তু সে ইতিমধ্যেই আমাকে বলা কিছু কিছু কথা

ভুলে বসে আছে। জিজ্ঞেস করে, ''আমি কি আপনাকে বলেছিলাম যে আমি ভুবনেশ্বরে ছিলাম?''

''অফ কোর্স!''

রাতে অনিন্দিতাকে ফোন করি, ''তোকে একটা কথা বলার ছিল।''

''বলে ফেল।''

''আজ একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে।''

''বাঙালি না অবাঙালি?''

''বাঙালি।''

''কি করে হল? ফেসবুকে?''

''না...''

''তবে?''

''ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটে।''

''আরে বাহ্! তুই ওখানে তোর আই ডি খুলেছিস আর সে তোকে খপাৎ করে ধরে ফেলেছে?''

''না, সে বলেছে আমিই নাকি ইন্টারেস্ট দেখিয়েছিলাম।''

''মিথ্যে কথা...''

''কথাটা একেবারে মিথ্যে নাও হতে পারে। আমি যে সেখানে একদমই কাউকে নক করিনি তা নয়। তবে ক'জনকে করেছি, কি দেখে করেছি তার বিশেষ হিসেব আমার কাছে নেই।''

''কি করে খুলতে হয় রে আই ডি?''

''টাকা দিয়ে। আরে শোন না...''

''আমি যে দেখছিলাম ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটে ফ্রী রেজিস্ট্রেশনের অপশন আছে!''

অনিন্দিতা আমাকে আসল কথা বলতেই দিচ্ছে না। বুঝতে পারছি ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইট নিয়ে কৌতূহল পুরো প্রশমিত না করা পর্যন্ত সে আমাকে রেহাই দেবে না।

বলি, ''ওটা একটা ট্র্যাপ। আমিও তাই দেখেছিলাম। পরে সব ডেটা ভরে দেখি টাকা না দিলে রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে না। ভেবেছিলাম, যা খুলবই না আই ডি। কিন্তু বারবার ভিখারির মতো ফোন করে ওরা মাথা খারাপ করে দিচ্ছিল। শেষে চার হাজার তিনশো টাকা দিয়ে ক্লাসিক মেম্বারশিপ নিয়েছি।''

''কতদিনের জন্য?''

''তিন মাস।''

''আমাকে শিখিয়ে দিস। ভাবছি আমিও মেম্বারশিপ নেব।''

''আরে আগে ডিভোর্স তো দে অনিন্দিতা।''

''হা হা হা। আচ্ছা বল। কি হল বাঙালিটার সঙ্গে?''

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যত কথা সন্দীপের সঙ্গে হয়েছে তার সব আমি অনিন্দিতাকে বলি। অনিন্দিতা মন দিয়ে শুনে মন্তব্য রাখে, ''মনে হচ্ছে মালটার তোকে খুব পছন্দ হয়েছে। কলকাতায় তার কত বেডরুমের ফ্ল্যাট আছে রে?''

১৭

''জানি না। বলল তো ছোট ফ্ল্যাট...এক বেডরুমের হবে।''

''ভিডিও কল করে দেখি নিলি না কেন?''

''ছাড় না। ফ্ল্যাট ছোট বা বড়তে কি এসে যায়!''

সত্যিই বাসস্থান ছোট বা বড়তে আমার কিছু এসে যায় না। পুনেতে আমারই একাধিক ফ্ল্যাট আছে। একটিতে নিজে থাকি, অন্যগুলোতে ভাড়াটে। ভাড়া থেকে কিছু উপার্জন হয়। আজ থেকে বছর আটেক আগে আমি রাজার থেকে ডিভোর্স নিয়েছি। ডিভোর্স নিলেও সে আমাকে শর্তহীনভাবে মাসে মাসে অনেক টাকাই পাঠিয়ে দেয়। এছাড়া আমার নিজেরও ছোটখাটো বিজনেস রয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে প্রতি মাসে অন্ততপক্ষে আড়াই থেকে তিন লাখ টাকা আমার অ্যাকাউন্টে ঢুকে পড়ছে।

অনিন্দিতা বলে, ''ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমার কিন্তু আরেকটা কথা পুরো ঢপের চপের মতো লাগছে।''

''কি?''

''সে তোকে বলেছে প্রতি মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা ইনকাম ট্যাক্স ভরে? দু'লাখ টাকার এত ইনকাম ট্যাক্স হয় না। ভালো করে জেনে নিস ব্যাপারটা।''

''আমারও তাই মনে হয়েছিল। ঠিক আছে পরে কখনো জিজ্ঞেস করব।''

অনিন্দিতার সঙ্গে কথা শেষ করে বিছানায় যাই। রাত এগারোটা। রিলি ঘুমিয়ে পড়েছে। রিলি আমার মেয়ে। কাল ওর মর্নিং শিফট। ভোর পাঁচটায় কম্পানির গাড়ি নিতে আসবে। যদিও আমি ওর জন্য ব্রেকফাস্ট, টিফিন বানানোর কোন ঝঞ্ঝাট রাখি না—সামান্য কিছু ফল খেয়ে বেরিয়ে যাবে সে, সামান্য কিছু ফল সঙ্গে নিয়ে যাবে, তারপর কম্পানির ক্যান্টিনে গিয়ে সাবসিডাইসড রেটে স্যান্ডউইচ কিংবা ওট মিল নেবে, তবু—তবু ওর অফিস যাওয়ার প্রস্তুতিতে ঘুম তো ভেঙে যায়-ই। মনে কোন উত্তেজনা থাকলে, সে দুঃখজনিত উত্তেজনাই হোক আর আনন্দজনিত সেই ভাঙা ঘুম আর জোড়া লাগে না। পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়ার অস্বস্তি নিয়ে কাটাতে হয় দিন। সুতরাং আর দেরি না করে আমার ঘুমিয়ে পড়া দরকার। কিন্তু ঘুমকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না। হারিয়ে গেছে ঘুম নানা চিন্তার চাপে। অস্বাভাবিকভাবে আমার এখনকার চিন্তাগুলো সন্দীপ রায়কে নিয়ে নয়। আমার চিন্তা অনিন্দিতাকে নিয়ে। আমাকে এখন অনিন্দিতার সঙ্গে পুরনো কিছু স্মৃতি পেয়ে বসেছে। ভাবছি তার কথা।

অনিন্দিতার সঙ্গে পরিচয়টা যে কি করে হয়েছিল তা আমার ঠিক মনে পড়ছে না। হয়ত ভুলে যেতাম না। ভুলেছি, কারণ গত চৌদ্দ বছর তার সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ ছিল না। কথাবার্তা ছিল না। মাত্র চার মাস আগে অনিন্দিতা আমার ফেসবুক টাইমলাইনে এসে আমার লেখার প্রশংসা করেছিল, ''লেখার অভ্যেসটা এখনও রেখেছ দেখছি।'' সঙ্গে সঙ্গে ওকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিলাম। সে অ্যাক্সেপ্ট করেছিল। অনিন্দিতার ইনবক্সে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ''কথা বলবে?''

সে লিখেছিল, ''হ্যাঁ।'' আমি ওকে আমার মোবাইল নম্বর দিয়েছিলাম। তার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পেয়েছিলাম কল।

অনিন্দিতা আগে পুনেতে ছিল। এখন বিলাসপুরে থাকে। আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করেই সে বিলাসপুরে গেছে। কথা বন্ধ করার কারণটাও বেশ আজগুবি—বাচ্চাদের ঝগড়া। পুনের প্রণয়রাজ অ্যাপার্টমেন্টে আমার এক বেডরুমের ফ্ল্যাটে অনিন্দিতা ভালোই আসা যাওয়া শুরু করেছিল। কখনো একা, কখনো তার বছর চারেকের মেয়ে রিভুকে নিয়ে আবার কখনো স্বামী-কন্যাসহ। আমার মেয়ে রিলির বয়স তখন আট।

অনিন্দিতারা এক বোন এক ভাই। বাবা বিহারের হাজারিবাগ জেলায় কোল ইন্ডিয়াতে চিফ সার্ভে অফিসারের পদে চাকরি করতেন। সউন্দা কোলিয়ারিতে। হাজারিবাগ মিশন স্কুল থেকে সে ক্লাস টেন-এর বোর্ডের পরীক্ষায় পাশ করে। তারপর রাঁচি উইমেন'স কলেজ থেকে ইকনোমিক্স অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েশন করে। মা-বাবা মেয়েকে আর না পড়িয়ে গ্রাজুয়েশনের বছর দেড়েকের মধ্যে তার বিয়ে দিয়ে দেন। বাইরে থেকে আসা চাকুরিরত লোকজনের বসবাস থাকায় কোল ইন্ডিয়ার পরিবেশে গ্রাম্য কৃষ্টি অনেকটা কম ছিল। তাই অনিন্দিতার মা-বাবা গতানুগতিক মানসিকতার হলেও কোল ইন্ডিয়ার কোয়ার্টারে আদর যত্নে বড় করেছিলেন মেয়েকে।

নববধূর বেশে শ্বশুরবাড়িতে পা রেখেই অনিন্দিতার মন হতাশায় ভরে যায়। বুঝতে পারে না কি সুখ, কি নিরাপত্তা দেওয়ার আশায় মা-বাবা তাকে এই ছেলের হাতে সঁপে দিলেন। কি দায়িত্ব পালন করলেন তাঁরা। শ্বশুরবাড়ি পুরুলিয়া জেলা সদর স্টেশনের কাছে কিন্তু বাড়ির পরিবেশ চূড়ান্ত সেকেলে। মনে হয় পঞ্চাশ বছর আগেকার কোন অজপাড়াগাঁর শৈলী স্থাপত্য ঢুকে পড়েছে বাড়িতে। ঘরে একটা সাদা কালো টিভি পর্যন্ত নেই! ফ্রিজ নেই! মানুষজন সব একদমই সংস্কৃত নয়। স্বার্থপর, লোভী, সংকীর্ণ মানসিকতার। স্বার্থের বশে, লোভের বশে, নিজের প্রাধান্য স্থাপনের ইচ্ছের বশে বাড়ির সব সদস্যদের কথাবার্তা এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে সেদিক ঘুরে যায়। যদিও সে সেখানে সারাবছর থাকবে না। হাজব্যান্ডের সঙ্গে তার পুনেতে একক সংসার হবে, তবু বিয়ের পরের কয়েকদিনে দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। বিশ্বাস হয় না যে হাজব্যান্ডকেও সে নিজের মতো করে পাবে। হাজব্যান্ডকেও তাদেরই মতো একজন লাগে। হলও তাই। পুনেতে আসার আগে সে দেখে বস্তা ভরা বাসনপত্র গায়েব, ঘর সাজানোর জিনিসপত্র গায়েব, উপহারে পাওয়া শাড়ি জামাকাপড় গায়েব। খোঁজ করতে গেলে বাড়ির লোকের প্রতি অনুগত হাজব্যান্ড বলেন এসব নিয়ে গিয়ে লাভ নেই। আমি তোমাকে সব কিনে দেব, তোমার কোন কিছুর অভাব হবে না। কিন্তু ভারত ফোর্জের মাত্র চার হাজার টাকা মাইনেতে পুনেতে অন্যের বাড়ির ভাড়া গুণে সব আর কখনও কেনা হয় না, সংসারের অভাব আর মেটে না।

গতানুগতিক ধারায় বিয়ের বছর দু'য়েকের মধ্যে মেয়ের মা হয়ে যায় অনিন্দিতা। মা হওয়ার পরেই মেয়ে নিয়ে মায়ের বাড়িতে দেড় বছর থাকতে হয় তাকে। হাজব্যান্ড স্বরূপ মুখার্জির কম্পানিতে লোক ছাঁটাই হয়। চাকরি চলে যায় তাঁর। অনেক চেষ্টা করে দেড় বছর বাদে উনি আহমেদনগর ফোর্জের চাকান প্ল্যান্টে চাকরি পান। মাইনে

সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। অনিন্দিতা পুনেতে ফিরে আসে। পরের পাঁচ বছরে মেয়ে আরও বড় হয়। তার খরচা বাড়ে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ে কিন্তু চাকান প্ল্যান্টের কর্মীদের মাইনে বাড়ে না। ঘরের তিন সদস্যের খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। আর্থিক চাপের সঙ্গে অনিন্দিতার মানসিক চাপও ছিল। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা নেই, বাপের বাড়ি থেকে কোন অর্থনৈতিক সাহায্য নেই, অনিন্দিতার কষ্টে স্বামীর কোন সহানুভূতি নেই, ঘরের কাজে, বাইরের কাজে তাঁর কোন সহযোগিতা নেই। উনি শুধু খান দান, ঘুমোন, অফিস করেন এবং মাসের শেষে মাইনে স্ত্রীর হাতে তুলে দেন। শ্বশুরবাড়ি গেলে সেখান থেকে 'শ্বশুর-শাশুড়ি-ভাসুর-জা'দের তর্জন গর্জন শুনে গরম মাথা নিয়ে ফিরতে হয়। স্বামীও সর্বদা বাড়ির লোকজনের পক্ষে গিয়ে কথা বলেন। তাই মাঝে মাঝেই তাঁর সঙ্গে মতবিরোধ। মতবিরোধ থেকে তর্কাতর্কি। তর্কাতর্কি হলে স্বামী রাতে বিছানার এক প্রান্তে গিয়ে শুয়ে থাকেন। বেশ কয়েকদিন শুকনো শুকনো কেটে যায় অনিন্দিতার রাত। আমি ওকে জিজ্ঞেস করতাম, ''কি রে গতকাল কিছু হল?''

''না।''

''সাতদিন হয়ে গেল তো!''

''আরে ভুলে গেলি? এবার ক্যালেন্ডারে দিনটা পুরো কালো হয়ে গেছে না! দিনটি নিজে থেকেই কালো হয়ে যায়নি। কালো করে দেওয়া হয়েছে। ঝগড়ার মাত্রা বুঝে অনিন্দিতা তার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো মোতি মেডিক্যালের সারাদিন বসে বসে মাছি মারা লোকটি যে কিনা কোন কাস্টমার এখনকার হিসেবে এক টাকার ওষুধ ধারে নিয়ে দু'দিনের মধ্যে শোধ না দিলে সবাইকে 'অলরেডি এক টাকা লস-এ রান করছি' বলে দুঃখ করে—তার কাছে থেকে পাওয়া ক্যালেন্ডারে ঝগড়ার দিনটিকে কোয়ার্টার কিংবা অর্ধেক কিংবা তিন চতুর্থাংশ না হলে পুরো কালো করে দেয়। ক্যালেন্ডারে দিন কোয়ার্টার কালো হওয়ার অর্থ হল ঝগড়ার পরবর্তী সাতদিন স্বরূপ মুখার্জি স্ত্রীর সঙ্গে কোন শারীরিক সম্পর্ক করবেন না। অর্ধেকের মানে হল পনেরো দিন। তিন চতুর্থাংশ মানে একুশ দিন এবং পুরো মানে একমাস।

অনিন্দিতা বলে, ''আমার মা-বাবাও কেমন দেখ? এখানে এসেছিল। স্বরূপের সঙ্গে আমার ঝগড়াঝাঁটি দেখল, আমার কষ্ট দেখল, আমার কান্নাকাটি দেখল তবু আমাকে বাড়ি নিয়ে গেল না।''

''তুই বলেছিলি নিয়ে যেতে?''

''শুধু এখনকার জন্য নয়। সবসময়ের জন্য।''

''কি বললেন তাঁরা?''

''বলল, তুমি যদি মনে করো স্বরূপকে ছেড়ে দেবে তাহলে মনে রেখো আমাদের বাড়ির দরজা তোমার জন্য বন্ধ। শালা বিয়েটা কি আমি নিজের ইচ্ছেই করেছি! যাওয়ার আগে একবারও ভাবল না যে আমি আত্মহত্যা করতে পারি!''

তখনও আমার ডিভোর্স হয়নি। রাজা, মানে আমার হাজব্যান্ডের ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স থেকে রিটায়ারমেন্ট নেব নেব ভাব। স্যালারি খুব কম। আমারও অবস্থা

অনিন্দিতার মতো। আমারও ঘরে মেয়ে বড় হচ্ছে। ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স থেকে বেরিয়ে রাজা যে ভালো চাকরি পাবে, মাইনে বেশি হবে এমন কোন আশাই নেই। অনেক ভালবেসে বলে, বুঝিয়ে, সোনা বিক্রি করে 'এ এম আই ই'তে ভর্তি করিয়ে, বই কিনে দিয়ে আমি ওর পড়াশোনাতে উৎসাহ জাগাতে অক্ষম হয়েছি। ডিগ্রি তার বাড়েনি। পরিবর্তে ঘরে অশান্তি বেড়েছে। টাকার অভাবে নিজের কোয়ালিফিকেশনও প্রয়োজনমত বাড়াতে পারছি না। যা আছে তার ভিত্তিতেই কোন চাকরি করব তারও উপায় নেই। মেয়ে ছাড়ছে না। ক্রেচে যাওয়ার ভয়ে প্রচণ্ড কান্নাকাটি করছে, বমি করছে, জ্বরে পড়ছে। অনিন্দিতার মতো আমি আমার মা-বাবাকে তাঁদের বাড়িতে আমাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারি না। কারণ মা-বাবা আমার বিয়ে দেননি। তাঁদের অমতে গিয়ে আমি নিজের পছন্দে বিয়ে করেছি। কোন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেই আমার কোন যোগাযোগ নেই। অসহায়তার অন্ধকারে আমিও ডুবছিলাম। অনিন্দিতা এবং আমার অসহায়তার কারণ কিছুটা আলাদা ছিল, কিন্তু অসহায় আমরা দু'জনেই। তাই খুব জমে উঠেছিল আমাদের বন্ধুত্ব। খুব অল্প সময়ে।

পরদিন সকাল ছ'টা ষোলোতে সন্দীপ রায় আমাকে মেসেজ করে, ''গুড মর্নিং।''

তারপর ছ'টা সতেরোতে আরেকটা মেসেজ, ''কেমন আছেন?''

আমি ঘুম থেকে উঠে সাতটা পঞ্চাশে মেসেজ পড়ি। লিখি, ''মর্নিং...এখন আমার দিন শুরু হল।''

''পুরো এনার্জি নিয়ে?''

''আপনি হয়ত জানেন না যে সারাদিন আমার এনার্জি এতটুকু কমবেশি হয় না।''

''আপনি খুব লাকি।''

''কিন্তু আমার এনার্জি সবসময়ই কম থাকে। হা হা হা। আপনার কি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে?''

''নেই বললেই চলে। আমি ডিজিটাল দুনিয়াকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি।''

''সত্যি? ভালো কথা। কিন্তু আমার আছে।''

''আমি কি দেখতে পারি?''

''কিন্তু আপনি যে বললেন আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নেই! তাহলে আমারটা কেমন করে দেখবেন?''

''আমি বলতে চেয়েছি সেখানে তেমন কিছু নেই। কিছু পোস্ট করি না। আমার কোন ফটোও পাবেন না আপনি। আপনি কি দেখতে চান?''

''আপনার অ্যাকাউন্ট চেক করার কি প্রয়োজন আমার?''

কথা এখানেই শেষ হয়।

একমাস হল আমি লাইপোসাকশন করিয়েছি। সুস্থ হতে অনেক বাকি। ডাক্তার বিশ্রাম নিতে বলেছেন। বলেছেন আরও দু'মাস না গেলে কলকাতায় যাওয়া ঠিক হবে না। কলকাতায় যাওয়া স্থগিত রাখলেও এখানকার দৈনন্দিন কাজগুলোকে তো আর স্থগিত রাখা যায় না। বাইরের কিছু কাজের লিস্ট নিয়ে স্কুটিতে করে বেরিয়ে পড়ি। একটা হার্ডওয়ারের দোকানে গিয়ে ড্রেনেক্স কিনে সিঁড়ি বেয়ে নামছি এমন

সময় মেসেজ করে সন্দীপ, ''আক্লেমড্ অথার।''

রোদে দাঁড়িয়েই প্রশ্নবোধক উত্তর লিখে ফেলি, ''কেন এমন বলছেন?''

''আমি রিসার্চ করে আপনাকে নিয়ে জানতে পেরেছি। আশা করি আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না। চিন্তার কিছু নেই। আমি আপনাকে নিয়ে কারও সঙ্গে কোনও আলোচনা করিনি।''

''ওহ্! আপনি আমার অফিশিয়াল নাম জানতে পেরেছেন?''

''ওটা বের করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার ছিল না।''

মনে মনে একটু লজ্জা পাই। মাত্র বছর দুই হল লেখার জগতে পা দিয়েছি। এখনও পর্যন্ত আমার তিনটে বই প্রকাশিত হয়েছে। বাকি সব লেখকদের মতো আমিও চেয়েছিলাম কলকাতার কোন বহুপ্রচলিত বাংলা সংবাদপত্রে যেমন আনন্দবাজার, কিংবা বর্তমানে, কিংবা আজকালে বইয়ের রিভিউ বের হোক। সেসব অফিসে বই দিয়েও এসেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত একটা সংবাদপত্রও নতুন লেখিকার বইয়ের রিভিউ বের করার মতো উদারতা দেখায়নি। উদারতা দেখায় না তারা। বিশিষ্ট কিছু লেখক-লেখিকা ছাড়া অথবা বিশেষ পরিচিতি ছাড়া অন্য কারও বই পড়ে সমালোচনা করার সময় এবং ইচ্ছে তাদের নেই। আমি তাই সন্দীপের কাছে নিজেকে নিয়েই বিদ্রূপ করি, ''আপনি অন্যের সঙ্গে আমাকে নিয়ে আলোচনা করে থাকলেও আমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কলকাতার খবরের কাগজগুলো খুব জেদি। ওরা আমার বদনাম করবে না।'' ভাবি আমার কথার মানে নিশ্চয় সন্দীপের কাছে অবোধ্য হবে। পরে বিশ্লেষণ করে দেব। বলব ভারত ম্যাট্রিমোনিতে লেখিকা নিজে তাঁর জন্য পাত্র খুঁজতে গেছেন—এটা বিশেষ খবর হওয়া এত সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ খবর হতে গেলে আগে লেখিকা হিসেবে তাঁর খ্যাতি দরকার।

ওকে বলি, 'সন্দীপ আমি একটু বাইরে আছি। আপনার সঙ্গে পরে কথা বলব।''

''ঠিক আছে। আপনার মিষ্টি গলা শোনার জন্য অপেক্ষা করছি।''

একটু পরেই সন্দীপ আবার লেখে, ''আপনি শর্ট মুভি তৈরি করেন?''

হ্যাঁ, আমি আমার গল্প নিয়ে কয়েকটি শর্ট মুভি ইউ টিউবে আপলোড করেছি। তাদের লিঙ্ক ফেসবুকে শেয়ার করেছি প্রোমশনের জন্য। সেই কয়েকটি মুভির মধ্যে একটি ছিল আমার আত্মজীবনীর একটা ছোট্ট টুকরোকে কেন্দ্র করে, নিজের বাড়িতে শিশুরা আত্মীয়পরিজন দ্বারা কিভাবে নির্যাতিত হয় তা দেখাতে চেয়ে।

''ওহ্ নো, বাংলা ভাষার ওপর দখল আমার বেশ কম।''

বুঝতে অসুবিধে হয় না যে সন্দীপ আমার ফেসবুকের টাইমলাইনে গিয়ে বইয়ের ক্লিপিংগুলো পড়ার চেষ্টা করেছে এবং একদমই বুঝতে পারেনি অথবা আধাখেঁচড়া বুঝে ছেড়ে দিয়েছে। মনে মনে হাসি। সন্দীপ জানতে চায়, ''আপনার বার্থডে কি ৬ই জুন? আমার জন্মদিনও ৬ই জুন।''

''ভালোই হল। অন্তত পক্ষে আপনার জন্মদিনটা মনে করতে চেয়েই আমার নিজের জন্মদিন মনে পড়বে।''

একঘণ্টার ব্যবধানে সন্দীপ আবার আমাকে মেসেজ করে, ''আপনার কি কোন বুটিক আছে? তার মানে আপনি একজন ফ্যাশন ডিজাইনার?'' উত্তরে আমি শুধু

কয়েকটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন পাঠাই যার অর্থ হয় এমন মনে হওয়ার কারণ কি? আমি চেষ্টা করি ভাবতে সন্দীপ আমাকে নিয়ে এত খবর পাচ্ছে কোথায়? উত্তর খুঁজে পেতে অবশ্য বেশি কষ্ট করতে হয় না। মনে পড়ে আমি ফেসবুকে রিলির ঘরে একটা বড় আয়নার সামনে বসা নিজের ফটো আপলোড করেছি।

রিলি দেখতে সুন্দর। ওর ছোটবেলায় আমি ওর রূপ নিয়ে বেশ সচেতন ছিলাম। আরও সুন্দর করে তুলতে ওকে অনেক কেতাদুরস্ত পোশাক পরিয়েছিলাম। বড় হয়ে সে নিজে তার রূপ নিয়ে সচেতন হয়েছে, নিজের ঘরে অনেক আধুনিক পোশাকের সংগ্রহ রেখেছে। চাকরি পেয়ে রাতারাতি বদলে দিয়েছে ওর ঘরের চেহারা। আমার করে দেওয়া রয়্যাল পেন্টের উপর এক দেওয়ালে ওয়ালপেপার বসিয়েছে, দুই দেওয়ালের সঙ্গে দুটো আয়না জুড়ে দিয়েছে—একটা সাদা ফ্রেমের সাদা পর্দা দিয়ে ঢাকা ছয় বাই ছয়ের, ওটাকে সরানো যায় না, দেওয়ালে পেরেক দিয়ে পোঁতা আছে এবং অন্যটা আড়াই বাই ছয়ের। আড়াই বাই ছয়ের আয়নাটির চারদিকে সোনালি নকশা করা ফ্রেম। ওটা রিলির ইচ্ছের দাস হয়ে এই দেওয়াল সেই দেওয়াল করে বেড়ায়। আড়াই বাই ছয়ের ছোট আয়নাটি অপেক্ষাকৃত ভালো ছবি দেয়। ওর সামনে দাঁড়ালে আমাকে দেখতে লম্বা এবং স্লিম লাগে। রূপে বেশি ঝলক দেখা যায়।

আয়না ছাড়া রিলির ঘরে আছে একটা মাঝারি উচ্চতার সাদা এম ডি এইচ ক্লসেট। তার ভেতরের শেলফ-এ আছে প্যাকেটবন্ধ জামা কাপড়। ক্লসেটের নিচের দিকে দুই ড্রয়ারে আছে রঙ বেরঙের ব্রা-প্যান্টি-কাপস এবং অন্যান্য অন্তর্বাস। ক্লসেটে একটা খোলা অংশও রয়েছে। তাতে উপরের রড থেকে সাদা হ্যাঙ্গারে ঝুলছে লম্বা লম্বা টপ, ফ্রক, জ্যাকেট এবং ব্লেজার। নিচের রড থেকে ঝুলছে ছোট ছোট টপ এবং স্কার্ট। সেসবের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে সাদা হ্যাঙ্গার। সোসাইটির বাগানমুখী সাদা পর্দায় ঢাকা জানালার দিকে আছে দুটো স্বল্প উচ্চতার ক্লসেট। অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ জোড়া জুতো সাজিয়ে রাখা হয়েছে তার মধ্যে। জুতোর ক্লসেটের পরেই আছে ট্রেড মিল। ট্রেড মিলের পাশের দেওয়ালে একটা বড় সাদা আলনা। সেখানেও সাদা হ্যাঙ্গারে একগাদা ফ্রক, গাউন, জ্যাকেট ঝোলানো। আলনার পাশে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত জুতোর খোলা শেলফ, লাইট দিয়ে সাজানো শেলফে পঞ্চাশ জোড়া জুতো, কুড়ি খানা বিভিন্ন নামি কম্পানির ব্যাগ। তার পাশের দেওয়ালে আরেকটা খোলা সু-র‍্যাক। সেখানে আছে আরও কুড়ি জোড়া জুতো। ঘরের বড় আয়নার সামনে একটা ট্রি-স্ট্যান্ডে ঝোলানো আছে আরও পঁচিশ খানা ব্যাগ। এছাড়া ঘরের ছাদে আছে ঝোলানো মেঘ এবং তারার ডিজাইন। সেগুলো আমার করে দেওয়া।

মিনিট দশেকের মধ্যে আমি সন্দীপকে মেসেজ করি, ''আমি বুঝতে পেরেছি...আমাদের ঘরে আসলে অনেক আউটফিটের কালেকশন আছে।''

''আচ্ছা।''

''আপনি এত প্রশ্ন করছেন...আমার মনে হচ্ছে আপনি এখনও পর্যন্ত আমাকে নিয়ে রিসার্চ চালিয়ে যাচ্ছেন।''

''না না।''

''আপনার যদি আমাকে নিয়ে আরও কিছু জানার থাকে তাহলে আমাকে কল

করতে পারেন।"

"এখন?"

মোবাইলেই সময় দেখি রাত এগারোটা। যদিও দিনশেষে আমি আমার ছয় বাই সাতের বিশাল বিছানায় অবসর নিয়ে ফেলেছি, সন্দীপের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে আটকাতে পারি না।

"ঠিক আছে।"

অনেকক্ষণ অনেক বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়। আলোচনা করতে করতে কখন সে আমাকে আপনি থেকে তুমি করে সম্বোধন করতে শুরু করেছে খেয়ালই করিনি। সেই অনেক বিষয়ের মধ্যে সন্দীপের অফিসের গল্প থাকে, ওর পরিবারের কথা থাকে, আমাদের দু'জনার কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকে। ওকে আমি আমার দুই দাদার নাম বলি। বলি গুগলে সেগুলো টাইপ করলে আমাদের পরিবারের কিছু পরিচয় সে পেয়ে যাবে। মনে হয়েছে সে যদি আমার নাড়িনক্ষত্র জানার জন্য এমনই অভিযান চালিয়েছে আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট যথেষ্ট হবে না। সেখানে আমার কাজেরও নতুন কোন সংযোজন নেই।

সন্দীপকে বলি, "আমার একটা প্রশ্ন আছে।"

"কি?"

"আপনি তো কয়েকদিন আমার সঙ্গে অনেক কথা বলছেন, অনেক কথা জানতে চাইছেন আমাকে নিয়ে। বেঙ্গলি ম্যাট্রিমোনিতে আপনার আর কোন মহিলার সঙ্গে এমন আলাপ হয়নি?"

"হয়েছে। আমি যখন ভুবনেশ্বরে ছিলাম একজন মহিলার সঙ্গে মাঝেমধ্যে হোয়াটসআপে মেসেজিং হত। কলকাতায় ফিরে আমি তার সঙ্গে দেখাও করেছিলাম। কিন্তু পছন্দ হয়নি।"

"কেন?"

"মহিলাটি দেখতে ভালো ছিল না। চেহারা প্রোপরশনেট ছিল না। মুখে অনেক দাগ ছিল, বয়সের ছাপ ছিল।"

কথাটা শুনে আমি যে একটু নড়বড়ে হয়ে পড়েছি সন্দীপ তা ধরে ফেলে। বলে, "আমরা দু'জনেই বুঝতে পেরেছিলাম এটা সম্ভব নয়। মুখে বলার দরকার পড়েনি।"

তার মানে পুরুষরা জীবনের চুয়ান্নটি বসন্ত পেরিয়ে এসেও, চুয়ান্ন বসন্তকে শরীরের নমনীয়তা, কমনীয়তা, লাবণ্য, যৌবন বিলিয়ে দিয়েও মেয়েদের মধ্যে সেই নমনীয়তা, সেই কমনীয়তা, সেই লাবণ্য, সেই যৌবন অটুট দেখতে চায়! একটা সময় ছিল যখন আমার গায়ের রঙ খুব উজ্জ্বল ছিল, মাথায় কালো ঘন চুল ছিল, মুখের উপর বসানো টানা ভুরু ছিল, টানা বড় চোখ ছিল, মোটামুটি উন্নত নাক ছিল, গোলাপি দুটো গাল ছিল, গোলাপি ঠোঁট ছিল, সাদা ঝকঝকে দাঁতের সারি ছিল। এছাড়াও লোকের নজর কাড়ার মতো সুন্দর হাতের এবং পায়ের আঙ্গুল ছিল। রূপের তারিফ পেয়ে পেয়ে তারিফের মোহ আমার শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় এখন অতীত। এখন শরীরে একমাত্র আভিজাত্য ছাড়া সেসবের কতটা বেঁচে আছে জানি না বা জানলেও সন্দীপের কাছে তা যথেষ্ট হবে কিনা জানি না। আর যা বেঁচে আছে তা

নতুন কারও সঙ্গে সম্পর্ক বাঁধার দু'বছরের মধ্যেই শেষ যে হয়ে যাবে না তাই-ই বা কে বলতে পারে! কখনও সন্দীপের সামনে দাঁড়াতে তো আমাকে হবেই এবং দাঁড়ালে কি হবে ভাবতে আমার ভয় করে। সন্দীপ বলেছে আমি নাকি চেহারা খুব মেন্টেন করেছি। ফটো দেখে বলেছে। তাই ভয়। ভয়ে সংকুচিত হয়ে আমি ওকে জিজ্ঞেস করি, ''আপনি চেহারাকে এতটাই গুরুত্ব দেন?''

''মেয়েটি সত্যিই দেখতে খারাপ ছিল।''

''কতটা খারাপ?''

তার উত্তর না দিয়ে সন্দীপ বলে, ''ভালো চাকরিও করে না। একটা প্রাইভেট স্কুলে পড়ায়। তাছাড়া...''

''তাছাড়া কি?''

''কলকাতার মহিলারা অনেক হিংসেপরায়ণ এবং পরচর্চাপ্রবণ।''

কলকাতার মহিলারা কেমন সে নিয়ে আমি এই মুহূর্তে সন্দীপের সঙ্গে কোন তর্কবিতর্কে যেতে চাই না। আমার মনে হয় সন্দীপ অনেক অহংকারী। ওর মধ্যে আই আই টি থেকে পাশ করার অহংকার আছে, মাসে দু'লাখ টাকা মাইনে পাওয়ার অহংকার আছে এবং বিগত চুয়ান্ন বসন্তকে নমনীয়তা কমনীয়তা লাবণ্য দান করে দেওয়া চেহারারও অহংকার আছে। ওর অহংকারকে অমূলক ভাবাতে আমি অহংকার নিয়েই একটা লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিয়ে ফেলি। গুড নাইট করার পরে বুঝি বক্তৃতা দিতে গিয়ে কিছু ভুল কথা বলেছি। লোকটি বেশ, প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে গেছে। তর্ক করেনি। কি এক লজ্জা গ্রাস করে আমায়। আমি ওকে একটা সরি জাতীয় মেসেজ পাঠাই, ''আপনিই ঠিক ছিলেন। কালকে আপনি অহংকারী মানুষদের নিয়ে আপনার মতামত আমাকে ব্যাখ্যা করবেন কেমন? ভালো থাকবেন।''

''ঠিক আছে। কিন্তু একটা কথা—আমি তোমার দাদাদের মতো মেধাবী নই।'' আমার এক দাদা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। উনি একজন অথারও। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সন্দীপ গুগল ঘেঁটে খবর বের করে নিয়েছে। বলছে, ''প্রফেসরজির 'আই ই ই ই'র ওপর অনেক পাবলিকেশন আছে দেখছি।''

সকাল সাতটা একচল্লিশে ঘুম থেকে উঠে প্রথম সন্দীপেরই মেসেজ পাই, ''গুড মর্নিং।''

তার পরপরই অনিন্দিতার মেসেজ ঢোকে—স্টিকারের সঙ্গে গুড মর্নিং। অনিন্দিতা জানতে চায়, ''মালটার কি খবর?''

এত কথা লিখে বলা সময়সাপেক্ষ বলে আমি অনিন্দিতাকে ফোন করতে বলি। অনিন্দিতা বিলাসপুরে একটি স্কুলে পড়ায়। কয়েক বছরে কয়েকবার স্কুল চেঞ্জ করে মনে অনেক কষ্ট নিয়ে এখন গরমের ছুটিতে সে আরেকটি নতুন স্কুলে জয়েনিং-এর অপেক্ষা করছে। মনে কষ্ট, কারণ নিয়মানুযায়ী শেষ স্কুলটিতে গরমের ছুটি পড়ার আগে এক মাসের নোটিশ দিতে হয়েছে। তাতে ছুটির মাসের মাইনেটা মারা পড়েছে।

আমার এবং সন্দীপের কথাবার্তা জমে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অনিন্দিতা তার টাকার আফসোস ভুলতে থাকে। সে আমাতে মনোনিবেশ করে। আমায় ফোন করে বলে, ''দেখেছিস, মালটা কেমন তোর সব খবর জোগাড় করছে! ভিডিও কল করেছিস?''

দেখেছিস ওর ঘর?"

"দেখেছিলাম।"

"কেমন লেগেছে?"

"মোটামুটি।"

"মালটা দেখতে কেমন রে?"

"মোটামুটি।"

"ফর্সা না কালো?"

"শ্যামবর্ণ।"

"রোগা না মোটা?"

"মিডিয়াম।"

"লম্বা না বেঁটে?"

"লম্বা। পাঁচ দশ হাইট। আমি ওর কাঁধের নিচে পড়ব।"

হাহা করে হাসে অনিন্দিতা, "আরে এটা নিয়ে এত ভাবছিস কেন? আমাদের সামনে অমিতাভ-জয়ার জ্বলজ্বলে উদাহরণ সবসময় ছিল এবং সবসময় থাকবেও। এখন বল, মাথায় চুল কেমন?"

"বয়সের সঙ্গে চুল একটু কম হওয়াটাই স্বাভাবিক। সে নিজেও বলছিল চুল কম হওয়াতে হাইট পাঁচ দশ থেকে কমে গিয়ে এখন পাঁচ নয়ও হতে পারে।"

"চোখে চশমা আছে নিশ্চয়?"

"হ্যাঁ।"

"কি পরে ছিল রে?"

"খালি গায়ে ছিল। আমি ভিডিও কল করতে চাইলে গেঞ্জি গলিয়ে নিয়েছে।"

"তাহলে খুব অভদ্র নয় বল? শোন, আমি জুনের শেষ সপ্তাহে পুনেতে আসছি। ততদিন পর্যন্ত তুই কম কম কথা বলে ওর ইন্টারেস্ট ধরে রাখ। আমি এলে ভিডিও কল করবি। ওকে দেখব। আপাতত তুই একটা কাজ কর।"

"কি কাজ?"

"মালটার একটা ফটো পাঠা।"

মাত্র দু'দিন হল আমি সন্দীপের সঙ্গে কথা বলছি। দু'দিনেই তার নাম থেকে শুরু করে অনেক কথাই আমি অনিন্দিতাকে বলে ফেলেছি। তাই বলে তার ফটো পাঠানোর ইচ্ছে অন্ততপক্ষে এই মুহূর্তে ছিল না। সন্দীপের সঙ্গে কতদিন আমার কথা টিকবে তারই তো কোন ঠিক নেই। কিন্তু অনিন্দিতাও ছাড়তে চায় না। জেদ ধরে বসে। বলে অনেকগুলো ফটো পাঠাতে হবে। না পেরে আমি ওকে সন্দীপের কয়েকটি ফটো হোয়াটসআপ করে দিই। দেখে সে বলে, "বাহ্ ফ্ল্যাটটা ভালো।"

ওকে জানাই ফ্ল্যাটটা আসলে ওর দিদির। তাঁর গৃহপ্রবেশের দিন তোলা হয়েছে ছবি।

"তোর ডিপিটা খুব সুন্দর। এটা দেখেই হয়ত মালটা পাগল হয়েছে। দিনরাত হয়ত তোরই ফটো দেখছে।"

অনিন্দিতা পুনের এক বেডরুম ফ্ল্যাটের বেডরুমটা নিজের জন্য রেখে লিভিং

রুম এবং কিচেন ভাড়াতে দিয়েছে। বিলাসপুরে নতুন দুই বেডরুমের ফ্ল্যাট কিনেছে। বিলাসপুরে যাওয়ার পর সে মাঝেমধ্যে পুনেতে এসেছে। ঘটনাচক্রে দুর্গাপুজোতে, কালীপুজোতে অথবা কোন সার্বিক সমাবেশে আমার সামনাসামনি এসেও পড়েছে কিন্তু কথা বলেনি। আমি দেখেছি অনিন্দিতার মেয়ে একটু একটু করে বড় হচ্ছে। সে আমার মেয়েকে চিনতে পেরেছে, কথা বলতে চেয়েছে তার সঙ্গে কিন্তু শেষপর্যন্ত সফল হয়নি। মায়ের ভয়ে পিছিয়ে গেছে। আমি রিলিকে রিভুর সঙ্গে কথা বলতে কখনও নিষেধ করিনি। বস্তুত অনিন্দিতার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমার মন আনচান করত। অনেকবারই মনে হয়েছে সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, ''কেমন আছিস?'' কয়েক পা এগিয়েও গেছি জিজ্ঞেস করার জন্য। তারপর আবার পিছিয়ে এসেছি উত্তর না দিলে ওকে পরিবেষ্টিত করে রাখা বাকি লোকজনের সামনে আমি অপমানিত বোধ করব এবং কষ্ট পাব এই ভেবে। মনে হয়েছে আমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে সে রাখেই না। তার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী আছে। কেবলমাত্র তাদের সঙ্গেই সে আজীবন সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছুক। নিশ্চয় তাই। তা না হলে তাদের সঙ্গে এতদিনে এমন ভুল বোঝাবুঝি কেন হল না? কখনই কি তাদের সঙ্গে মতবিরোধ হয়নি! তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তার মেয়ের ঝগড়া হয়নি! অসম্ভব! নিশ্চয় হয়েছে। কিন্তু অনিন্দিতা সেইসব ঘটনাকে এতটা গুরুত্ব দেয়নি যেমন আমার ক্ষেত্রে দিয়েছে। বেশ কিছুদিন আমার ঘরে আসছে না দেখে আমি যখন ওর ঘরে গিয়ে কারণ জিজ্ঞেস করেছিলাম ওর বক্তব্য ছিল রিলি যখন ওর খেলনা নিয়ে রিভুকে রাগ দেখিয়েছিল তখন আমি কেন রিলিকে বকিনি। আমি সাফাই দিতে চেয়েছিলাম, ''খেয়াল করিনি,'' ও বলেছিল, ''না, তুই সামনেই ছিলি।''

''তাহলে নিশ্চয় ভেবেছি তাতে খারাপ লাগার মতো কিছু নেই।''

সে কোন উত্তর দেয়নি।

আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম, ''খারাপ স্মৃতি মনে রাখতে নেই। খারাপ স্মৃতি যখন কোন সম্পর্ককে নষ্ট করার জন্য উঠেপড়ে লাগে তখন সম্পর্ক বাঁচানোর জন্য ভালো স্মৃতির সাহায্য নিতে হয়।''

অনিন্দিতা বোঝেনি।

শেষে আমি এর চেয়ে আর ভালো হতে পারব না বলে হার মেনে ফেরত এসেছি।

অনিন্দিতার সঙ্গে কথা বলে ফোন ড্রপ করার পরে আবার সন্দীপের মেসেজ পাই, ''তুমি অনেক বুদ্ধিমতী।''

''একদমই না।''

''অতিরিক্ত শাসন বা নির্যাতনের ফলে বাচ্চারা লেখাপড়ার সুযোগ কম পায় অথবা লেখাপড়ায় তাদের আগ্রহ কমে আসে, পরীক্ষায় কম নম্বর পায়। তার মানে এই নয় যে তারা সাধারণ স্টুডেন্ট।''

আমি বুঝতে পারি সন্দীপ আমার ইউটিউবে আপলোড করা মুভিগুলো দেখে

ফেলেছে। ওকে আমি বোঝাতে চাই যে মুভিতে আমি আলাদাই কিছু বলতে চেয়েছি। ওকে বলি সে এখন ফ্রী থাকলে আমি দু'তিন মিনিটে মুখে ব্যাখ্যা দিতে পারব। সন্দীপ ফোন করে। মুভির কথার পরে অন্য অনেক কথা হয় আমাদের।

ছোটবেলা থেকে পরিমিত কথা বলার অভ্যেস নিয়ে আমি বড় হয়েছি। তখন আমি অহেতুক পরিমিত কথা বলতাম। বয়স বাড়ার সঙ্গে কিছু ক্ষেত্রে কথা বলার হেতু খুঁজে পেয়েছি এবং সেই হেতু কেবলমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ছাড়া কখনো কারও সঙ্গে বেশি কথা বলে ফেললে পরে মনে হয় এটা ঠিক হল না, ব্যক্তিত্বকে নড়বড়ে করে ফেললাম, নিজেকে বোঝানোর এটা সঠিক রাস্তা নয়। নিজের আসল ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে হলে মুখ বন্ধ রেখে স্বাভাবিক গতিতে চলা উচিত। তাতে দুর্ঘটনাকে এড়িয়ে সময়মতো ঠিক গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাওয়া যায়। আমি সন্দীপকে মেসেজ করি, ''সরি, ফালতু ফালতু অনেক কথা বলে ফেলেছি। এবার ফোন করলে আপনার কথা শুনব।''

সন্দীপ লেখে, ''না না। তোমার মিষ্টি গলা শুনতে ভালো লাগে আমার।''

দুপুরে আমি সন্দীপকে জিজ্ঞেস করি, ''ফ্রী আছেন?''

''একটু বাইরে আছি। বিকেল চারটের দিকে ফ্রী হব।''

সওয়া তিনটে নাগাদ সন্দীপ আমাকে মেসেজ করে জানায় সে ঘরে ফিরে এসেছে, আমি চাইলে এখন তার সঙ্গে কথা বলতে পারি। কিন্তু আমি এখন আমার লেখার মধ্যে ডুবে আছি। গতবারে কলকাতা বইমেলাতে আমার বুক-লঞ্চ প্রোগ্রামে প্রকাশক আবুল বাশার, নজরুল ইসলাম, কঙ্কাবতী দত্ত, পৃথ্বীরাজ সেনকে ডেকেছিলেন। পৃথ্বীরাজ সেন আমার একটি প্রেস মিটেও এসেছিলেন। এত নামি লোক বিশেষ মহানুভবতা দেখিয়ে খুব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে দিয়েছিলেন সেই প্রোগ্রাম। প্রেস মিটে আমার আরও কয়েকজন বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তাঁদের সূত্র ধরে কয়েকটি বাংলা ম্যাগাজিনের সম্পাদকের ফোন পেয়েছি। তাঁরা পুজোসংখ্যার জন্য আমার লেখা গল্প চেয়েছেন। হাতে সময় একদম নেই।

আমি সন্দীপকে মেসেজ করি, ''এখন আমি একটু কাজের মধ্যে আছি সন্দীপ। তখন কথা বলতে চেয়েছিলাম।''

সন্দীপ বোঝে না। লেখে, ''ওকে। আমি কি তোমাকে কল করব?''

''এখন খুব ব্যস্ত আছি।''

''আমি তাহলে কি করি?''

কথাটা খুব মিষ্টি লাগে। ''কিছু করতে হবে না আপনাকে।''

''বলো না কিছু।''

''আমরা না হয় অন্যদিন কথা বলব?''

ঠিক আছে বলেও আধঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকতে পারে না সন্দীপ। আমাকে তার দিদির পরিবারের সঙ্গে ডিনারের একটা ফটো পাঠায়। সে আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য ছটফট করছে। কথা বলতে না পেরে অন্তত পক্ষে মেসেজ করে আমার সংস্পর্শে থাকতে চাইছে। সন্দীপকে এত আবেগময় দেখে আমার কষ্ট হয়। ওকে নিরাশ করতে চাই না। ওর ছেলেমানুষি আমাকে ওর প্রতি দুর্বল করে দিচ্ছে। হেরে

যাচ্ছি মাত্র দু'দিন আগে আলাপ হওয়া মানুষটির কাছে। ভয়ে ভয়ে এই হার—হয়ত সামনাসামনি দেখলে ওর আমাকে পছন্দ হবে না।

''ফটোটি বেশ। কতদিন আগের তোলা এটা?''

''চার মাস।''

''ভালো থাকবেন কেমন?''

''তুমিও ভালো থেকো।''

''আমি নিজেই জানি না আমি আপনার সঙ্গে কেন এত কথা বলছি।''

''তুমি চাইলে আমার সঙ্গে আরও কথা বলতে পারো।''

''না থাক। অনেক কথা বলেছি।''

''না। অনেক কথা বলোনি। যা বলেছ তা একজন মানুষকে জানার জন্য যথেষ্ট নয়। তুমি অনেক দূরে আছ। নইলে আজ রাতে আমরা একসঙ্গে ডিনার করতে বেরোতাম।''

''তাই? উফ্, আমি আপনাকে লেখার জন্য আর কিছু খুঁজে পাচ্ছি না সন্দীপ। মনে হচ্ছে সবকিছু বলা হয়ে গেছে।''

''কল করো আমাকে।''

লিখতে বসে আমার হাতের আঙ্গুলগুলো আর ল্যাপটপের কি প্যাডে বসে থাকতে পারেনি। সন্দীপ কি এক শক্তিবলে সেগুলোকে মোবাইলের কি প্যাডে চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছিল। এখন সেখান থেকে আঙ্গুল সরিয়ে নেওয়ার অনুমতি সে আমায় দিয়েছে, কিন্তু তা তার শর্ত মানলে তবেই সম্ভব। কল করতে হবে। কারণ জানতে চাইলে সে বলে, ''আমি তোমার মিষ্টি আওয়াজ শুনতে চাই।''

সন্দীপ সারাদিন যে আমাকে নিয়েই মেতে আছে তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। রাত সাড়ে আটটায় সে আমাকে মেসেজ করে, ''তোমাকে আমার ভীষণ রহস্যময় লাগছে। মনে হচ্ছে সমুদ্রের অতলস্পর্শী গভীরতার মতো তোমার মনেরও গভীরতা মাপা সম্ভব নয়।''

''আপনার এমন সিদ্ধান্তে আসার কারণ?''

''আমি শুধু আমার অনুভবের কথা জানিয়েছি। তোমার শেষ মুভিটার ডিরেকশন খুব সুন্দর হয়েছে। আগের দুটো মুভির তুলনায় অনেক ভালো।''

''আপনি জানেন যে আপনি যাকে শেষের বলছেন সেটাই আমার প্রথম মুভি? কিন্তু আমার মনে হয় দ্য গার্লস স্টোরির মেকিং-এর সঙ্গে অন্য দুটোর কোন তুলনা হয় না।''

''তাই নাকি? তবুও আমি রেজোলিউশনকেই বেশি নম্বর দেব। মুভিটা দেখতে দেখতে আমি আমার মেয়ের জন্য আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছিলাম। খুব মিস করছিলাম ওকে।''

''আমি আপনার জাজমেন্টকে লাইক করি। যদিও লোকজন আমাকে নিয়ে কি ভাবছে এ নিয়ে আমি কখনই বিশেষ কৌতূহল রাখি না, তবু জানতে ইচ্ছে করছে আপনি আমার মধ্যে কি রহস্য দেখলেন?''

''সেটা আমি ফোনে কথা হলে বুঝিয়ে বলব। রহস্যময় বলতে আমি নেগেটিভ

কিছু বোঝাতে চাইনি। হয়ত রহস্যময় শব্দটা ভুল করে ব্যবহার করে ফেলেছি। অন্য কিছু হত।"

"পজিটিভ নেগেটিভ নিয়ে আমি এত ভাবছি না।"

"আমি বলতে চেয়েছি তোমাকে নিয়ে যত জানছি তত বেশি জানার জন্য বাকি থেকে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।"

প্রথমদিন থেকেই সন্দীপ চাইছে আমি কলকাতায় যাই, ওর সঙ্গে দেখা করি। আমার কলকাতায় যাওয়া প্রয়োজন সেটা আমিও বুঝি। আজকাল বছরের প্রায় বেশিরভাগ সময়টাতেই আমাকে কলকাতায় থাকতে হচ্ছে। সেখানে প্রতি মাসে দশ থেকে বারো হাজার টাকা ভাড়া গুণে গুণে দিতে হচ্ছে বাড়িওয়ালাকে। অনেকবার মনে হয়েছে একটা ফ্ল্যাট কিনে নিলে মন্দ হয় না। একটা ফ্ল্যাট মোটামুটি পছন্দ করে তার কাগজপত্র অ্যাডভোকেটকে দিয়ে টাকাপয়সা জোগাড় করতেই পুনেতে এসেছিলাম। এসে সার্জারি করে ফেঁসে গেছি। সন্দীপের জোরাজুরিতে আজ বিকেলে চেক-আপের জন্য গিয়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলে উনি বলেন আমার এখন যেতে কোন বাধা নেই। রাতে খাওয়া শেষে সন্দীপকে সেটা বলতেই সে আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে, "গ্রেট। কালকেই চলে এসো তাহলে। ফ্ল্যাট নম্বর বি-১, ১৯বি বিশ্বাসপাড়া লেন। না না, ভুল বললাম, ৬ই বিশ্বাসপাড়া লেন, কলকাতা - ৩৩, কিন্তু আমি বলি, "না।"

"কেন?"

"আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাই না। আরও দু'য়েক মাস পরে আসব। আমাদের ইন্ডিয়াতে জনসংখ্যা এত, রোগীর সংখ্যা এত যে ডাক্তাররা তাদের বেশি খবর মাথায় রাখেন না। উনি ভুলে গিয়েছিলেন যে মাত্র একমাস আগে আমার সার্জারি হয়েছে। তাছাড়া কলকাতায় এখন নিশ্চয় খুব গরম?"

"ইয়েস।"

"গুড নাইট।"

পরদিন সকাল পাঁচটা চব্বিশে সন্দীপের মেসেজ পাই, "গুড মর্নিং।"

পাঁচটা উনত্রিশে দুটো ফটো। কোন কনফারেন্সের হবে—একটা বড় কনফারেন্স টেবিলের চারপাশে বসে আছে লোকজন। মাস্টার শট হওয়ায় লোকজনের চেহারাগুলো বড্ড ছোট এবং অস্পষ্ট। পাঁচটা উনত্রিশের প্রশ্ন, "এই ফটোগুলোতে আমাকে খুঁজে পেয়েছ?"

একটা ফটোতে পাইনি। অন্যটিতে অনেক নিরীক্ষণ করে অনুমান করেছি এইটাই সে হবে। স্ক্রিনশট নিয়ে ক্রপ করি ফটো। পাঠিয়ে দিই ওকে। মাস্টার শটটি অনিন্দিতাকেও পাঠাই। অনিন্দিতা জিজ্ঞেস করে, "মালটা কোথায়?"

"আমি তো সেটাই জানতে চাইছি।"

"সে তোর সব ডিপি ডাউনলোড করে বসে আছে। নিজেও নিজের ফটো পাঠাচ্ছে তোকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য।"

"লাভ ইউ অনিন্দিতা।"

"কাকে ভালবাসিস—আমাকে না মালটাকে?"

''আরে ইউ-এর মানে কি হয় রে শালি?''

''আচ্ছা, ইউটা এখন দেখতে পেলাম।''

ফেসবুকে আমার ইনবক্সে এসে সে জানতে চায় ''মালটা এখানেও তোর সঙ্গে চ্যাট করছে?

''না না। আমি আমার ভালবাসাকে কখনই ইনবক্সে ঢোকাবো না।''

'কেন রে?''

''ওখানে ঢুকলেই ভদ্র লোক অভদ্র হয়ে যায়। সেক্স-এর ইচ্ছে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ইন্ডিয়ান হলে তো আর কথাই নেই। ভুলভাল ইংরেজি নিয়ে আদাজল খেয়ে নেমে পড়ে।''

''যেমন?''

''শুনেছিলাম একজন ইন্ডিয়ান একজন আমেরিকান মহিলাকে বলেছে, শো মি ইউর Bobs. ওটা আসলে Boobs হত। মহিলাও বোঝেননি। ঘণ্টাখানেক বাদে উনি উত্তর দিয়েছেন—ডার্লিং, আমি অনেক খুঁজেছি। খুঁজে জ্যাকিকে পেলাম, মাইকেলকে পেলাম, স্যান্ডিকে পেলাম কিন্তু অনেকগুলো বব তো দূরের কথা একটিও ববকে দেখলাম না।''

সে বলে, ''অনেকে vagina-কে vagna লেখে, নাহলে vegina.''

''হা হা হা। আরে যেটা দেখতে চাস অন্ততপক্ষে সেটার বানানটা তো ঠিক করে লেখ!''

সন্দীপকে জিজ্ঞেস করি, ''ওটা কিসের সেমিনার ছিল?''

''যতদূর মনে পড়ে আমি পরিবেশ দূষণ অথবা এনার্জি কনজারভেশন নিয়ে কিছু উল্টোপাল্টা বলছিলাম।''

আধ ঘণ্টার মধ্যে সন্দীপ একটা বিশাল হিসেবে করে ফেলে, ''আমাকে ১৪৪০ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।'' আমি ওকে বলেছিলাম যে আমার কলকাতায় আসতে দু'মাস সময় লাগবে। তাই এই হিসেব। ওর পাগলামি দেখে আমি হাসি চাপতে পারি না। ওর যেহেতু এখন অফিস নেই, ঘরে বসে বসে এসব ভাবে আর আমাকে নক করতে থাকে। কাজে মন লাগাতে দেয় না। ওর পরের মেসেজটা হল, ''কোন সম্পর্ককে ধরে রাখতে হলে আমার মনে হয় বিশ্বাসযোগ্যতা থাকা বিশেষ প্রয়োজন।''

''হ্যাঁ। অনেককিছুরই প্রয়োজন। এটা সেই অনেককিছুর মধ্যে একটা।''

''অনেককিছু? জানি বলতে গেলে একটা অনেক লম্বা চওড়া লিস্ট তৈরি হয়ে যাবে...তবু কোনগুলোকে তোমার উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়?''

''এতকিছু আলোচনা সময়সাপেক্ষ। তাছাড়া এসবের দরকারই বা কি?''

''তা ঠিক।''

বেচারিকে নিরাশ করতে আমার মন চায় না। তাই বলি, ''আমি শুধু সৎ, সহানুভূতিশীল, স্নেহপরায়ণ, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ চাই। কিন্তু আমি এমন হতে পারব না। হা হা হা।''

''সম্ভবত কারও মধ্যেই সব গুণ থাকে না। এই পৃথিবীতে কোনকিছুই হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাওয়া সম্ভব নয়।''

''সুতরাং একা থাকাই বিধেয়। অন্ততপক্ষে আমি তো আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিজেকে দিতে পারব। ভালবাসা, যত্ন সবকিছু। কেননা এসব নিজের হাতে আছে।''

''কখনো কখনো আমারও তাই মনে হয়।''

''তাহলে বেঁচে থাকাকে সহজ করার জন্য কারও কাছ থেকে ভালবাসা ভিক্ষে করার দরকার হবে না।''

সন্দীপ আমার সঙ্গে একমত হতে চেয়েও হতে পারে না। আমি ওর মুখ বন্ধ করে দিতে চাইলেও সে থামতে পারে না। বলে, ''কিন্তু ভগবান তো আমাদের এমনভাবে তৈরি করেননি যে আমরা একা একাই সবকিছু করে নিতে পারব। একা একা বাঁচতে পারব...''

''সবাই তো একইরকম নাও হতে পারে।''

''বলো না কোনটাকে তুমি বেশি গুরুত্ব দাও।''

সন্দীপ বলেছে ওর ঘরের যাবতীয় কাজ করার জন্য একটি ছেলে আছে। সার্ভিস থেকেই পেয়েছে সে। ছেলেটি রাতে সন্দীপের মশারি পর্যন্ত টাঙ্গিয়ে দেয়। তাই তার হাতে এখন অফুরন্ত সময়। কিন্তু আমি তো বসে থাকা মানুষ নই। আমার একজন ঠিকে কাজের লোক আছে। সে এসে ঘর মোছে, কাপড় কাচে এবং বাসন মাজে। রান্না থেকে শুরু করে ডাস্টিং, গোছানো এবং ঘরের অন্যান্য যাবতীয় কাজ আমাকেই করতে হয়। এছাড়া বাইরের কাজ তো আছেই। আমাকে অসুস্থ দেখেও রিলি রান্নাঘরকে পাকাপাকিভাবে টা-টা করে দিয়েছে। খাবার বেড়ে সামনে না ধরলে ঘরে বসে সারাদিন খালি পেটে কাটিয়ে দেয় অথবা জোমাটো, সুইগি, উবার ইট থেকে খাবার অর্ডার করে। বাইরের খাবার থেকে সমস্যা অনেক। দু'দিন যেতে না যেতেই দু'গাল ভর্তি ব্রোনো নিয়ে আমার পেছন পেছন ঘুরঘুর শুরু করে সে, ''দেখেছ গালের অবস্থা?'' আমাকে ব্রোনোর ঘরোয়া চিকিৎসা করতে করতে হিমশিম খেতে হয়। তাই আগেভাগেই সতর্কতা অবলম্বন করি। সকাল হতেই রান্নাঘরে পৌঁছে যাই। সন্দীপ আমাকে রান্নাঘর থেকে টানাটানি করে।

সন্দীপকে লিখি, ''আপনি আমাকে মেরে ফেলবেন মনে হচ্ছে।''

''নো ডিয়ার # আই আম আ রেসপনসিবল পার্সন!''

''আপনি কি মনে করেন যে আপনি নিজেকে রেসপনসিবল পার্সন হিসেবে প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন?''

''এই বয়সে এসে আর কিছু প্রমাণ করার নেই। আমার যা আছে তা আছে।''

সন্দীপ হঠাৎ এত গম্ভীর কেন হয়ে গেল বুঝলাম না। একটু বিরক্ত হলাম। সম্পর্ক নিয়ে আমি তো এত বিস্তৃত আলোচনায় যেতে চাইনি! আলোচনা করতে করতে মজার সূত্রপাত তো আমি করিনি! তাহলে এমন কেন? পিছুটান কেন? একটু থতমত খেয়ে আমি লিখি, ''আমি প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রশ্নটা করেছিলাম।''

''আমি জানি। আমি আসলে বলতে চেয়েছি আমি লোকদেখানো পছন্দ করি না।''

''কিন্তু আপনার যোগ্যতা আছে এবং আপনি নিজেও তা জানেন।''

''হ্যাঁ আছে। কিন্তু এই বয়সে ইমপ্রুভমেন্ট করা একটু কঠিন হবে।''

আমি ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করি। রান্না এখনও শেষ হয়নি। ব্রেকফাস্টও হয়নি। তার ওপর মনে হয় সন্দীপ কথাকে কোথাও একটা ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে থেমে যেতে চাইছে। জানতে চাইছে না লাইফ পার্টনার হিসেবে ওর কাছ থেকে আমি কি আশা করি। আমি ওকে এই দু'দিনে কি-ই বা জেনেছি! আমাকে কিভাবে রাখতে পারবে, আমার কি দায়িত্ব নেভাতে পারবে, আমার জন্য কি ত্যাগ করতে পারবে, কি গ্রহণ করতে পারবে তার কোন ধারণাই সে দেয়নি। না দিয়েই বলছে ইমপ্রুভমেন্ট করা একটু কঠিন হবে। চেপে দিতে চাইছে মোড় ঘুরে যাওয়া আলোচনা। চেপে যেতে চাই আমিও। লিখি, ''আমিও এখন একটু সিরিয়াস। আমি বিশ্বাস রাখি যে আপনি একজন ভালো মনের মানুষ। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। নিশ্চয় একজন মনের মতো সঙ্গী আপনি পেয়ে যাবেন।''

লিখেও কষ্ট পাই। মনে হয় আমি ওকে বুঝতে ভুল করলাম। বললাম, ''স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক টিকে থাকে কে কার জন্য বেশি করতে পারছে তার প্রতিযোগিতার ওপর। ঝগড়াঝাঁটি করলে চলবে না। প্লীজ, সরি, এক্সকিউজ মী ইত্যাদি শব্দগুলোর ব্যবহার শিখতে হবে। কোন সমস্যা হলে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান খুঁজতে হবে এবং আমাদের এই কথাটাকে অনস্বীকার্য সত্য হিসেবে মেনে নিয়ে রক্তস্রোতে মিশিয়ে ফেলতে হবে যে আজীবন দু'জনকে একসঙ্গেই থাকতে হবে।''

উত্তর আসে সন্দীপের, ''এগ্রীড।''

''যে সম্পর্ক সহজে তৈরি হয় তা ভেঙেও যায় সহজে।''

''এগ্রীড।''

''সত্যি?''

''আই মিন ইট।''

''সো নাইস অফ্ ইউ!''

এর পর ঘণ্টা দুই সন্দীপের দিক থেকে কোন সাড়া নেই। চিন্তিত হই, ভাবি আমার কোন কথা তার খারাপ লাগল না তো? ''কি ব্যাপার, চুপ হয়ে গেলেন যে? আপনি তো এত চুপ থাকেন না!''

''বাইরে আছি।''

সন্দীপের বাইরে থাকার অবসরে আমার মনে হয় এবার তার কথা রিলিকে জানানো প্রয়োজন। দু'জনের ছোট্ট পরিবার আমাদের। রিলি তিনদিন ধরে আমাকে অনবরত মোবাইলে মেসেজ পড়তে দেখছে, টকাটক মেসেজ করতে দেখছে, কখনো কখনো কথা বলতেও শুনছে। আমার আচরণ নিশ্চয় কিছু অস্বাভাবিক লেগেছে ওর। এখনও জিজ্ঞেস করেনি সম্ভবত দুটো কারণে। প্রথমত, তার নিজের ব্যস্ততা, দ্বিতীয়ত, আমরা একে অন্যকে তার একান্ত ব্যক্তিগত জীবনচর্চার জন্য জায়গা ছাড়তে অভ্যস্ত।

রিলি আমার মেয়ে হলেও আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। সবরকম আলোচনাই

হয় আমাদের মধ্যে। আমি ওকে এমনভাবে বড় করেছি যে সে যেন কোন ভয় বা জড়তা না রেখে তার সব কথা আমাকে বলতে পারে, প্রয়োজন হলে একাধিকবার প্রেম করতে পারে, একাধিকবার বিয়ে করতে পারে এবং ডিভোর্স হলে একাধিকবার আমার কাছে এসে আশ্রয় নিতে পারে।

আজ রিলির সাপ্তাহিক ছুটি। এমন দিনগুলোতে সে সাধারণত ফটোশুট করতে বেরিয়ে যায়। কিন্তু আজ দেখি ড্রয়িং রুমে সোফার উপর বসে আছে, এডিট করছে ফটো ইনস্টাগ্র্যামে আপলোড করবে বলে। চার বছর ধরে সে একটি ছেলের সঙ্গে প্রেম করছিল। তার নামও সন্দীপ। সন্দীপ যাদব। কয়েকমাস আগে ওদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে। রিলির সন্দীপ ফিলাডেলফিয়াতে থাকে। রিলির কাছ থেকে পাওয়া খবর হিসেবে ছেলেটি বিহারের বংশোদ্ভূত কিন্তু গত কয়েক পুরুষ ধরে তাদের পরিবারের ফিলাডেলফিয়াতে বসবাস। ছেলেটির সেখানেই জন্ম, সেখানেই বড় হওয়া। মা-বাবা তিন বছর আগে রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন। এক বোন, এক দাদা। দাদা বিজনেস করেন। বিবাহিত। বোন পড়াশোনা করছে। ছেলেটি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর স্টুডেন্ট। রিলির চেয়ে এক বছরের ছোট। এবার ফাইনাল সেমিস্টার দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত সে ইন্ডিয়ার মুখদর্শন করেনি। অর্থাৎ সামনাসামনি দেখাসাক্ষাৎ হয়নি তাদের। ছেলেটির জন্য রিলি পাগল ছিল। পাগলামির বশে আমাকে নির্মমতার সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে সে ফিলাডেলফিয়াতে পাড়ি দেওয়ার জন্য এক পায়ে খাড়া ছিল। সে ছেড়ে যাক, তার ছেড়ে যাওয়ার কথাতে আমি আমার জন্য নিরাপত্তার অভাব অনুভব করিনি। আমি উদ্‌বিগ্ন হতাম রিলির ভবিষ্যৎ নিরপত্তার কথা ভেবে। ওখানে গিয়ে কার পাল্লায় পড়বে, ভয়ানক ঝঞ্ঝাটে ফেঁসে যাবে কিনা সেই কথা ভেবে। রিলিকে যদি জিজ্ঞেস করতাম ইন্ডিয়াতে কোন ছেলে পেলে না? রিলি সোজা উত্তর দিত, না। যদি বলতাম, এই তিন চার বছরে তোমাদের একবারও দেখা হল না, তাছাড়া সে ওখানকার ছেলে, বিদেশি সংস্কার বইছে ওর রক্তে, তুমি কি মনে করো সে এতদিন পর্যন্ত ভার্জিন আছে? রিলি বলত, হ্যাঁ আছে, আমি ওর সঙ্গে কথা বলে ঠিক বুঝতে পারি। যদি বলতাম, তুমি ফিলাডেলফিয়াতে যাওয়ার আগে ওকে একবার ইন্ডিয়াতে আসতে বলো, রিলি বলত আসবে আসবে। সে আসছে না দেখে একবার বলেছিলাম ছেড়ে দাও, শুনে রিলি বলেছিল মাম্মা, এমনিতেই কাউকে বিশ্বাস করা যায় না—অনেক খোঁজাখুঁজি করে একজনকে পেয়েছি। খারাপ লেগেছিল। মনে হয়েছিল, সত্যিই তো সে যদি কারও কাছ থেকে নিখাদ ভালবাসা পাচ্ছে বলে বিশ্বাস করে তাহলে আমি তাকে বাধা দিয়ে ঠিক করছি না। আমার সঙ্গে রিলির বাদানুবাদ হলে অথবা অন্য কোন কারণে তার কোন মানসিক অবসাদ এলে সে ছেলেটির সঙ্গে কথা বলে মন ঠিক করে নিতে পারে। তবু অকারণে অনিষ্ট আশংকা থেকেই রিলির বাবার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে রাখি। উনিও ফিলাডেলফিয়াতেই থাকেন। রিলিকে বলি, তুমি ছেলেটির ঠিকানা দেবে, আমি আগে থেকেই ওঁকে দিয়ে ওর সব খোঁজখবর নিয়ে রাখব।

রিলির ব্যাপারে যতটা সম্ভব প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিয়ে আমি মোটামুটি নিশ্চিন্তে কলকাতায় গিয়ে কয়েকমাস কাটিয়ে পুনেতে আসি। দেখি ছেলেটির সঙ্গে সে আর

কথা বলছে না। জিজ্ঞেস করে জানি ওদের প্রেম কেটে গেছে। ছেলেটি ওকে এতদিন নিজের বলে যেসব ফটো পাঠিয়েছে সেসব আসলে কোন একটা মডেলের ফটো। এতদিন রিলি যেগুলোকে ছেলেটির বাইসেপস বলে জেনেছে সেগুলো আসলে সেই মডেলটির বাইসেপস। এতদিন রিলি যেগুলোকে ছেলেটির সিক্স-প্যাক বলে জেনেছে সেগুলো আসলে সেই মডেলটির সিক্স-প্যাক। কখনো ছেলেটি মডেলের পুরো মুখ পাঠিয়েছে, কখনো লম্বালম্বিভাবে কাটা অর্ধেক মুখ—মডেলের ইনস্টাগ্রাম থেকে যখন যেমন পেয়েছে। একবার সে নাকি বুক পর্যন্ত খালি গায়ের ফটো পাঠিয়েছিল। রিলি জিজ্ঞেস করেছে, কি করছ? ছেলেটি বলেছে, আমি আমার কলার বোন দেখাচ্ছি, হা হা হা।

ছেলেটি রিলিকে অনেক সাহায্যও করেছে। বছরখানেক আগে রিলির একবার ইনস্টাগ্র্যাম অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটিই উদ্ধার করে দিয়েছে সেই অ্যাকাউন্ট। রিলিকে বলেছিলাম, তোমার কাছেই জেনেছি ছেলেটির অনেক টাকা। তোমাকে যদি সে সত্যিই ভালবাসে তাহলে তোমার জন্য তার টাকা খরচ করা উচিত। রিলি প্রথমে মানতে চায়নি। আমাকে উপহাস করেছে আমি ভালবাসাকে টাকা দিয়ে মাপছি বলে। কিন্তু আমি ওকে বুঝিয়েছি আসলে তা নয়। ছেলেটির কাছে এক মিলিয়ন ডলার থাকলে সে তোমার জন্য এই অবস্থায় অন্তত পক্ষে দু'লাখ ডলার খরচা করার মানসিকতা রাখবে। একশো ডলার থাকলে পাঁচ ডলার খরচা করার মানসিকতা রাখবে। এই খরচাতে আমি অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে চাই না। এখানে আমি ভালবাসার গভীরতা দেখি। রিলি বুঝেছে এবং তার পর থেকে ছেলেটির কাছে প্রয়োজনমত নিজের বেশ কিছু চাহিদা মিটিয়ে নিয়েছে। ঠিকঠাকই চলছিল। সম্পর্ক বিগড়ালো ছেলেটির আসল রূপ জানার পর।

রিলি যখন আবিষ্কার করেছিল নিজের চেহারা নিয়ে ছেলেটি তাকে ধোঁকা দিয়েছে সে তাকে মডেলটির ফটো পাঠিয়ে মেসেজ করেছিল, ''এটা কে? আর তুমিই বা কে?''

ছেলেটি বলেছিল, ''আমি তোমাকে বলবই ভেবেছিলাম।''

''কবে? দশ বছর পরে?''

ছেলেটি চুপ।

''তোমার দাদার ফটোটাও কি...?''

''ধার করা।''

''বোনের?''

''ধার করা।''

''দাদার মেয়ের?''

''ধার করা।''

ব্যস, তার পরেই ব্লক লিস্টে চলে যায় রিলির সন্দীপ।

আমি অনুভব করতে পারি রিলি তখন নিশ্চয় মানসিকভাবে খুব ভেঙে পড়েছিল। শুনেছি ছেলেটি তাকে ছাড়তে চায়নি। ইনস্টাগ্র্যামে এসে রিলির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু রিলির দিক থেকেই আগ্রহ প্রায় মরে গেছে। সে ছেলেটির

দেওয়া আর কোন তথ্যের ওপর ভরসা রাখতে পারছে না। রিলি জিজ্ঞেস করেছিল, ''তোমার মা-বাবা সত্যিই কি মারা গেছেন নাকি বেঁচে আছেন?''

''সত্যি তাঁরা বেঁচে নেই।'' ছেলেটি অনেকবার সরি বলেছে। কিন্তু রিলি আপাতত ইন্ডিয়াতে এসে তাকে তার সঙ্গে থাকতে হবে শর্ত রেখে চুপচাপ বসে আছে।

রিলি আমার বন্ধু হলেও মাঝে মাঝে শত্রুর মতো ব্যবহার করে। আমার দ্বিতীয় বিয়ের এবং দ্বিতীয় ডিভোর্সের খবরটা সে-ই আমার পুনের এক বান্ধবীকে দিয়েছে। সেই বান্ধবী প্রচারের বাকি দায়িত্বটা নিজেই নিজের কাঁধে নিয়েছে এবং তা দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্নও করেছে। আমি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলাম কারণ আমি একা রিলিকে নিয়ে অসুরক্ষিত বোধ করতাম। সে তখন অনেকটা ছোট। মনে হত চারপাশে লোলুপ লোকজনের বিশেষত লোলুপ পুরুষের লোলুপ চোখ আমাদের একেবারে জীবন্তই খেয়ে ফেলবে। হায়না যেমন শিকার ধরে খায়, সেরকম। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। পঁয়তাল্লিশ বছরের আইবুড়ো খোকা বাড়িতে মা এবং দিদির আঁচলের নিচে বসে আমাকে আবেগভরা পাঁচশো মেল এবং পাঁচশো মেসেজ পাঠিয়েছে। আমি কয়েক বছর অপেক্ষা করে তাকে আজীবন মা-দিদির সেবা করার জন্য ছেড়ে দিয়েছি। এখন রিলি বড় হয়েছে। ভালমন্দ বুঝতে শিখেছে। ভালমন্দ বুঝেই সে আমার দ্বিতীয় বিয়ের খবরটা আমার বান্ধবীর কানে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

প্রথমে অসুবিধে হয়েছিল। পরে ভেবেছি ভুল তো কিছু করিনি। আমার জীবন তো আমাকেই চালাতে হবে। এতগুলো বছর একা রইলাম। একা অনেক প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করলাম—অ্যাকসিডেন্ট হলে একা এক হাতে কখনো গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে কখনো গিয়ার ঘুরিয়ে হসপিটালে গিয়ে ভর্তি হলাম, আমি বা রিলি অসুস্থ হলে একা সামলালাম সবকিছু, আরও কত বড় বড় সমস্যা এল—ছুটে আসা তো দূরের কথা কেউ তো কখনও একবারও ফোনেও জিজ্ঞেস করল না কোন প্রয়োজন আছে কিনা! এখন বয়স বাড়ছে। অসুখ বিসুখের সম্ভাবনা বাড়ছে, সক্ষম শরীর ধীরে ধীরে অক্ষমতার দিকে এগিয়ে চলেছে, শরীর মন চাইছে নির্ভরতা। এখন জীবনসঙ্গীর প্রয়োজন আরও অন্যভাবে অনুভব হচ্ছে। আরও গভীরভাবে।

শরীরের চাওয়া বলতে এই মুহূর্তে আমি যা বুঝি—সময়বিশেষে কাজ ভাগ করে নেওয়া—সন্দীপ তাই বুঝেছে কিনা আমি বুঝতে পারছি না। মেসেজে এখনও পর্যন্ত না বোঝালেও ফোনে কথাবার্থায় বুঝিয়ে দিয়েছে সে কোন মহিলাকে ভালবেসে শারীরিকভাবে কাছে পেতে চাইছে। আমি তাতে খুব খারাপ কিছু দেখছি না, অস্বাভাবিক কিছু দেখছি না। তবে আমি চাই এই ভালবাসা আরও সময় নিয়ে আরও মধুর হোক। আগে মানুষটি সারাজীবন পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিক, মাথার উপর ছাতা মেলে ধরুক, সেই ছাতার নিচে আমি নিরাপদ বোধ করি। তা না হলে অস্থির মন নিয়ে গোঁজামিলে ভরা হবে সেই স্বাদ। সন্দীপের কিছু কথা আমি রিলিকে বলি। পড়াই ওর মেসেজগুলো। রিলি ইনস্টাগ্র্যামের কাজ ছেড়ে আমাকে সময় দেয়, উপভোগ করে আমার জীবনের দরজায় টোকা দিতে থাকা নতুন মানুষটির মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলোকে। বলে, ''মাম্মা, এ তোমাকে একদমই মারবে না। লিখেই তো দিয়েছে রেসপনসিবল পার্সন।''

আমি তৎক্ষণাৎ সন্দীপকে ফোন করি, ''জানেন তো আপনার মেসেজ আমার মেয়েও পড়ে খুব মজা পেয়েছে?''

''যেমন?''

''সব মেসেজই। বিশেষত # রেসপনসিবল পার্সন। উপযুক্ত জায়গায় নিজের অনেক দায়িত্ববোধ দেখিয়েছেন।''

শুনে বুঝতে পারলাম ফোনের ওপাশের সন্দীপ চুপ হয়ে গেল।

''কি ব্যাপার কিছু বলছেন না যে?''

''ওটা আগেকার বানান ভুলের সংশোধন ছিল। তাই # দিয়ে লিখেছিলাম।''

''ওহ্ নো, আমি তো * দিয়ে কারেকশন করি।''

সন্দীপ একবার ফোনে বলেছিল মেসেজ পড়ে অনেক কথাই স্পষ্ট হয় না, মানুষের মুড বোঝা যায় না। তাই কোন সন্দেহ থাকলে ফোনে কথা বলে নিতে হয়। আর ফোনেও যদি ভুল বোঝাবুঝি থেকেই যায় তাহলে অন্তত একবার দেখা করে সামনাসামনি আলোচনা করে নেওয়া উচিত।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমি রিলির সঙ্গে আমাদের ঘরের কাছাকাছি একটা শপিং মলে বেরিয়েছিলাম। পুরোপুরি সুস্থ না হওয়ায় নিজে গাড়ি না চালিয়ে উবার ভাড়া করেই গেছি। নেমে সবে ভেতরে ঢুকছি এমন সময় আড়াই ঘণ্টা বাদে সন্দীপের মেসেজ, ''তোমার সব কথাগুলোর সঙ্গে আমি একমত...একমাত্র প্রতিযোগিতা ছাড়া।''

সময়ের কিছু গ্যাপ হয়ে যাওয়ায় প্রথমে বুঝিনি কি বলতে চাইছে সে। পরে মনে পড়ল—ও আমি ওকে লিখেছিলাম, ''স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক টিকে থাকে কে কার জন্য বেশি করতে পারছে তার প্রতিযোগিতার ওপর...''

ওকে বলি, ''ভালবাসা থেকে এটা হয়ে যায়।''

''ইয়েস, ভেরি ট্রু।''

''বলুন তো আমি এখন কোথায় আছি?''

সন্দীপ আমার কথার সঙ্গে সহমত হয়েও মনে খটকা নিয়ে থেকে যায়। লেখে, ''আমি কোন রিলেশনে দু'জনের মধ্যে কমপেটিশন দেখেছি। এটাকে পারলে এড়িয়ে চলা উচিত।''

তারপর তার আরও দুটো মেসেজ পাই, ''আশা করি তুমি কলকাতায় নেই।''

''এয়ারপোর্টে?''

তিনদিনের পরিচয়ে সে আমাকে অন্তত পক্ষে দশবার কলকাতায় যাওয়ার অনুরোধ করেছে। মনে মনে কতবার ভেবেছে তার হিসেব আমার কাছে নেই।

''না। আমি ক্রিয়েটিসিটি মলে আছি।''

দু'মিনিটের মধ্যেই নির্ঘাত ইন্টারনেট ব্রাউজ করে ক্রিয়েটিসিটি মলের বিশেষত্ব জেনে নিয়েছে সে। না হলে দু'মিনিটের মধ্যেই কেন লিখবে, সেখানে কি তুমি নতুন পালঙ্ক কিনতে গেছ?''

মলটা আমার খুবই ভালো লাগছে। আগে এটার নাম ছিল ইশানিয়া। এখন পরিবর্তন হয়েছে নাম। রিলি বারবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চাইছে আর আমি বারবার সন্দীপের মেসেজ পড়তে গিয়ে পিছিয়ে পড়ছি।

রিলি থেমে গিয়ে আমার হাত ধরে, ''শোনো, ওইপাশটাতে হোমসিটি আছে। সেখানে তুমি...''

''বলতে হবে না। খাট-পালঙ্ক থেকে শুরু করে ঘর সাজানোর সব জিনিস পাব তাই তো? ইশনিয়াতেও ছিল। সেখানেও বিভিন্ন রকমের ইন্টেরিওর ডেকোরেশনের সঙ্গে ঘরের মডেল আমি দেখেছি। এটা নতুন কিছু তো নয়।''

সন্দীপের মেসেজ আসে, ''...না হলে কোন ইভেন্টের জন্য গেছ।''

রিলি বলে, ''আর এইদিকটাতে আছে ইভেন্টসিটি। সেখানে তুমি ডাডি'স ডে আউট, কিড'স ফান টাইম, সামার আর্ট ক্লাব, গান-বাজনা অনেক কিছু পাবে।''

ভাবি, অদ্ভুত! সন্দীপ লোকটি কলকাতায় ঘরে বসে মোবাইল নিয়ে আমাকে তো ছেড়েই দিলাম, রিলিরও আগে আগে চলছে দেখছি। সে লেখে, ''বলো না কোন ইভেন্ট? লেখক-লেখিকাদের নিয়ে নাকি ফিল্ম ডিরেক্টরদের নিয়ে?''

আবার আমি পিছিয়ে পড়েছি। এবার রিলি বিরক্ত হয়, ''মাম্মা! চলো। এই দেখো, এদিকে আছে প্লেসিটি...''

সন্দীপকে বলি, ''আমি একটা মিটিং-এ আছি।''

''আমি তাহলে ঠিকই অনুমান করেছি বলো?''

আমরা পৌঁছলাম ফুডসিটিতে। মলে ঢুকতেই ফুডসিটি পড়ে। অর্থাৎ সন্দীপের পাল্লায় পড়ে এতক্ষণে আমরা মাত্র কয়েক মিটারই এগোতে পেরেছি। রিলি আমাকে যা দেখিয়েছে তা দূর থেকে হাত দিয়েই দেখিয়েছে।

ক্রিয়েটিসিটিতে বেশিক্ষণ থাকতে পারি না। রিলি সেখান থেকে তার কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবে বলে বেরিয়ে যায়। আমিও সন্দীপকে জানিয়ে দিয়ে ঘরের দিকে রওনা হই। সে লেখে, ''এত তাড়াতাড়ি ফিরছ যে?''

''আসলে দুপুর থেকে বাইরে আছি।''

কয়েকদিন আগে শৈবাল ঘোড়াই নামে একজন আমাকে মেসেজ করেছেন। উনি নাকি গ্রেড ওয়ান সরকারি অফিসার। স্কুল ইন্সপেক্টর। ট্রিপল এম এ, বি এড, বি এল আই এস, পি জি ডি সি এ, সি আই সি ইত্যাদি ইত্যাদি। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল থেকে পাশ করা। মা-বাবা দু'জনেই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। এখন অবসরপ্রাপ্ত। বাবা এখন ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা করেন। তিনটে বাস আছে। বাড়ি আছে, গাড়ি আছে। শৈবাল ঘোড়াই হলেন তাঁর মা-বাবার একমাত্র সন্তান। তাঁদের সন্ততি আছেন তিনজন।

ভদ্রলোক প্রথমে পরপর কয়েকটি মেসেজ করেছেন।

লিখেছেন, আমি একজন সত্যিকারের মানুষ চাই যে আমার ফ্রেন্ড, ফিলোসফার এবং গাইড হবে। আমিও তার একই হব। আপনি কি আমাকে পছন্দ করবেন? এখনই আমাকে বিয়ে করবেন? প্লীজ তাড়াতাড়ি উত্তর দিন।

লিখেছেন, আমি আপনাকে আমার লাইফ পার্টনার হিসেবে এবং ডব্লু বি সি এস, আই এ এস, রেল, পি এস সি, এস এস সি, নেট-সেট, টেট-ক্লাট, পলিটেকনিক, এন ই ই টি, জে ই ই, পাইলট ইত্যাদি পরীক্ষার কোচিং ক্লাসের জন্য বিজনেস পার্টনার হিসেবে পেতে চাই। আমার কামাল হোসেনের ফ্রানচাইজিও আছে।

সংবাদপত্রে নিজের কয়েকটি বিজ্ঞাপনের ছবি পাঠিয়ে লিখেছেন, আপনি আমার বিজনেস পার্টনার হিসেবে জয়েন করতে পারেন। আপনাকে শুধু আমার গড়িয়া, দমদম, শিয়ালদার কোচিং সেন্টারের ম্যানেজমেন্ট পার্টটা দেখতে হবে। প্লীজ তাড়াতাড়ি উত্তর দিন। এস এম এস অথবা কল করুন। বেশ কয়েকটি মোবাইল নম্বরও পাই।

মেসেজগুলোর মধ্যে কয়েকটি ফরওয়ার্ড করা। আমি একটু বিরক্তই হই, ''আপনার ডিপিটা আপলোড করুন!'' উনি তা না করে আমাকে আবার ফোন করতে বলেন। করি ফোন, ''ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটে আপনি আসলে কি খুঁজতে এসেছেন—লাইফ পার্টনার নাকি বিজনেস পার্টনার?''

''তার মানে আপনি আমার মেশেজ (মেসেজ) পড়ে কিছুই বুঝতে পারেননি,'' বলেই উনি কেটে দেন লাইন।

কথা বলার সুযোগ হারিয়ে রাগে গজগজ করতে করতে আমি তখনই মেসেজ ছাড়ি, ''আপনি তো নিজেই বিভ্রান্ত। বারোমিশালি লিখেছেন সব! কি শেখান ছাত্রছাত্রীদের? আর কতজনকেই বা পাঠিয়েছেন এমন মেসেজ? না চিনে না জেনে আমি আপনাকে এখনই বিয়ে করতে চাই! আপনি আমার বিজনেস পার্টনার হিসেবে জয়েন করতে পারেন। আপনাকে শুধু আমার গড়িয়া, দমদম, শিয়ালদার কোচিং সেন্টারের ম্যানেজমেন্ট পার্টটা দেখতে হবে—এসবের মানে কি? বউকেই যদি বিজনেস পার্টনার বানাবেন তাহলে এমনভাবে আলাদা করে বলার কি আছে?''

''আপনি আমার পলতার বাড়িতে আসুন।''

''সম্ভব নয়, কলকাতার বাইরে আছি।'' কিন্তু এর পরেও লোকটি আমাকে ভালো ভালো থট লেখা কয়েকটি স্টিকার পাঠান। আমি তাঁকে লিখি, আপনি আপনার নিকট জনের প্রতি সত্যি কি এমন অনুভূতি রাখেন? উনি লেখেন, নিশ্চয়।

কয়েকদিন পরে উনি পাঠালেন, এ ফ্রেন্ড ইন নিড ইজ আ ফ্রেন্ড ইনডিড। তার কয়েকদিন পরে আবার পাঠালেন, আপন পর হয় আবার পর আপন হয় তার ব্যবহার-আচরণ-মানসিকতায়। আমি ভেবেছিলাম উনি হয়ত আমাকে ভুলে গেছেন। তাই জিজ্ঞেস করি, ''আপনি কি আমাকে চেনেন?''

উনি লেখেন, ''ভারত ম্যাট্রিমোনিতে দেওয়া ইনফরমেশন হিসেবে আপনার আই ডি হল বি২৭৩৫৪২৩।''

''ডি পি কোথায়? আপনার চেহারাটাই তো এখন পর্যন্ত দেখলাম না।''

উনি আমাকে ওনার একটা ফটো হোয়াটসআপ করেন।

বলি, ''আমি কারও কাছ থেকে এভাবে ফটো চাই না। ডি পি আপলোড করলে সেখান থেকেই দেখে নিতে পারতাম।''

উনি নিজের আই ডি দেন। ''আপনার উত্তরের অপেক্ষা করছি।''

লোকটিকে অপেক্ষায় রেখে আমি এখন মেতে গেছি সন্দীপকে নিয়ে। আমার সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধে সন্দীপকে নিয়েই কাটছে। ক্রিয়েটিসিটি মল থেকে উবার ভাড়া করে পার্কিং-এর কাছে নেমেই সন্দীপের নম্বর ডায়াল করেছিলাম। ''হোয়্যার আর ইউ?''

''বাইরে আছি।''

''ইশ!''

''কেন?''

''অনেকদিন বাদে আজ ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। খুব ভালো লাগছে। তাই ভাবছিলাম আপনার সঙ্গে একটু কথা বলি।''

''কি বললে? গাড়ির আওয়াজে শুনতে পেলাম না।''

''অনেকদিন বাদে আজ বেরিয়েছিলাম। খুব ভালো লাগছে। তাই ভাবছিলাম আপনার সঙ্গে একটু কথা বলি।''

সে বলে, ''আমি ঘরে ফিরে তোমাকে কল করছি।''

ঘরে ফিরে আমি সন্দীপের নয় বরং একটা অচেনা নম্বর থেকে কল পাই, ''হেলো, আমি শৈবাল ঘোড়াই বলছি।''

''বলুন।''

''কি ভাবলেন আপনি?''

''দেখুন, আমি এখন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে আছি।''

''কোথায়?''

''মুম্বাই-এর কাছে।''

''কবে ফিরছেন কলকাতায়?''

''দু'তিন মাসের আগে সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না।''

''তাহলে তো অসুবিধা। আমি তো দেরি করতে পারব না।''

''আমি আপনাকে আমার জন্য অপেক্ষা করতে বলিনি স্যার! কলকাতায় অনেক ভালো মহিলা পাবেন।''

''ভালো চাইলেই কি আর ভালো পাওয়া যায়! আমি আসলে একজন শিক্ষিত মহিলাকে চাইছি। আপনার মতো। আমার মনে হয়েছিল আপনি আমার ব্যবসাটা ঠিকঠাক বুঝবেন।''

''সরি, আমি ব্যবসা বুঝি না। বোঝার ইচ্ছেও নেই। আমার লাইন আলাদা।''

''কি করেন আপনি?''

''লেখালেখি।''

''কি লেখেন? সিলেবাস বই?''

''না। গল্প, উপন্যাস।''

''তাহলে কি এমন আর আলাদা হল! আমি একজন স্কুল ইনশপেক্টর (ইনস্পেক্টর)। ভবানী ভবনে ডি আই অফিসে বসি। নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ফিফথ ফ্লোর, রুম নম্বর আট। আপনাকে তো আমি বলেইছি যে আমার কামাল হোসেনের ফ্র্যানচাইজি আছে। তাছাড়া আমার মাথায় একটা বড় বিজনেশ (বিজনেস) প্ল্যান

ঘুরছে। ব্যারাকপুরে বাবার যে বাড়ি আছে সেখানে বি এড, এম এড এবং ল কলেজ খুলব। কিন্তু একা অসুবিধা, সঙ্গে বউ ছেলেমেয়ে থাকলে ভালো হত।"

'আপনি এখন বিয়ে করলে এখনই কি আপনার ছেলেমেয়ে জন্ম নিয়ে বড় হয়ে যাবে?"

''না, তা হবে না। কিন্তু বউ তো থাকবে। আপনি কি ছেলেমেয়ে নিতে চান না?"

''সরি। আপনি অন্য মেয়ে দেখুন।"

''আরে না না, ছেলেমেয়ে না হলেও চলবে। ভালো লাগে কিন্তু না হলে কি আর করা যাবে!"

''আপনার বয়স কত?"

''আটচল্লিশ।"

''আমি যে আপনার থেকে বড়।"

''আমি প্রোফাইলে দেখেছি আপনার বয়স উনপঞ্চাশ বছর। তাতে কি হয়েছে! শচীন টেন্ডুলকরের বউ ওর চেয়ে ছয় বছরের বড়। আমি এগুলোকে কোন বাধা বলে মনেই করি না।"

''আপনার বাচ্চা ভালো লাগে তো এতদিনেও বিয়ে কেন করেননি?"

''সত্যি কথা বলতে কি, আমার মা-বাবা আমার বিয়ের জন্য কোন চেষ্টাই করেননি। আমিও এতদিন আমার চাকরি নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু এখন আর একদমই দেরি করতে চাইছি না। বিশেষত যখন স্কুলের ছেলেমেয়েদের একে অন্যের সঙ্গে আমিষ হাসি-ঠাট্টা করতে শুনি, রাস্তাঘাটে চলতে চলতে পার্কে বসা প্রেমিক-প্রেমিকাকে গল্প করতে দেখি তখম মনে হয় আমারও এমন একজন কাউকে দরকার। ওদের কিশ (কিস) করতে দেখলে আমি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ি। আমিও তো রক্ত-মাংসে গড়া একটা মানুষ। তাই ভাবছি বউয়ের কাছ থেকে ফিসিক্যাল (ফিজিক্যাল) শার্টিসফ্যাকশন (স্যাটিসফ্যাকশন)টা পেয়ে গেলে..."

আমি আর মোবাইল কানের কাছে ধরে রাখতে পারি না। কেটে দিই লাইন। রাত আটটা। বাইরে অন্ধকার। আমার ঘরে ছ'টা ছয় ওয়াটের এল ই ডি প্যানেল জ্বলছে। আলোর বিন্দুমাত্র অভাব নেই। তবু আমার মনে হচ্ছে জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকার ঢুকে পড়েছে ঘরে। আমি ঢেকে যাচ্ছি সেই অন্ধকারে। আমার গা গুলচ্ছে, বমি বমি লাগছে।

সন্দীপের মেসেজ পেলাম, ''তুমি তখন কিছু বলছিলে। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।" মেসেজ মোবাইলে আলো হয়ে জ্বলে উঠল, ঘরের অন্ধকার কেটে গেল। সেই আলো ট্যাবলেট হয়ে আমার গলা দিয়ে নেমে পেটে পৌঁছল, বমিও আর হল না।

''কল করুন প্লীজ।"

সন্দীপকে স্কুল ইন্সপেকটরের কথা বলতেই সে মজা করে, ''মনে হচ্ছে সে তোমাকে হোয়াটসআপেই বিয়ে করে নেবে।"

সন্দীপ বলে, ''আজ আমি আমার উপরের তলায় এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম।

...সে পার্টনারের সঙ্গে থাকে। তাকে তোমার কথা বললাম।"

"কি বললেন?"

"ওই আর কি! আমার একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে..."

"শুনে উনি কি বললেন?"

"জিজ্ঞেস করল, কোন পর্ণ সাইট থেকে পেয়েছিস নাকি?"

"আপনি কি বললেন?"

"পর্ণ সাইটে ভালো মেয়ে পাওয়া যায় না।"

"কি করেন আপনার বন্ধু?"

"লিভ টুগেদার।"

"ওহ্! কি জব করেন?"

"আই সি আই সি আই ব্যাংকে আছে।"

"তাঁর পার্টনার?"

"পার্টনারের বিউটি পার্লার ছিল। এখন উঠে গেছে বিজনেস।" সে বলে, "ওদের মধ্যে অনেক কিছুই হয় যা আমার পছন্দ নয়।"

"কি হয়?"

"ঝগড়াঝাঁটি হয়...থাক, সেসব কথা বলা যাবে না। তবু রিলেশন টিকে আছে। থাকবেও। আমি হলে ওইভাবে থাকতে পারতাম না।"

সন্দীপের বন্ধু নিয়ে এই মুহূর্তে আমার শুনতে ইচ্ছে করছে না। আমি অন্য প্রসঙ্গ পাড়ি। অন্য কথা বলি—অন্য কথা—অন্য কথা। সেই কথা আমাকে একটা স্বচ্ছ আলোময় রাস্তা দেখায়। কথাশেষে সন্দীপ একটা বইয়ের লিঙ্ক পাঠায় এবং ওর একটা ফটো পাঠায়। ফটোর নিচে সে লেখে, ওয়ান্স আপঅন আ টাইম। সেই ফটোতে আমি অন্তত পক্ষে পঁচিশ বছর আগেকার ছেলে সন্দীপকে দেখি। দেখি সে স্পীকারের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলছে।

অনিন্দিতাকে আমি সেই ছেলে সন্দীপের ফটো ফরওয়ার্ড করি। অনিন্দিতা বলে, "টাই বাঁধলে আরেকটু স্মার্ট লাগত।"

"ওহ্।"

"সরি।"

"কেন?"

"তোর খারাপ লাগতে পারে। মজা করছিলাম।"

অনিন্দিতার সঙ্গে আমার মেলামেশার প্রকৃতি সেই একই আছে, কম্পাঙ্ক সেই একই আছে। আগের মতই আছে আমাদের আন্তরিকতা। আগের মতই আমরা একে অন্যের আনন্দে আনন্দ পাচ্ছি, একে অন্যের কষ্টে কষ্ট পাচ্ছি, একে অন্যের সমস্যাকে নিজের মতো করে বুঝতে চাইছি। আগের মতই নিজেদের না পাওয়া পরস্পরের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে না অনিন্দিতার সঙ্গে এত বছর বাদে বন্ধুত্ব পুনস্থাপন করেছি। মনে হচ্ছে না মাঝখানের এতগুলো বছর আমরা বিচ্ছিন্ন ছিলাম। তবু হিসেব তো আছেই। আফসোস হচ্ছে মাঝখানের এতটা সময় নষ্ট হয়ে গেল ভেবে। আমার আফসোস নিয়ে অনিন্দিতা অবশ্য মোটেও মাথা ঘামাচ্ছে না। তার

মনোযোগ অন্যদিকে। সন্দীপের দিকে। সে বলছে, ''শোন, মালটা তোকে কলকাতা আসতে বলছে তো? আমি জুনের শেষে পুনে থেকে বিলাসপুরে ফিরে জুলাই-এর ফার্স্ট উইকে কলকাতায় যাব। তুইও সেই সময় কলকাতায় আয়। তোরা একসঙ্গে যেখানে ডিনার করতে যাবি সেখানে আমিও যাব। দূর থেকে তোদের দু'জনকে দেখব।''

সন্দীপ অনিন্দিতার কথা শুনে হাসে। বলে, ''তোমার বান্ধবীকে আমি একটা দূরবীন উপহার দেব।''

সন্দীপের সঙ্গে আমার একটা বিশাল ভুল বোঝাবুঝি হয় রাতে। খাবারের পরে তখন আমার ঘুমনোর সময়। নিশ্চয় সন্দীপেরও তাই। তবু ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে না পারলে ভালো লাগছে না। সারাদিন মেসেজ করেও, কথা বলেও শোবার আগে উপসংহার না টানলে আমার চলছে না। উপসংহার না টানলে মনে হচ্ছে পুরো দিনটাই একেবারে খালি গেল। আমি বুঝি সন্দীপও আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়, কথা বলতে না পারলে সন্দীপও এটাই মনে করে। আজ আমার কথা বলার বাহানা আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে—সন্দীপের কুড়ি বছর আগেকার সেই ফটোটি। ছেলে সন্দীপের ফটোটি। অনেক আশা নিয়ে পাঠিয়েছে সে। ভেবেছে আমি দেখব—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখব—তার চোখ-নাক-কান-গলা-কপাল-ঠোঁট। দেখব কি রঙের শার্ট পরেছে সে। দেখব তার মুখের সেই সরল অভিব্যক্তি। হয়ত স্নেহে সেই ছেলে সন্দীপের কপালে আমার ঠোঁট দুটো ধীরে ধীরে নেমে বসে যাবে, ছোট্ট করে একটা চুমু দেবে সেখানে। হয়ত প্রেম-ভালবাসা থেকে আমার ঠোঁটদুটো সেই ছেলে সন্দীপের ঠোঁটদুটোকে স্পর্শ করতে চাইবে। করবেও স্পর্শ। চুমু দেবে—যেইভাবে প্রেমিকা প্রেমিককে চুমু দেয় ঠিক সেইভাবে। গভীর হবে সেই ভালবাসা। গভীর হবে চুমু, চুমু গভীর হয়ে পঁয়ত্রিশ বছরের ছেলে সন্দীপকে নিয়ে যাবে পঞ্চান্ন বছরের পুরুষ সন্দীপের কাছে, ডুবে যাব আমি পুরুষ সন্দীপের বুকের ভেতর গরম হতে থাকা অতলস্পর্শী সাগরে।

আমি সন্দীপকে লিখি, ''লিটল জেন্টলম্যান।'' সঙ্গে সঙ্গেই সন্দীপ আমার মেসেজ পড়ে। কিন্তু তিন মিনিট পর্যন্ত কোন উত্তর দেয় না। সন্দেহ জাগে মনে, মেসেজটাকে কি তাহলে সে পছন্দ করল না? কিছু ভুল করে ফেললাম কি? তিন মিনিট পরে রাত এগারোটা উনচল্লিশে সে লেখে, ''তুমি জানো এর মানে কি হয়? তোমার মেয়েকে জিজ্ঞেস করো। আমি জানি না তুমি আসলে কি বলতে চেয়েছ। সেই জন্য আমি চুপ হয়ে গিয়েছিলাম।''

আমি সন্দীপের বুকের সেই অতলস্পর্শী সাগরের গরম জল ঝেড়ে উঠে পড়েছি। তৎক্ষণাৎ। শরীর এখন আর গরম নেই। এক মুহূর্তে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে শরীর। কাঁপছে ঠাণ্ডায়। এতটাই ঠাণ্ডা যে সেই অনুভূতিকে আমার গরম বলেই মনে হচ্ছে। কারণ আমার কান লাল হয়ে গেছে, সেখান দিয়ে লজ্জার বিদ্যুৎ দ্রুত গতিতে ঝাঁ ঝাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ তো গরমই হয়। আমার মনে পড়ে সে আমাকে বলেছিল আজকালকার ছেলেমেয়েরা কত আলাদাভাবে টেক্সটিং করে। কত সংক্ষেপে, পুরো শব্দ না লিখে। কত আলাদা আলাদা শব্দের কত আলাদা আলাদা মানে বোঝে ওরা।

কত কোড ওয়ার্ড থাকে ওদের। তাহলে কি লিটল জেন্টলম্যান বলতে সন্দীপ ছেলেদের লিঙ্গ বুঝেছে! কাট্টি বাট্টি মুভিতে কঙ্গনা রানায়ত ইমরান খানকে বলছে শুনেছি, পরেশান হো গয়ী তুমহারি আদত সে। হাইজিন নাম কী ভী কই চীজ হতী হ্যায় ক্যা নহী? কিতনা মুশকিল হ্যায় পট মে স্ট্রেট সুসু করনা? জাস্ট হোল্ড দ্য লিটল সোলজার অ্যান্ড এইম! য়ে ক্যা কই শ্যাম্পেন কী বটল হ্যায় জিসসে পাকরকে হর জাগা ঘুমাওগে অউর গিরাওগে?" কিন্তু আমি এবং সন্দীপ সহমত ছিলাম যে আমাদের জন্য পুরো শব্দ লিখে সহজ কথার সহজ মানে বুঝে মেসেজ করার পদ্ধতিটা একদমই পারফেক্ট। আমি ওকে লিখি, ''ভালো মানেটা বুঝুন সন্দীপ। আপনি তো বলেইছিলেন যে আজকালকার ছেলেমেয়েদের মেসেজের ভাষা আপনার কঠিন লাগে।"

সন্দীপ বলে, ''আমার খুব মন খারাপ হয়েছিল। বুঝতে পারছিলাম না কি করা উচিত।"

''কেন এত সিরিয়াসলি নিলেন কথাটাকে?"

''কেননা এই মেসেজের মানে এটাই হয়...আমি আর এগোতে চাই না...গড ব্লেস ইউ।"

মানে বুঝি না। জিজ্ঞেস করি, ''কি?"

'এটা একটা গুড-বাই মেসেজ।"

আবার মানে বুঝি না। লিখি, 'ওহ্, আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান না? ঠিক আছে।"

''না না তা নয়। আবার কিছু ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। প্লীজ আমাকে ফোন করো। কথা বলি।"

''অনেক রাত হয়ে গেছে। আপনার ঘুমনো দরকার।"

''না। ফোন করো। বেশি সময় নেব না। মাত্র এক মিনিট। প্লীজ, আমি তোমাকে ব্যাপারটা এক্সপ্লেন করতে চাই।"

সন্দীপকে ফোন করতে গিয়ে আমার হাত কাঁপে। জানি সে-ই কথা বলতে চেয়েছে। কিন্তু অনুমান লাগাতে পারি না সে কি বলবে। মাথায় আসে না আমিই বা কি বলব জবাবে। কি করি? সন্দীপ ছাড়তে চাইছে না। শেষে মনে দম লাগিয়ে নম্বর ডায়াল করি ওর। সে কিছু বলার আগেই ভেতরের ঠাণ্ডা গরম সব অনুভূতি মুখ দিয়ে ঠেলে বের করে দিই, ''সন্দীপ, আমি অনেকবার বলেছি যে আমি একজন ভদ্র মহিলা। আমি কাউকেই কখনও নোংরা মেসেজ করি না। কারও সঙ্গেই নোংরা কথা বলি না। আপনি কেন এমন ভাবলেন বলুন তো?"

''আমি জানি রূপা। তবু মনে হল আমাদের মনের যাবতীয় সন্দেহ দূর করে ফেলা উচিত।"

আমরা আবার অনেক কথা বলি। সে তার মতো করে বোঝায় আমাকে। আমি আমার মতো করে তাকে। ফোন রেখে আমি সকাল থেকে সন্দীপের সঙ্গে যে মেসেজ বিনিময় হয়েছে তার সব পড়ি। বুঝি আমরা দু'জন আলাদা জায়গা থেকে কথা উঠিয়ে সমস্যার সমাধান করে নিয়েছি। তবু মনে আবার অশান্তি। কি জানি এবার সে সত্যি সত্যিই আমার ডিকশনারি থেকে লিটল জেন্টলম্যানের মানেটা বের

করে ফেলল না তো!

ভোর পাঁটা চৌত্রিশে সন্দীপ মেসেজ করে, ''গুড মর্নিং।''

ছ'টা সাতে লেখে, ''তোমার কথা ভাবছিলাম।''

রাতে মোটেও ঘুম হয়নি। তার ওপর একের পর এক বিভ্রান্তির ঝামেলা আমায় গ্রাস করে রেখেছে। ইচ্ছে করছে না সন্দীপের মেসেজের উত্তর দিতে। মনে হচ্ছে এবার সময়কে কিছু সময়ের জন্য এমনি এমনি পেরিয়ে যেতে দেওয়া উচিত। দু'য়েকদিন যাক তারপর না হয় কথা বলব। কিন্তু সন্দীপ আমার মনে হওয়ার নাগাল পাচ্ছে না। দু'য়েকদিন তো অনেক দূরের কথা দু'য়েক ঘণ্টার জন্যও চুপ থাকতে পারছে না সে। অনবরত কিছু না কিছু লিখেই চলেছে। হেরে যেতে চাইছে আমার কাছে। বলছে, ''তুমি আমাকে পাগল করে দেবে।''

''কেন এমন মনে হচ্ছে?''

''তুমি জানো কেন।''

''জানি না।''

''আমার ভেতরে কিছু তো হচ্ছে।''

''যেমন?''

''আগে যে নাস্তিক ছিল সে এখন ভগবানকে বিশ্বাস করতে চলেছে। আমি বুঝতে পারছি কিছু একটা চাওয়া থেকে...কিন্তু আমি জানি না সেটা আসলে কি।''

''ঠিক বুঝতে পারলাম না। মেসেজের প্রথম অংশটা ঠিক ছিল কিন্তু পরের অংশটা অন্যরকম লাগছে।''

''আমার শরীরে, মনে ভালবাসার ভাইরাস ঢুকে পড়েছে।''

''তাহলে আপনার ধীরে ধীরে আমার সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দেওয়া উচিত।''

''কেন? আমার মনে হচ্ছে আমার অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন।''

''তাই নিন।'' কথা ঘুরিয়ে দিই, ''গতকাল রাতে আমাদের আবার একটা সাংঘাতিক ভুল বোঝাবুঝি হল জানেন? আপনি যা বলতে চেয়েছেন আমি তা অন্যভাবে বুঝেছি এবং আমি যা বলতে চেয়েছি তা আপনি অন্যভাবে বুঝেছেন। গড়বড় সব। যাই হোক, সমস্যার সমাধান আমরা করেই ছেড়েছি, যেভাবেই হোক আমরা বুঝেই ছেড়েছি।''

''তুমি জানো কি আমিও তাই ভাবছিলাম? আমরা আলাদা আলাদা বুঝলেও দু'জনেই কিন্তু নিজেদের মতো করে উপভোগ করেছি। তাই তো বলছি কিছু একটা শক্তি তো আছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এবং সেই কিছু একটা শক্তিকে আমি আমাদের মাঝখানেও অনুভব করছি।''

''আমি শুরুতেই খুব বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম তাই আপনার মেসেজটা বুঝে ওঠার ধৈর্য রাখতে পরিনি। বুঝলে আপনাকে বলার সুযোগ পেতাম গতকাল দুপুরে আমি আপনাকে গড ব্লেস ইউ কেন লিখেছিলাম। এর মানে আমি জানি। মেয়েকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই।''

''বলো কেন।''

আমি এখন আর কারণ বলি না। বলি, ''জানি গতকাল দুপরে আপনি সেই

জন্যই চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তো আমিই আবার আপনাকে মেসেজ করেছিলাম।"

"সেটা আমি বুঝতে পেরেছি।"

সন্দীপ আবার যথাস্থানে ফিরে আসে, "আমার মনে হয় আমার অ্যান্টিবায়োটিক তোমার কাছেই আছে।"

সন্দীপ বলেছে ওর ভেতরে কিছু হচ্ছে। কিছু তো আমার ভেতরেও হচ্ছে কিন্তু আমি ওকে তা বলতে চাইছি না। হেরে যাচ্ছি জেনেও এত তাড়াতাড়ি হার মানতে চাইছি না। আমি বিশ্বাস করি—বিশ্বাস করা উচিত হলেও করি, না হলেও করি—আমি বিশ্বাস করি—যে সম্পর্ক যত তাড়াতাড়ি গড়ে ওঠে সেই সম্পর্ক তত তাড়াতাড়ি ভেঙে যায় এবং আমি তাকে লিখেওছি তা। আমি চাই না সন্দীপও এত দ্রুতগতিতে ওর মনের সব দুর্বলতা আমার কাছে প্রকাশ করে ফেলুক। এত দ্রুতগতিতে অন্য সব পুরুষের মতো ওর কাছে যা আছে সব আমাকে ঢেলে দিক, ঢেলে দেওয়ার প্রস্তাব পর্যন্ত রাখুক, এত দ্রুতগতিতে ছিনিয়ে নিক আমার কাছে যা আছে সব। আমি চাই না অতি শীঘ্র দেওয়া-নেওয়ার পালা শেষ করেই সে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাক, সারাজীবনের মতো। আমার ভয় হয় পাছে আমি ওর মধ্যে আমার জীবনে আসা অন্য সব পুরুষের ধর্ম আবিষ্কার করে ফেলি। আমি ওকে আগলে আগলে রাখতে চাই, বড় আদরে। আমি ওকে ভালবাসতে চাই, আমার মতো করে। আমি চাই ওর চাওয়া আমার চাওয়া এক হয়ে যাক। এক হয়ে গিয়ে তৈরি করুক আমাদের চাওয়া। সেই আমাদের চাওয়া তৈরি করুক দু'জনের ভালবাসার এক নিখুঁত মিশ্রণ। আমাদের পরস্পরকে চেনা এখনও অনেক বাকি।

আমাদের পরস্পরকে চেনা যে এখনও অনেক বাকি তা সন্দীপও বোঝে। আমি ওর মন আরও পড়তে চাই। ফটোতে আমি যেমন তাকে দেখেছি, কথা বলে তার চেহারার যে বিবরণ পেয়েছি তাতে আমার মনে হয় না সে আমার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। সন্দীপ অবশ্য আমার মতো নয়। সে মেয়েদের মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে। সমানুপাতে আছে কিনা দেখে। আমি সন্দীপকে বলেছিলাম, আমি আপনার উপযুক্ত নই। সে উল্টোটা বলেছে। কেন জানতে চাইলে বলেছে আমি অনেক ধনী, আমার স্টেটাস আলাদা, রকমসকম আলাদা, এই আলাদা, সেই আলাদা, অনেক কিছু আলাদা। তবু সে ভালবাসার ভাইরাসের কবলে পড়ে কাহিল, আমার কাছে ভাইরাসের চিকিৎসা আছে বলে মনে করছে।

সন্দীপের অ্যান্টিবায়টিকের প্রসঙ্গ পাল্টাই, "খুব ক্লান্ত। আজ আমাকে ঘুমোতে হবে। অনেক লিখতেও হবে।"

"ঠিক আছে।"

রান্না শেষে আমি ওকে মেসেজ করি, "মনে রাখবেন তো আপনি আমাকে বলেছেন যে আপনি আমার উপযুক্ত নন?"

"না মনে রেখে আর কি করতে পারি?"

"আর কি করতে পারেন? জানি না।"

"কি জানো না?"

"আপনি বলেছেন আপনি আমার উপযুক্ত নন। তাহলে আমাকে কি করতে

হবে তা আমি বলতে পারি।"

"বলো।"

"আবার গড ব্লেস ইউ বলতে হবে।"

"তাহলে কি গড আমাকে উপযুক্ত বানিয়ে দেবেন?"

"কি করে বলব! ভগবান তো কোনকিছুই খোলাখুলি বলেন না।"

"রূপা, আমাকে একটা জিনিস বলো—তুমি তোমার হার্টের চাবিটা কোথায় রেখেছ?"

"ভগবান রেখেছেন। উনি আমাকে বলেননি কোথায়।"

"চলো, আমরা ভগবানের কাছে যাই।"

"এখন উনি সেই গ্রামে আছেন যেখানে আমার জন্ম হয়েছে, যেখানে আমি বড় হয়েছি।"

"তুমি তোমার বাবার কথা বলছ? চলো, তাঁর কাছেই যাই।"

"বাবা নন সন্দীপ—ভগবান। আমি তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। উনি বলেছেন চাবি সেখানেই আছে। আপনাকে একা গিয়ে তা নিয়ে আসতে হবে।"

"ঠিক আছে। আমি নিয়ে আসব। তুমি আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দাও।"

হঠাৎ আমার সন্দীপের সেই ১৪৪০ ঘণ্টার হিসেবের কথাটা মনে পড়ে। সেটা মাথায় রেখে একটা লম্বা চওড়া মেসেজ তৈরি করি তার জন্য। "আপনাকে সেখানে পায়ে হেঁটেই যেতে হবে। হাঁটতে থাকুন—এক কিলোমিটার বাঁদিকে, তারপর এক কিলোমিটার ডানদিকে, তারপর আবার এক কিলোমিটার বাঁদিকে, আবার এক কিলোমিটার ডানদিকে...যতক্ষণ পর্যন্ত না ১৪৪০ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়েছে। ১৪৪০ ঘণ্টা পরে যেখানে পৌঁছবেন সেখানেই দাঁড়িয়ে যাবেন। দেখবেন একটা গ্রামের মেয়ে আপনার সামনে চাবি হাতে দাঁড়িয়ে আছে।"

মেসেজ পড়ে সন্দীপ আবার আমায় দেখার জন্য ব্যাকুল হয়। বলে, "১৪৪০ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে!"

"কিন্তু সেই চাবি পেলেও আপনার কোন লাভ হবে না।"

"কেন? হার্ট নেই?"

"না হার্ট আছে। কিন্তু হার্টটা খালি আছে। হার্টের সব জিনিসগুলো মাথায় গিয়ে জমা হয়েছে।"

"তুমি এখন যুক্তিতে ফিরে এসেছ। বলছ, তোমার হৃৎপিণ্ডের সবকিছু ব্রেনে গিয়ে জমা হয়েছে। তার মানে তোমার হৃৎপিণ্ড একদম খালি, সেখানে আবেগ বলেও কিছু নেই। তাই কি?"

"ব্রেনই তো সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। নিশ্চয় তার মধ্যে ইমোশনও আছে।"

"আমি যা বুঝেছি তা হল তোমার হার্টে কিছু ভ্যাকেন্সি আছে...যেহেতু সেখান থেকে কিছু জিনিস ব্রেনে বদলি হয়েছে। খালি মানে হল খালি, একেবারে শূন্য। হার্ট হল আবেগের প্রতীক, সেটা একেবারে শূন্য থাকতে পারে না। আবেগকে সেখানে থাকতেই হবে।"

সন্দীপ বুদ্ধিমান। অনেকই বুদ্ধিমান। এতটাই বুদ্ধিমান যে তার কাছে আমার যুক্তি

টিকছে না। হারিয়ে দিচ্ছে সে আমাকে। কিন্তু এত সূক্ষ্মভাবে, এত কোমলতার সঙ্গে, এত প্রেম দিয়ে আমাকে সে হারাচ্ছে যে আমি পরাজয়ের গ্লানি একদমই অনুভব করছি না। উল্টে ভালো লাগছে। ইচ্ছে করছে আবার হারতে। আবার হারতে হলে আবার লড়াই শুরু করতে হবে। একবার হেরে থেমে গিয়ে ইতি টেনে দিলে তো চলবে না। লিখি, ''হয়ত আপনি ঠিক বলছেন। কিন্তু আমি জানি আমার আবেগের কিছু অংশ ব্রেন দ্বারাও পরিচালিত হচ্ছে। অর্ধেক আবেগ অর্ধেক কাজ করবে। তাই ব্রেনের আবেগকে যদি পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে আসি তাহলে হৃৎপিণ্ডের আবেগ এবং ব্রেনের আবেগের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হবে।''

''ব্রেনের আবেগের সঙ্গে কোন যুদ্ধ বাধিও না। তুমি পাগল হয়ে যাবে।''

''হয়ত হব না। তবে যে কেউ এই দ্বন্দ্ব থেকে তার লাভ উঠিয়ে নিতে পারে। ব্রেনের আবেগের এত শক্তি নেই যে তা আমাকে নতুন কাউকে পাওয়ার মোহে পুরনো ভালবাসাকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য করবে।''

''ভেরি ট্রু। তাই তো বলেছি তুমি খুব যুক্তিসম্মত কথা বলো।''

''ইয়েস।'' মন খুঁত-খুঁত করে। নিজেকে নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে না তো! বলি, ''জানি না। সন্দীপ আপনি খুব সুন্দর।''

''রূপাও একজন খুব সুন্দর মহিলা।''

''রূপা নয়। আমার অফিশিয়াল নাম ধরে ডাকুন।''

''আমার কাছে তুমি হলে রূপা।''

''ঠিক আছে। আপনি যতবার আমায় রূপা বলে ডাকবেন আমি ততবারই তাকে আমার অফিশিয়াল নামে ডিকোড করে নেব।''

বিকেল চারটে পাঁচে সন্দীপ লিখল, ''এত চুপ হয়ে গেলে যে? তুমি যদি এখন আমার সামনে থাকতে আমি তোমার চোখের ভাষা দিয়ে তোমার ঠোঁটদুটোকে পড়ে ফেলতাম।'' তারপর চারটে দশের মেসেজে সে কি বোঝাতে চাইল তা আমার কাছে স্পষ্ট হল না কিন্তু আমার মনে হল সে বলতে চাইছে যখন একজন মহিলা তার সমস্ত আবেগ ভালবাসা দিয়ে কোন পুরুষের মঙ্গল কামনা করে কিংবা উল্টোটা হয় তখন তাদের মধ্যে হঠাৎ করে ঘনিষ্ঠতা তৈরি নাও হতে পারে। ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় প্রতিদিনের দরদ দিয়ে মেলামেশার ফলে। এবং একবার যদি তারা পরস্পরের কাছে এসে এক হয়ে যায় তাহলে সেই এক হয়ে যাওয়া পরস্পরের বেঁচে থাকাকে অনেকখানি সহজ করে দেয়। তাদের জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্ত হয়ে ওঠে এক মূল্যবান মুহূর্ত, প্রত্যেকটা দিন হয়ে ওঠে এক মূল্যবান দিন।

চারটে চৌদ্দতে সে বলে, ''আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটা খুব সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি।''

''আমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে দুই কিলোমিটার হেঁটেছি।''

''ট্রেডমিলে?''

''হ্যাঁ।''

আমার জীবনদর্শন সন্দীপের জীবনদর্শনের সঙ্গে মেলে না। সন্দীপ কেন স্ত্রীর থেকে আলাদা হয়ে যেতে চাইছে তার সুস্পষ্ট ধারণা আমার নেই। সে আমাকে যা

বুঝিয়েছে তা হল সে তার স্ত্রীকে কখনও মনের কাছাকাছি পায়নি। সে বলেছে সে মেয়ে না দেখেই সোজা ছাঁদনাতলায় বসে পড়েছিল বিয়ে করতে। এমন বিয়েকে আমি আগেকার দিনের সামাজিক বিয়ে বলে জানি যেখানে স্বামী স্ত্রীর মন পড়ার আগেই তার শরীর পড়ে ফেলে। নিজের শরীরের এবং তার শরীরের সমন্বয়ে তৈরি করে নতুন প্রাণ। নতুন প্রাণ তৈরির পরেও চলতে থাকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। যতদিন পর্যন্ত শরীরের চাহিদা অদমনীয় থাকে স্ত্রী মন থেকে দূরে থাকলেও তা স্বামী অনুভবই করে না অথবা অনুভব করলেও মনে হয় না যে সেই দূরত্ব একেবারেই অতিক্রম করা যাবে না। স্ত্রীর থেকে শারীরিক চাহিদা কিছুটা মিটে গেলে শুরু হয় স্ত্রীর মন নিয়ে তার গম্ভীর হিসাব-নিকাশ।

কখন থেকে, ঠিক কি কারণে, একটি কারণে নাকি অনেকগুলো কারণে স্ত্রীর সঙ্গে সন্দীপের মানসিক দূরত্ব অনতিক্রম্য বলে মনে হয়েছে আমার জানা নেই। হতেই পারে তার স্ত্রী তাকে অনেককিছু পাওয়া থেকে বঞ্চিত করেছেন। আমি জানি আমি আমার মনের সমস্ত আবেগ ভালবাসা একজনের কাছে ঢেলে দিয়েছিলাম। তবু তার সঙ্গে আমার সেই ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়নি। ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়নি বলেই আজ এত চেষ্টার পরেও সে আমার শরীর থেকে, মন থেকে এত দূরে। সত্যিই দূরে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যে শারীরিক এবং মানসিক বন্ধনে টিকে থাকে সে বন্ধন আমাদের মধ্যে নেই। অনেক বছর ধরে নেই। আমার সেই একসময়ের ভালবাসার লোকটি ডিভোর্সের পরে আজও আমার পাশে আছে। আমাকে অর্থনৈতিকভাবে অনেকই সাহায্য করছে। তার পেনশন অ্যাকাউন্টের এবং স্যালারি অ্যাকাউন্টের ডেবিট কার্ড আমার কাছে আছে, স্যালারি অ্যাকাউন্টের সই করা চেকবই আমার কাছে আছে, তার সই করা এ-ফোর সাইজের সাদা কাগজের গুচ্ছ আমার কাছে আছে। তার আধার কার্ড থেকে শুরু করে শিক্ষাগত যোগ্যতার মানপত্র এবং আরও অনেক কিছুই আমার কাছে আছে। যে কোন সময় প্রয়োজন হতে পারে ভেবে তার যতকিছু জরুরি কাগজপত্রের ফটোকপি সই করে আমারই কাছে রেখেছে সে। তার মাসিক অ্যালাউন্সের একটা বড় অংশ আমারই অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে। প্রতি বছর পাওয়া দীপাবলীর উপহারটিও তার কম্পানি থেকে আমারই ঘরের ঠিকানায় পৌঁছে যাচ্ছে। যতটুকু খবর আছে সেই হিসেবে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো আজও একইরকম অবিভক্ত আছে। আমরা কোথাও একসঙ্গে ঘুরতে গেলে তৃতীয় ব্যক্তির বোঝার উপায় থাকে না যে আমরা আলাদা, স্বামী-স্ত্রী নই। তবু আলাদা তো আমরা বটেই। আমার সামান্য অসুস্থতায় আমি সকালে বিকালে তার ফোন পাই, বেশি অসুস্থ হলে দেশের বাইরে বসে সে লোক ঠিক করে দেয় যে এখানে আমার দেখাশোনা করতে পারবে। আমি এটাও জানি আমি মরণাপন্ন হলে সেই লোকটিই সবার আগে সাড়ে চার হাজার কিলোমিটারের দূরত্ব অতিক্রম করে আমাকে বাঁচাতে ছুটে আসবে। এত কিছুর পরেও বলব সে আমার বেঁচে থাকাকে এতটুকু সহজ করেনি। বরং কঠিন করে দিয়েছে আমার বর্তমানকে, অসুরক্ষিত করে দিয়েছে আমার ভবিষ্যতের দিনগুলোকে। বেশ কিছু বছর আমি আমার সেই ভালবাসার মানুষটির সঙ্গে একই ছাদের নিচে থাকি না। থাকতে পারি না। দুরভিসন্ধিসম্পন্ন লোকজন দেখে আমার সঙ্গে কোন পুরুষ মানুষ

নেই। শুধু পুরুষ কেন, মহিলাও নেই। আমি একা। তারা ঠিকই জানে। সুতরাং আমার জীবনদর্শন এই মুহূর্তে সন্দীপের জীবনদর্শনের সঙ্গে একশ শতাংশ মিলছে না। কিন্তু মিলছে না বলেই যে আমি তার দৃষ্টিকোণ থেকে আবার জীবন এবং সম্পর্ককে নতুন করে বোঝার চেষ্টা করতে চাইছি না তাও নয়।

সন্দীপ আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, মানুষ কিভাবে সুখী হয়? আমি বলেছিলাম সুখের অনুভূতিটাও মানুষ বিশেষে আলাদা। খারাপ লোকেরা ভুল দোষ অপরাধ করে, অন্যকে কষ্ট দিয়ে সুখ পায়। আমি এটাকে অর্জিত সুখ বলে মনে করি। ভালো লোককে সুখ অর্জন করতে হয় না। সততা, ন্যায়পরায়ণতার জন্য সুখ তাদের প্রাপ্য থাকে।

সন্দীপ বলেছিল, ''আমি অপরাধ করে এবং অন্যকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাই না।''

তাহলে আপনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন। আপনি নিশ্চয়ই সুখী হবেন। সন্দীপ রায় তো আমাকে বলেইছেন যে উনি নাস্তিক থেকে আস্তিক হয়েছেন। তাঁর ভগবান নিশ্চয় তাঁকে সুখের সঠিক রাস্তা দেখিয়ে দেবেন।

''তাই হওয়া উচিত। কিন্তু...''

''কিন্তু কী?''

''কিন্তু সেই ইটারনাল ব্লিস আমি কেমন করে পেতে পারি? কখন পেতে পারি? ১৪৪০ ঘণ্টা পরে নাকি ১৪৪০ বছর পরে?''

''আমাকে দেখার জন্য এতটাই ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন?''

''তুমি বিশ্বাস করবে না।''

''আপনি আমাকে খুব লজ্জা দিচ্ছেন সন্দীপ। আমি একজন অতি সাধারণ মহিলা।''

''না না রূপা।''

''ইশ্, আমার নাম ধরে ডাকলে খুব অসুবিধে হয়।''

''কি অসুবিধে?''

''আমি এতদিন আমার চারপাশের লোকজনকে অনেক কঠিন বলেই জেনেছি। তাই কেউ আমাকে এত কাছে টানলে কেমন কেমন লাগে।''

''কেমন কেমন লাগে? একটু না হয় কেমন কেমন লাগলই...''

''জীবনে এমনিতেই আরও অনেক সসম্যা আছে। এটা একটা অতিরিক্ত সমস্যা নয় কি? হা হা হা।''

''জানি একটু কঠিন। তবু তোমাকে মেনে নিতে হবে।''

সন্দীপ আবার আমাকে একটা বইয়ের লিঙ্ক পাঠায়। আমি পরে দেখব বলে রেখে দিই ফোন।

দু'ঘণ্টাও অতিক্রম হল না। রাত দশটা চৌদ্দতে সন্দীপ মেসেজ পাঠালো, ''ব্যস্ত আছ?''

''আমার এক বান্ধবী এসেছিল। এইমাত্র গেল।''

''আমিও আমার বন্ধুর সঙ্গে ছিলাম।''

''উনি কি আজ রাতে থাকবেন?''

''না। আমিই ওর কাছে গিয়েছিলাম। ফিরে এসেছি। ডিনারও সেরে ফেলেছি।''
''এখন ঘুমোবেন বুঝি?''
''না না। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।''
''কথা বলতে চাইছেন?''
''হ্যাঁ। তুমি ফ্রী হলে আমাকে কল করো।''

সোনালি আমার বাড়ি থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে থাকে। তবু আমাদের খুব ঘন ঘন দেখা হয় না। সে তার ছেলেমেয়ে, ভাঙা সংসার নিয়ে ব্যস্ত। হাজব্যান্ড সোনালির চরিত্র নিয়ে সংশয় উঠিয়ে পাঁচ বছর আগে পরিবার ছেড়ে দিয়েছেন। কোথায় আছেন, কিভাবে কার সঙ্গে আছেন কেউ জানে না। ঘরে বিপর্যয়ের মুহূর্তে অমনোযোগী ছেলে মাঝখানে লেখাপড়ায় ইতি টেনে মোটামুটি একটা চাকরিতে জয়েন করেছে। ডিউটির বাইরে নিজেকে নিয়ে, নিজের বন্ধুবান্ধব নিয়ে ব্যস্ত সে। রাতও কাটায় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে। মা কিছু বলতে গেলে কড়া উত্তর দেয়, ''তুমি চাও ঘরে বসে বসে আমি সেসব কথা মনে করে হতাশায় ডুবে যাই?'' মেয়ে স্কুলে ক্লাস টেনে পড়ে। ঘরে পড়ে না। মানে পড়াশোনা করে না। রেজাল্ট ধীরে ধীরে খারাপই হচ্ছে। পরীক্ষায় কোন না কোন বিষয়ে ফেল করছে সে। ক্লাস টেনের বোর্ডের পরীক্ষায় পাশ হবে কিনা সে নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তবু তার কোন বিকার নেই। ব্যাংক লোনে নেওয়া ফ্ল্যাটটির 'ই এম আই'ও ভরছেন না হাজব্যান্ড। সোনালির দৈনন্দিন খরচার বোঝা বহন করছেন সোনালির আশি বছরের অবসরপ্রাপ্ত বাবা। বোঝা বহন তো ওনাকে করতেই হবে। কেননা উনি মেয়েকে শুধুমাত্র পাসে বি এ পাশ করিয়ে বিয়ে দিয়েছেন। বিয়ের পরে প্রেগন্যান্সি, ছেলে-মেয়ের জন্ম দেওয়া, তাদের বড় করা ইত্যাদি পাকে পড়ে গেছে সোনালি।

পুনেতে সোনালির মাধ্যমে তাপসদার সঙ্গে আমার নতুন করে ভাব হয়েছে। আমার আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড 'বাস্তবের আড়ালে' প্রকাশের পর থেকেই সোনালি ফোনে বলেছিল তাপসদা আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলছেন, ''আমি আগে থেকেই জানতাম মেয়েটার মধ্যে অনেক গুণ আছে। কিছু তো একটা হটকে (অসাধারণ) করবে সে।'' তাপসদা হলেন আমাদের প্রবাসী 'বাঙালি সমাজ'এর অর্থাৎ পুনের বিশ্রান্তওয়ারি এলাকার বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। তার আগে উনি সাধারণ সদস্য ছিলেন—আমাদের মতো। গতবছর শুনেছিলাম অ্যাসোসিয়েশনে কোন প্রেসিডেন্ট ছিল না। দুর্গাপুজো হবে কি হবে না ভাবতে ভাবতে শেষপর্যন্ত অ্যাডহক কমিটি তৈরি করে করা হয়েছে পুজো। সোনালি আমায় বলেছে, আমার সঙ্গে আগে ভালো সম্পর্ক ছিল কিন্তু এখন আর নেই বলে আফসোস করছেন তাপসদা। বলেছেন, ''কি করে যে সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে গেল!'' উনি নাকি এটাও বলেছেন রাজা আমার যোগ্য স্বামী নয়। কলকাতায় ভাড়া বাড়িতে বসেই আমি

তাপসদাকে নিয়ে আরও খবর পেয়েছি। উনি 'বাঙালি সমাজ'এর সব সদস্যকে মেল-এ আমার বইয়ের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। কেউ পড়তে আগ্রহী হলে কোথায় পাওয়া যাবে বই তার খবরও রয়েছে তাতে। আমাকে নিয়ে উৎসাহের এত বাড়াবাড়িতে তাপসদার প্রতি আমার মনে কৃতজ্ঞতাবোধের জন্ম হয়। আমি সোনালিকে ওর বাড়িতে তাপসদাকে নিয়ে একটা ডিনার পার্টির আয়োজন করতে বলি। পার্টিতে আমাদের পুনরায় আলাপ হয়। বলা বাহুল্য, সোনালি তাপসদার স্ত্রী নয়। সে অন্য কারও স্ত্রী এবং তাপসদা অন্য কারও স্বামী। সোনালি কয়েক বছর ধরে এক অসম্ভব প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে। প্রায় থেমে থেমে। টাকাপয়সার ভীষণ টানাটানি। মেয়েকে বড় করতে নাজেহাল অবস্থা। এমতবস্থায় আমরা ঘনিষ্ঠ কয়েকজন ওকে যেভাবে পারছি সাহায্য করছি।

বিজয়া সোনালির বান্ধবী। সে বিধবা, সন্তানহীনা এবং তার বাল্যপ্রেমিক মানবের প্রতি এখনও দুর্বল। বছর খানেক হল ওদের বন্ধুত্ব হয়েছে। বিজয়া প্রথম দিনই আমার ঘরে এসে বলে, ''তুমি তো খুব সুন্দর গো!'' অথচ দেখো একজন তোমাকে নিয়ে কত বাজে বাজে কথা বলল।''

''অনেকেই অনেককে নিয়ে বলে। অভিনব কিছু তো নয়!''

''তা ঠিক। তবু তোমাকে নিয়ে মুনাই-এর এসব কথা বলার কোন মানে হয় না। সে নিজেই তো কেলেঙ্কারি করে বসে আছে।''

এখানে নিয়মিত না থাকার কারণে এবং লোকজন নিয়ে কৌতূহল না রাখার কারণে মুনাই-এর খবরটা আমার কাছে একটু দেরিতেই পৌঁছেছিল। তবু না জানার ভান করে জিজ্ঞেস করি, ''কি কেলেঙ্কারি করেছে?''

''ওমা জানো না? দু'বছর হয়ে গেল। হাজব্যান্ড মস্কটে। আর সে এখানে রাজীব চ্যাটার্জির সঙ্গে...সাড়ে চার মাসের বাচ্চা অ্যাবর্ট করেছে।''

সোনালি আমাকে বলে, ''রাজীব চ্যাটার্জি তো তোর পেছনেও খুব পড়েছিল?''

''হ্যাঁ, পড়েছিল। তোমার বাড়ি আসব, চলো সপ্তাহের ছুটির দিনে কোথাও থেকে ঘুরে আসি, একসঙ্গে ড্রিঙ্ক করি—রাজীবের ইত্যাদি ইত্যাদি রকমারি প্রস্তাবে আমি অতিষ্ট হয়ে উঠেছিলাম। তারপর একদিন কড়া কথা বলে থামিয়ে দিয়েছি। কিছুদিন আগেও সে আমার ফেসবুকের টাইমলাইনে এসে মন্তব্য করেছে।''

''কি মন্তব্য করেছে?'' জানতে চায় সোনালি।

''মন্তব্যটা ভালো হতে হতে খারাপ হয়ে গিয়েছে। বানান ভুলের জন্য।''

''কি বানান ভুল করল আবার?''

''উই হ্যাব'ন্ট মেট সিন্স আ লং টাইম—মেট-এর বানানটা এম ই টি (Met) না লিখে এম এ টি ই (Mate) লিখেছে। Mate-এর মানে হয় সঙ্গম। যদিও বা meet-এর পাস্ট টেন্স met এবং mate-এর পাস্ট টেন্স mated, তবু। টেন্স-এর কথা মাথায় না এলে লোকজন কি ভাববে বলো তো?''

''দেখেছ কাণ্ড! এদিকে সে এখন ইংল্যান্ড-এ আছে। এই ইংরেজি নিয়ে এত ভালো চাকরি কি করে পেল কে জানে!''

আমি বিজয়াকে জিজ্ঞেস করি, ''মুনাই আমাকে নিয়ে আবার কি বলেছে?''

''ওর বাড়িতে একদম যাবে না। ওর ঘরে অনেক ছেলের যাতায়াত।''

''আমার ঘরে অনেক ছেলের যাতায়াত থাকলেও মেয়েদের জন্যও দরজা খোলা আছে। অনেক বড় সোফা খালি পড়ে আছে। সুতরাং চিন্তার কিছু নেই, সে বসার জায়গা পাবে।''

ঠিকই বলেছে মুনাই—আমার ঘরে অনেক ছেলের যাতায়াত। ফ্ল্যাটে জিপসামের নকশা করিয়েছি। তখন বুড়ো কাকা থেকে শুরু করে কুড়ি বছরের কর্মী পর্যন্ত অন্ততপক্ষে পাঁচজন লোক দু'মাস আমার ঘরে এসেছে, সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাজ করে গেছে। তারপর ঘর রঙ করিয়েছি। তার জন্য পনেরোদিন ধরে চারজন লোকের আসা-যাওয়া হয়েছিল। এছাড়াও ওয়াটার প্রুফিং-এর কাজ, প্লাম্বিং-এর কাজ, ইলেক্ট্রিসিটির কাজ সবকিছুতেই যখন-তখন লোকের দরকার পড়ে এবং তিন চারদিন না গেলে এক একটা কাজ শেষ হয় না। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষরাই এসব কাজ আগে থেকে করে এসেছে এবং এখনও করছে। এমনকি পেস্ট কন্ট্রোলের অফিসে ঘরে ওষুধ নিয়ে কাউকে পাঠাতে বললে তারা পুরুষদেরকেই পাঠায়। আজকাল কিছু মহিলা ফ্ল্যাট কেনাবেচা এবং ভাড়া দেওয়া-নেওয়ায় কমিশন নিয়ে সাহায্য করে, মানে রিয়াল এস্টেট এজেন্টের কাজ করে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি তাদের পাইনি। আমার এজেন্টের নাম প্রবীর সিনহা। সে একজন পুরুষ। মুনাই-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ এই সত্যি খবরটা লোকের কানে কানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

পেন্টার, প্লাম্বার, ইলেক্ট্রিসিয়ানের সঙ্গে আমি যত ভালো করেই কথা বলি না কেন এরা কেউ আমার বিছানায় আসতে পারে না। তাতেই মুনাইয়ের এত হিংসে হল! ভাবি কথা তুলে কথার পরিপ্রেক্ষিতে ওকে আমার ঘরে এসে এসব কাজ করার প্রস্তাব দিলে কেমন হয়? আমি কল্পনায় দেখি মুনাই আমার বাড়ি এসে ঘোড়ার উপর চড়েছে, এশিয়ান পেন্টের ডিব্বা আর ব্রাশ নিয়ে রয়্যাল পেন্ট চড়াচ্ছে ঘরের দেওয়ালে। দেখি মুনাই ডক্টর ফিক্সিট এবং হোয়াইট সিমেন্ট নিয়ে বাথরুমে ঢুকেছে বাথরুমের টালির মাঝখানের ফাঁকা জায়গাগুলোকে ভরবে বলে। দেখি মুনাই আমার ওয়েস্টার্ন টইলটে ইয়স স্প্রে লগিয়ে দিচ্ছে।

আমার এই দশ বারো বছরের পুনের একার জীবনে এখানকার একটাও পুরুষ বন্ধু আমার ঘরে ঢোকেনি। দু'জন এসেছিল অন্য শহর থেকে। তারা দু'চারদিন থেকে গেছে। অনেক আদরযত্ন নিয়ে গেছে। মুনাই-এর কাছে আমি আরও কৃতজ্ঞ থাকতাম যদি সে তাদের কথা তার বার্তায় বিশেষভাবে উল্লেখ করত।

বিজয়াকে বলি, ''বন্ধুর কোন সখ নেই আমার। একটা বান্ধবী হলেই চলবে। বান্ধবীরও দরকার নেই। একজন সক্ষম মহিলা হলেই চলবে। মুনাই আমার ঘরে মাঝে মাঝে এসে দু'চারদিন থেকে যাক। তার জন্য সে পারিশ্রমিক পাবে। যদি এখনই কোন দুর্ঘটনায় অক্ষম হই, অথবা আর কয়েকবছর বাদে বয়সোচিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ি তাহলে আমার দেখাশোনার ভার মুনাই নেবে এমন প্রতিশ্রুতি পেলে আমি আর কোনদিন কোনও পুরুষের সঙ্গে কথা বলব না।''

আমি ফোনেও সোনালির মুখে পুনের বাঙালিদের আমাকে নিয়ে অনেক চর্চার

কথা শুনেছি। কয়েকমাস আগে সোনালি বলেছিল সুমিতা নামে এক মহিলা তাকে বলেছে, ''কি গো কতকিছুই তো শুনছি।''

সোনালি জিজ্ঞেস করেছে, ''কি শুনছ?''

ফিসফিসানি হাসি হেসে মহিলা বলেছে, ''রূপা নাকি দ্বিতীয় বিয়ে করেছে!''

''আমার কাছে তো এমন কোন খবর নেই।''

আমি সোনালিকে বলেছিলাম ওদের এতো ব্যস্ত হতে না করো। আমাকে নিয়ে মুখরোচক গল্প বানানোর বা জোগাড় করার জন্য এতো কষ্ট করতে না করো। মুখরোচক গল্প শুনে তার সত্যতা যাচাই করতে বা প্রচার করতে ধেয়ে তোমার কাছে আসতে মানা করো। শুধু একটু অপেক্ষা করলেই ঘরে বসেই পেয়ে যাবে খবর। সেইসব খরবও হবে একবারে খাঁটি। আমি লিখব, আমিই প্রচার করব। সেসব খবর আরও আনন্দদায়ক হবে, কেননা সেগুলো মনের তৃষ্ণা মেটাবে আরও বেশি।

চর্চা এখানে শুধু আমাকেই নিয়ে হয় না। চর্চা সবাইকেই নিয়ে হয়। একা বাঁচলেও হয়, লোকজনকে নিয়ে বাঁচলেও হয়। ঘরে মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ি থাকলেও হয়, না থাকলেও হয়। মা-বাবা-শ্বশুর-শাশুড়ি থাকলে তাঁরাও চর্চার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে হাসিখুশিতে দিন পার করেন, পুজোপ্যান্ডেলে যান, পিকনিকে যান, প্রীতিসম্মেলনে সেজেগুজে গিয়ে আনন্দ করে আসেন। কারও ব্যক্তিগত শান্তি একদমই বিনষ্ট হয় না, বন্ধু-বান্ধবের একদমই অভাব হয় না। চর্চাকে সঙ্গে নিয়েই আমরা আমাদের স্বাধীনতা নির্ঝঞ্ঝাটে চর্চা করে চলি। এটা যেন আমাদের এক বিলাসিতা। এটা না হলেই বরং চলে না। চর্চা বোধ হয় কারোরই মন্দ লাগে না। আমার তো একদমই লাগে না।

সোনালির ঘরে ডিনার পার্টিতে আমার সঙ্গে রাজাও উপস্থিত ছিল। আমিও এক রাতে আমার বাড়িতে সোনালি এবং তাপসদাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। অনেক হাল্কা মেজাজে কেটে গিয়েছিল বেশ কিছুটা সময়। হাসাহাসি, নাচানাচি হয়েছিল রাত দুটো পর্যন্ত। তার কয়েকদিন পর আমি কলকাতায় চলে গিয়েছিলাম। রাজাও চলে গিয়েছিল ইন্ডিয়ার বাইরে। তাপসদার সঙ্গে ভীষণ কম হলেও ফোনে আমার কথাবার্তা জারি ছিল। আমি ওঁকে 'পিপাসা যখন'এর কভার পেজ পাঠিয়েছিলাম। উনি বলেছিলেন, ''অবশ্যই পড়ব। আমার বিশ্বাস যে এটি একটি অসাধারণ রোমান্টিক উপন্যাস।'' মনে হওয়ার কারণ জানতে চাইলে বলেছিলেন, ''লেখিকা নিজেই যে অসম্ভব রোমান্টিক।''

তাপসদা একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। পেশায় ব্যবসায়ী। নিজের কম্পানি আছে। প্রচুর উপার্জন। কয়েকমাস হল উনি একটা হোটেলও খুলেছেন। হিমসিম খাচ্ছেন দুটো সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ব্যবসা চালাতে গিয়ে। আমি যদি ওঁকে বলি, পুনেতে থাকলে আমি আপনার হোটেলের বিজনেসটা পার্টনারশিপে নিয়ে নিতাম উনি হাসেন, ''তাহলে দু'দিনেই ব্যবসা উঠে যাবে।''

যদি জিজ্ঞেস করি, কেন? উনি বলেন, ''জানো না? তোমার যা রাগ! কাস্টমার ভয়েই আমার হোটেলের ত্রিসীমানায় পা রাখবে না।''

তাপসদার মাঝে মাঝে আমাকে একদমই রোমান্টিক মনে হয় না। তবু উনি আমার সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ রাখেন। আমি আবার পুনেতে এলে আবার সোনালির বাড়িতে পার্টি রাখেন, আবার আমার ঘরে নিমন্ত্রণ নেন। কখনও সোনালির সঙ্গে, কখনও একা। এভাবেই আমার এখানকার জীবনে প্রথমবার এখানকারই বন্ধুস্থানীয় কারও প্রবেশ ঘটে।

কয়েকদিন ফোন না পেলে তাপসদা জিজ্ঞেস করেন, ''ফোন কেন করছ না?''

বলি, ''দ্বিধা। মনে হয় আপনি খুব ব্যস্ত আছেন।''

''থাপ্পড় খাবে। তুমি কি অ্যাস্ট্রলজার? দেখতে পাও বুঝি আমার ব্যস্ততা?''

''থাপ্পড়?''

''ইয়েস, আই মিন ইট।'' উনি লেখেন, ''শুধু সন্ধেবেলায় একটু বিজি থাকি।''

''তার মানে আমি একেবারে ভুল নই। তাহলে থাপ্পড়টা একটু হাল্কা হওয়া উচিত বলুন?''

''ঠিক আছে।''

কখনও যদি লিখি, ''কি করছেন?'' সময় সন্ধে হলে বলেন, ''হোটেলের পরিবেশে,'' এবং দিন হলে বলেন, ''ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পরিবেশে।'' বলেন, ''তোমাকে মিস করছি।'' বলেন, ''মজা করছিলাম।'' তারপর শুধু জিজ্ঞেস করার জন্যই জিজ্ঞেস করেন, ''তুমি আমার কে যে তোমাকে মিস করব?''

কখনও মেসেজ করেন, ''কি করছ?''

''লেখার মাঝখানে আটকে আছি।''

''আমি আসব কি তোমাকে সঙ্গ দিতে?''

''আপনার স্ত্রীর সহমত নিয়ে আসা দরকার?''

উনি লেখেন, ''আমি জানি তুমি কি চাইছ। আর কোন বাহানা চলবে না। আসছি। আমি তোমাকে নিশ্চিত করছি যে আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে মোটেও উদ্‌বিগ্ন নই।''

''ওহ্! আপনি জানেন আমি কি চাইছি?''

''অফ কোর্স। বলার আর কোন প্রয়োজন নেই। তোমার মুখেই সব ধরা পড়েছে।''

একদিন উনি আমার বাড়ি এসে বললেন, ''তোমার জন্য একটা সুখবর আছে। আমি আমার স্ত্রীকে জানিয়ে দিয়েছি যে আমি তোমার কাছে আসছি। উনি কোন আপত্তি করেননি।''

তাপসদার সঙ্গে আমার যে খুনসুটি হয় না তা নয়। একদিন আমি ওঁকে বলি, ''কালকে একটু বেরবো।''

''তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?''

''তার সঙ্গে।''

''কার সঙ্গে?''

''আমার এক বন্ধুর সঙ্গে।'' ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর আমার বন্ধু তা ওঁর জানা ছিল না। জেনে যেন একটু শান্তি পেলেন, আবার পেলেনও না। বললেন, ''এই, তুমি যখন বাংলাদেশে একুশে বইমেলাতে যাবে, আমি সঙ্গে যাব।''

''আমার সঙ্গে ঘোরার এতই যদি ইচ্ছে। চলুন অ্যানগ্রিয়াতে সফর করে আসি।'' অ্যানগ্রিয়া হল ভারতের প্রথম ক্রুজ যা মুম্বাই এবং গোয়ার মধ্যে চলাচল করে। সতেরো ঘণ্টায় সফর।

তাপসদা বলেন, ''বেশ। তুমি আজ দারুণ মুডে আছ মনে হচ্ছে।''

''তা আছি।''

''কারণ? রঙ লেগেছে মনে?''

''হয়ত।''

''ভাগ্যবানটি কে জানতে পারি কি?''

''পরে বলব।''

তখনও সত্যজিৎ রায়ের সুপুত্র সন্দীপ রায় ছাড়া আরেকজন সন্দীপ রায়-এর আজ থেকে চুয়ান্ন বছর আগে জন্ম হয়েছে বলে আমার জানা ছিল না। সেই অন্য সন্দীপ রায়টি আমার জীবনে এল কয়েকদিন পরে, মৌসুমি বায়ুর মতো, আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি করা ছকে বসে।

সেই রাতে সন্দীপের কথামত ওকে ফোন করলে সন্দীপ একটা বায়না করে বসে। সে আমাকে হোয়াটসআপে দেখতে চায়। অচল ফটোতে নয়। সচল ভিডিওতে—জীবন্ত। নাইট গাউন পরে আছি। অস্বস্তি হচ্ছে কিন্তু সন্দীপ তা মানতে চাইছে না। পোশাক পরিবর্তন করতে চাইলে তাতেও সে রাজি নয়। যেমনভাবে আছি তেমনভাবেই, সেভাবে আছি সেভাবেই। আমার দ্বিধা আমার আপত্তি যত বাড়ে সন্দীপের জেদও ততই বেড়ে যায়। সে আমাকে ভিডিও কল করে বসে। আমি কেটে দিই। সে আবার কল করে, আমি আবার কাটি। কল করা এবং কাটার মাঝখানে পোশাক পরিবর্তন করে শেষপর্যন্ত ওর কল রিসিভ করি।

''খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে দেখতে।''

''আমি তো আপনাকে বলেইছি দেখা নিয়ে কোন মন্তব্য শুনতে আমি পছন্দ করি না। আর ভিডিও কল করতে বলবেন না প্লীজ।''

''তুমিও তো আমায় বলেছিলে।''

''হ্যাঁ, অনিন্দিতার পাল্লায় পড়ে বলেছিলাম। দেখতে চেয়েছিলাম আপনি, একজন ফোর্সড ব্যচেলর কিভাবে থাকেন। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল আপনিও সেদিন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।''

''ঠিক ধরেছ। দু'দিনের আলাপে তোমার কাছে সহজ হতে পারছিলাম না।''

''এবার কেটে দিই লাইন? ভয়েস কল করি?''

''ঠিক আছে।''

রাত বারোটা উনচল্লিশে আমি ওকে গুড নাইট করি। সে আমাকে গুড মর্নিং করে পাঁচটা একচল্লিশে। মাত্র পাঁচ ঘণ্টা পর। ছ'টা তেত্রিশে সে মেসেজ করে, ''চলো আমরা আমাদের পুরনো দিনগুলো ভুলে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করি। কিন্তু সবথেকে বড় সমস্যাটা হল পুরনো খারাপ অভিজ্ঞতা যেগুলো আমাদের মনের মধ্যে গভীরভাবে গেঁথে আছে সেগুলোকে ভোলা খুব কঠিন। অতীতকে ভুলতে

হলে শাশ্বত ভালবাসার গভীরতর স্বাদ আমাদের পেতে হবে।"

"কিন্তু আপনি যে এখনও পর্যন্ত কারও হাজব্যান্ড সন্দীপ!"

"শুধুমাত্র কাগজে।"

"আমি তো সেটাই বলতে চাইছি। কাগজে বলেই তো তা অস্বীকার করা যাচ্ছে না।"

"আমাদের মধ্যে কোন আবেগ বেঁচে নেই। আমি সামনে চলার সিদ্ধান্ত একবার নিয়ে ফেললে আর পেছন ফিরে দেখি না। তোমার মেয়ে তোমাকে ঠিকই বলেছে ছেড়ে আসা দিনগুলোতে যেখানে আমরা দুঃখ পেয়েছি সুখের সন্ধান না করাই উচিত।"

হ্যাঁ, আমার মেয়ে আমাকে এমন কথা বলেছিল বৈকি। রিলির কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার অনেকটাই পরিণত আবার একইসঙ্গে অনেকটা অপরিণত। সে নিশ্চয় তার ফিলাডেলফিয়ার সন্দীপ প্রসঙ্গে এমন ভাবনা ভেবে থাকবে। ছেলেটিকে সে অনেকই ভালবেসেছিল। এতটাই যে তাকে প্রতারণা করার কথা সে কখনও ভাবতেই পারেনি। পুনেতেও রিলির কয়েকজন বন্ধু আছে। কেউ তার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্লাসমেট, কেউ ফটোগ্রাফার। একটি ছেলে আছে ব্যাঙ্গালোরের। সে একটি কসপ্লেয়ার। খুব উন্নতমানের কস্টিউম তৈরি করে এবং সেই কস্টিউম পরে চরিত্র অভিনয় করে অনেক টাকার প্রাইজ জেতে। বন্ধুদের সবার সঙ্গেই রিলি হ্যাংগ আউট করে অর্থাৎ বাইরে বেরোয়, লাঞ্চ অথবা ডিনার করে, এমনকি কসপ্লেয়ার ছেলেটির সঙ্গে সে টোকিও থেকে ঘুরে পর্যন্ত আসে, কিন্তু প্রেম বা প্রেম প্রেম ভাব তার এদের কারোর সঙ্গেই ছিল না। এখনও নেই। প্রেমিক তার একজনই ছিল—ফিলাডেলফিয়ার সন্দীপ যাদব। ফিলাডেলফিয়ার সন্দীপের কথা সে সবাইকে জানিয়ে দিয়ে বলেছিল তোমরা আমার বন্ধু—শুধু বন্ধু, সুতরাং শুধু বন্ধুর মতই থাকো। বাড়াবাড়ি করলে বন্ধুত্বই কেটে দেব।

আমি এই কথা ভেবে ভেবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে কোন চুমু ছাড়া, স্পর্শ ছাড়া এমনকি দেখাসাক্ষাৎ ছাড়া তাদের প্রেম ভালবাসা চার বছর টিকল কি করে? আমাদের প্রজন্মের পুরুষ-মহিলারা রক্ষণশীল পরিবেশে জীবনের অনেকটা বছর অতিক্রম করে, বিয়ে করে স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে কয়েক প্রস্থ শারীরিক সম্পর্ক সেরে বাচ্চা বড় করতে করতে ক্রমান্বয়ে রেডিফ বোল, ইয়াহু, ফেসবুক, জিমেল, স্কাইপ, হোয়াটসআপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। এই বয়সে এসে অধিকাংশ মহিলা এবং অল্প সংখ্যক পুরুষ পরপুরুষ এবং পরস্ত্রীর সামনে নিজেকে উলঙ্গ করতে পছন্দ করে না। আমাদের পরের প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা পাঁচ ছয় বছর বয়স থেকেই বড়দের মোবাইল নিয়ে কুটকুট করে, বয়ঃসন্ধির আগেই মা-বাবার কাছ থেকে নিজের জন্য মোবাইল বাগিয়ে নেয়। বাগিয়ে নিতেই বিবিধ ব্যবহার হয় শুরু করে দেয় তার।

মোবাইল আসার শুরু শুরুতে কয়েক বছর ফিচার ফোনে তারা টেক্সট মেসেজিং, এম এম এস, ই মেইল, ইন্টারনেট অ্যাকসেস, ব্লু ট্রুথ, ভিডিও গেমস, ডিজিটাল ফটোগ্রাফি, রিয়ার ফেসিং ক্যামেরার মতো বিশেষত্বগুলো পেয়েছে। ২০০৯তে স্মার্টফোন আসার (ভারতে) পর মোবাইল ব্রাউজার, এমবেডেড মেমরি, বিভিন্ন অ্যাপ ডাউন

লোডিং সিস্টেম, টাচ স্ক্রিন, ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা এবং আরও নানাবিধ সুবিধে নিয়ে আগের তুলনায় অনেক বেশি স্মার্ট হয়ে গিয়েছে।

রিলির প্রেম এতদিন টিকে থাকারও কারণ হল এই স্মার্টফোন। প্রেম কেটে যাওয়ার পরে সে আমাকে বলেছে দূরত্ব মেটানোর রাস্তা ওরা দূরে থেকেই তৈরি করে নিয়েছিল এবং দূরে থেকেই পরস্পরের মধ্যেকার দূরত্ব মিটিয়েও ফেলেছিল। নুড্স (উলঙ্গ ফটো) বিনিময় করে। রিলি বলে সে তার মুখসহ নুড্স পাঠিয়েছে, তাও আবার তার ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বিভিন্ন পোজে। পোজগুলোও সে আমাকে দেখিয়েছে। ''এইভাবে নিয়েছিলাম ফটো, এইভাবে নিয়েছিলাম, সেইভাবে নিয়েছিলাম, একটা বসে, একটা দাঁড়িয়ে, একটা পেছন ফিরে, একটা বাঁ পাটাকে সামনে কোমর পর্যন্ত উঠিয়ে দিয়ে, একটা ক্রস লেগ-এ। একটা ফটো তো খুবই স্টাইলিশ ছিল মাম্মা...বাঁ হাতকে এইভাবে মাথার উপরে রেখে...ওটা আমি যেদিন ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য অফিস থেকে কম্প অফ নিয়েছিলাম সেদিন পাঠিয়েছিলাম...কম্প অফ কি জানো তো? ন্যাশনাল হলিডেতে আমি ওভারটাইম করেছিলাম, তার জন্য লিভ।'' পোজ দেখানোর আর বিরতি নেই। যেন এগজিবিশন শুরু হয়েছে ঘরে। আমি তো হেসেই অস্থির। হাসি শেষে একটু গম্ভীর হয়ে বলি, ''একটা মস্ত বড় ভুল করেছ—মুখের সঙ্গে এমন ফটো পাঠানো উচিত হয়নি। সে তো তোমাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে।'' এসব জায়গাতে রিলিকে আমার অপরিণত মনে হয়।

রিলি বলে, ''ইয়েস। আর না। আই গট ম্যায় লাইফটাইম লেসন।''

যেহেতু ছেলেটি ওর আসল চেহারা গোপন রেখেছিল এবং মাথাকাটা নুড্স পাঠিয়েছিল রিলি এটাও বলে, ''কুত্তা শালা কার ডিক আমাকে দেখিয়েছে কে জানে!''

ফেলে আসা সেই দিনগুলো যেগুলো রিলিকে সুখ দিতে গিয়ে তার ঘুম কেড়ে নিয়েছিল পরে তাকে কষ্টের ঝুড়ি উপহার দিয়েছে। সেসব দিনে সে আর সুখ খোঁজার চেষ্টা করে না। বিনিদ্রায় পদচারণ করে না সেখানে। আজকাল রাত দশটাতে দেখি কোনরকম হতাশা, নিরাশা, উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা ছাড়াই সে ঘুমিয়ে পড়ে। ওঠে সকাল সাতটায়। তাই রিলিকে আমার অনেক পরিণত মনের মনে হয়। কেউ রিলিকে ভালবাসা উপহার দিতে চাইলে সে আর গ্রহণ করে না। আমার ভয় হয় রিলি কি তাহলে সারাজীবন একা একাই কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে? বছরের বেশিরভাগ সময়টাতেই আমি কলকাতায় থাকি। এখানে ওর পাশে আর কেউ আছে জানলে কলকাতার দিনগুলো অনেকটা নিশ্চিন্তে পার করতে পারি।

বিনিদ্রা এখন আমাকে এবং আমার সন্দীপকে পেয়ে বসেছে। আমি সন্দীপকে বলেছি যে আমি সাধারণত খুব কম লোকের সঙ্গেই মেলামেশা করি এবং মেলামেশা করলেও খুব কম কথা বলি। আমি এখন আপনার সঙ্গে অনর্গল কথা বলে চলেছি বলে হয়ত আপনি বুঝতে পারছেন না।

আমি ওর সঙ্গে অনর্গল কথা বলছি কেননা আমি ওকে পছন্দ করতে শুরু করেছি তবু ওকে নিয়ে খুব সিরিয়াস হতে পারছি না এই কারণেই যে এখনও পর্যন্ত

সে তার স্ত্রীর সঙ্গে আইনত বাঁধা।

সে বলেছে আমার খুব অল্প লোকের সঙ্গে কথা বলা এবং খুব কম লোককে পছন্দ করার ব্যাপারটা প্রশংসনীয়। সে বলেছে সেও আমারই মতো।

আমি সন্দীপের সঙ্গে একমত। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর স্বাদ কোন না কোন নতুন উপায়ে পেতে তো হবেই। কিন্তু সেই উপায়টা কি? ভালবাসা? কাকে ভালবেসে পাব সেই স্বাদ? অন্যকে নাকি নিজেকে? অন্যকে ভালবাসলে ভরসা হয় না তার মন ভরিয়ে দিতে পারব বলে, বিশ্বাস হয় না সে আমাকে সেই স্বাদ আজীবন দেওয়ার উৎসাহ রাখবে বলে। অন্যকে ভালবাসার গল্প আমার কাছে তো রূপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। জীবন তো অনেক দেখলাম, ভালো তা অনেককেই বাসলাম কিন্তু সত্যিকারের পাশে আসার মতো পাশে কেউই তো এল না। সন্দীপও তাই মানে। মেনেও জীবনকে আরও উপলব্ধি করার ইচ্ছে সে রাখে। ওকে বলি, ''আমি অশরীরি ভগবান আছেন বলে জানি না। তাই তাঁকে মানি না। আমি মানি 'মানুষই ভগবান মানুষই শয়তান' প্রবাদ। একটা ভালো মানুষকে আমি দেবতা বলে মনে করি এবং খারাপ মানুষকে অসুর।''

''আমিও তাই মনে করি।''

''আমার কাছে যদি এমন মানুষ-ভগবান আসেন তাহলে তাঁকে মাথায় তুলে রাখব এবং সারাজীবন তাঁর অনেক আদরযত্ন করব।''

''এটাই হল শাশ্বত ভালবাসা। একমাত্র এই ভালবাসাই আমাদের অনন্ত সুখ দিতে পারে।''

''আমি অবশ্য শাশ্বত ভালবাসা, অনন্ত সুখ নিয়েও মোটেও ভাবি না। আমি আমার অনুভূতিকে কোনও ছকে ফেলে কোনকিছু লাভ করতে চাই না। আমার অনুভূতি হল আমার অনুভূতি—আমার কাছে এক চরম সত্য। ব্যস এটাই।''

''এগ্রীড। আমি যা বলতে চেয়েছি তা হয়ত তোমার বিশ্বাস থেকে আলাদা নয়। এর সঠিক ব্যাখ্যা মুখে বলে বা লিখে দেওয়া যাবে না, এটাকে একমাত্র উপলব্ধি করা সম্ভব।''

''জানি না।''

সন্দীপ বলল, ''তুমি নির্দিষ্ট চাহিদা নিয়ে চললে মানুষ ভগবানের দেখা পেতে পারবে না।'' হয়ত তার কারণ এটাই যে কোন চাহিদা পূরণ না হলে সেই ভগবান মনে হতে থাকা মানুষটির প্রতি আমার শ্রদ্ধা উড়ে যাবে। বলল, ''তোমাকে মানুষকে বুঝতে হবে।''

''আমি অন্যের ভালবাসা পাওয়ার অভিযানে নেমে পড়িনি। কিন্তু দিনরাত লোকজন তাদের ভালবাসার উপহার নিয়ে আমার সামনে হাজির হচ্ছে। তাদের জানা দরকার আমি আমার চাওয়া থেকে সরে যেতে পারি না, পছন্দ-অপছন্দ থেকে সরে যেতে পারি না। কেউ আমার কাছে আসতে চাইলে তাকে আমায় আমার মতো করে ভালবাসতে হবে। যদি তা না পারে তাহলে বলব আমি একাই বরং সুখে আছি। এটা আমার কাছে একটা সুখেরই অভিজ্ঞতা হবে যদি আমি একা মরার সুযোগ পাই। আগে এসব কথা এত গভীরভাবে ভাবিনি। ভাবনাটা এখন প্রাসঙ্গিকভাবে

মনে এসেছে। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম কেননা আমি জেনেছিলাম আপনি 'আই আই টি'র স্নাতক। আমি আপনাকে এটাও জিজ্ঞেস করিনি যে আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েশন করেছেন কিনা। আমার তা জানার প্রয়োজনও নেই। অর্থনৈতিকভাবে আপনি আমার চেয়ে বেশি না কম সমৃদ্ধ সেটাও আমার বিবেচ্য বিষয় নয়। আমার দুর্বলতা হল একজন শিক্ষিত, সৎ এবং বিশ্বস্ত পুরুষ।"

সন্দীপ লিখল, ''আই অ্যাম এ ফাইভ পয়েন্ট সামওয়ান।"

পড়ে খুব ব্যথা পেলাম। আমি ওকে কখনই এত দুঃখী দেখতে চাই না। ফাইভ পয়েন্ট সামওয়ান হল চেতন ভগতের লেখা 'আই আই টি'র ক্লাসে পিছিয়ে পড়া তিন বন্ধুর একটি গ্রুপ। গ্রেড পয়েন্ট অ্যাভারেজ দশের মধ্যে পাঁচ দশমিক কিছু থাকায় তাদের র‍্যাঙ্ক হয় ক্লাসের শেষের দিকে।

''কেন এমন বলছেন?"

''আমাদের ক্লাসের চল্লিশ জনের মধ্যে মাত্র তিনজন চারজন আমার মতো চাকরি করছে। হতেই পারে যে আর পাঁচজনের অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ। বাকিদের বেশিরভাগই অনেক ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত। হয় তারা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টে চাকরি করছে না হলে বিদেশে গেছে।"

সন্দীপের এই বিষয়টা নিয়ে আমি আগেই রিলির সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। লিখি, ''আপনি বেসরকারি চাকরি করলে উন্নতির অনেক বেশি সুযোগ পেতেন। মাইনে অনেক বেশি হত। হতেই পারত প্রয়োজনের তাগিদে কোয়ালিফিকেশনও বাড়িয়ে ফেলেছেন। তবু বলব আপনার এখনকার অবস্থাও মোটেও খরাপ নয়। খুশি থাকুন। আপনি হলেন নম্বর ওয়ান।"

সে থাম্বস আপ পাঠায়।

''দ্যাট্স লাইক আ গুড বয়!"

সকালে শৈবাল ঘোড়াই ফোন করে আমার মাথা ঝালাপালা করে দিয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ''আপনার বোনদের কি বিয়ে হয়ে গেছে?" শৈবাল ঘোড়াই বলেছে, ''হ্যাঁ, কিন্তু আমার সঙ্গে ওদের ভালো সম্পর্ক নেই।"

''কেন?"

''ওদের মা-বাবার সম্পত্তির ওপর খুব লোভ।"

''এভাবে বলতে নেই। মা-বাবার সম্পত্তিতে আপনার মতো ওদেরও তো সমান অধিকার আছে তাই না?"

''দেখুন ওদের সবার অবস্থাপন্ন ঘরে বিয়ে হয়েছে। টাকাপয়সার কোন অভাব নেই...," লোকটির বক্তৃতা চালু থাকে—বড় বোনের এই আছে সেই আছে, মেজো বোনের এই আছে সেই আছে, ছোট বোনের এই আছে সেই আছে..."

''বাইরে থেকে দেখে আপনার তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু ভেতরের অবস্থা অন্যরকমও

তো হতে পারে...”

‘‘না, আমি জানি ওদের আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট ভালো।”

‘‘আপনিও তো বলছেন আপনি সত্তর হাজার টাকা মাইনে পান। তাছাড়া আপনার ব্যবসা থেকে বিশাল উপার্জনের সম্ভাবনা আছে...”

‘‘সেটা ভবিষ্যতের কথা। এখন তো নেই। এখন শুধু মাইনেটাই সম্বল। কামাল হোসেনের ফ্র্যানচাইজি নিয়ে আমি কয়েকটা জায়গাতে ছাত্রছাত্রী পড়ানোর জন্য স্কুলের ক্লাসরুম পেয়েছি। ভাবছি যদি বিয়ে করে আপনার নামে ডব্লু বি শি এস (ডব্লু বি সি এস), আই এ এশ (আই এ এস), রেল, পি এশ শি (পি এস সি), এশ এশ শি (এস এস সি), নেট-শেট (সেট)-টেট-ক্লাট, পলিটেকনিক, এন ই ই টি, জে ই ই, পাইলট ইত্যাদির কয়েকটা কোচিং শেন্টার (সেন্টার) খুলে তার ক্লাশগুলো (ক্লাসগুলো) সেইসব ক্লাশরুমে (ক্লাসরুমে) নিতে পারি তাহলে আমাকে আলাদা করে ঘরের ভাড়া বইতে হবে না। তবু আমার টাকার দরকার। কেননা...”

‘‘যদি মনে করছেন এখন আপনার উপার্জন কম তাহলে কোন মানসিক জোরে বিয়ে করতে চাইছেন? উনি কি আপনার এই স্বল্প উপার্জনে খুশিতে থাকতে পারবেন?”

লোাকটি আমাকে বোঝানোর জন্য উঠেপড়ে লাগে, ‘‘বিয়ের পরে উপার্জন বাড়বে তো! আপনি আমার প্লানটাই আসলে বুঝতে পারেননি। শুনুন মন দিয়ে। কোচিং-এর জন্য এক একটা ইশটুডেন্ট (স্টুডেন্ট)-এর কাছ থেকে গড়ে কম করেও বছরে আটচল্লিশ হাজার টাকা ফী নেব। তার মানে তার মাসিক ফী হল চার হাজার টাকা। এক একটা শেন্টারে যদি চারজন স্পেশালাইজড (স্পেশালাইজড) টিশার (টিচার) থাকে, একজন সপ্তাহে তিনটে করে ক্লাশ নেয় আর আমি যদি তাকে একটা ক্লাশের জন্য দু’শো করে টাকা দিই তাহলে চারটে টিশারকে দিতে হবে ওই মোটামুটি ধরে নিন আড়াই হাজার টাকা। অর্থাৎ মাসে একটা ইশটুডেন্ট থেকে দেড় হাজার টাকা আমার প্রফিট। এখন...” লোকটি ছাত্র পড়ানোর মতো স্বরে ঢেউ খেলিয়ে কথা বলে।

‘‘এত বিশ্বাস!”

‘‘তা নয় তো কি? আমি এখন করতে পারছি না কারণ আমি চাকরি নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকি...আমাকে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়...”

‘‘যদি এতই বিশ্বাস তাহলে বোনদের পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ দিতে আপত্তি কেন?”

‘‘ভাগ দিতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি শুধু বলেছিলাম যে ওদের সম্পত্তির ওপর খুব লোভ...দেখুন, ওরা তো মেয়ে। ওদের স্বামীরা...”

‘‘তারা সম্পত্তির ভাগ আশা করে, যেমন আপনি করেন। এটাতো কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় যে ওইভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং তার জন্য তাদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করতে হবে।”

‘‘আমি বলতে চাইছি ওদের টাকার অভাব নেই তবু সম্পত্তির পেছনে পড়ে আছে। টাকা তো এখন আমার দরকার। আমি মা-বাবার ব্যারাকপুরের বাড়িতে বি এড, এম এড এবং ল কলেজ খুলব। আমি সরকারি চাকরি করি তো, তাই বিয়ে করে বউয়ের নামে ব্যবসা শুরু করতে হবে। একবার যদি...”

‘‘আপনার মা-বাবা কি বাড়িটা আপনাকে দিয়ে দেবেন বলেছেন?”

''না, তা বলেননি। কিন্তু বাবার বাড়ি মানেই তো আমার বাড়ি। মা-বাবা এখনও বেঁচে আছেন। সম্পত্তির ভাগাভাগি হয়নি। ভাবছি ওখানে একবার কলেজটা চালু করে দিতে পারলে...''

''না, বাবার বাড়ি মানেই আপনার বাড়ি নয়।'' লোকটি আমাকে আসল কথা বলার সুযোগই দিতে চাইছে না। তার বকবকানির মাঝখানে কোনওরকমে বিরক্তি দেখিয়ে আমি তাড়াতাড়ি আমার মতামত ছুঁড়ে দিচ্ছি—উচ্চস্বরে, যাতে করে সে শুনতে পায়। মনে হয় আমি ওকে বলি, দেখুন মেয়েরা মা-বাবাকে আবেদনপত্র দ্বারা তাদের পৃথিবীতে আসার ইচ্ছে ব্যক্ত করে না। তারা বাবাকে এটাও বলে না যে ব্যাব্যা, তুমি চেয়েই হোক আর শারীরিক সুখ পেতে গিয়েই হোক মার শরীরে যখন মালমশলাগুলো ঢেলে দেবে তখন তার সঙ্গে আমার জন্য এক্স ক্রোমোজোমটা ছেড়ো কিন্তু। মনে হয় বলি, আমার এই কথাগুলো সুপ্রিম কোর্ট নিজে থেকেই মেনেছে এবং ২০০৫-এ এবং ২০১৮-তে ১৯৫৬ সালের হিন্দু সাক্সেশন অ্যাক্টের সংশোধন করেছে। জিজ্ঞেস করি, ''পৈতৃক ভিটেতে বি এড, এম এড এবং ল কলেজ খুলে সেখান থেকে উপার্জন শুরু হলে যদি বোনেরা সেই ভিটের অংশ দাবি করে?''

''করতে পারবে না। আমি তো তখন কলেজ খুলেই ফেলেছি।''

''তা হয় না। আপনাকে আগে মা-বাবার সম্পত্তির অংশ হিসেবে বাড়িটা নিজের নামে লিখিয়ে নিতে হবে। না হলে পরে আপনার পুরো কলেজ আইনের ফাঁদে পড়ে যেতেই পারে।''

সন্দীপ বলেছে, ''সবাইকে সুখী করা শুধু মুশকিলই নয়, প্রায় অসম্ভব। কিন্তু আমি যদি আমার জীবিতকালে অন্তত পক্ষে একজনকেও সুখী করতে সক্ষম না হই তাহলে পুরো জীবনটাই একেবারে অর্থহীন বলে মনে হবে।''

''গুড! থট ফর দ্য ডে।''

সওয়া ঘণ্টা সন্দীপ আর কোন মেসেজ করে না। কেন করে না তা আমি বুঝলাম সেই সওয়া ঘণ্টা পর। সে আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে পুরনো ফটোগুলো ডাউনলোড করতে ব্যস্ত ছিল। দুপুর তিনটে ছেচল্লিশে সেইসব ফটো থেকে একটি বেছে সে আমাকে পাঠায়। জিজ্ঞেস করে, ''এটা কত বছর আগেকার?''

পিংক রঙের হাই-নেক সোয়েটার পরা ছবিতে আমি আমার বর্তমান ফ্ল্যাটের কিচেনের শোকেসের সামনে হাসি হাসি মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। মনে পড়ে দীর্ঘদিন বাদে এখানে আমাকে দেখে রাজার এক বন্ধু আমার ইনবক্সে এসে লিখেছিল, ''বুঝতে পারছি, বয়স তোমাকে এখনও ছুঁতে পারেনি।'' মনে পড়ায় আফসোস হয়, রাগ হয় তার পরের কয়েকটি বছরের ওপর। হিসেব করি সংখ্যা। লিখি সন্দীপকে, ''দশ বছর।'' লজ্জা করে। লজ্জার প্রকাশ হয় আমার পরের মেসেজে, ''কি পাগলামো করছেন! কোথায় কোথায় থেকে ছবিগুলো বের করে...''

''এটা আমাদের মতো একটা অতি সাধারণ লোকের ফটো। আশা করি তোমার মানসিকতা এখনও একইরকম আছে।'' মানসিকতাকে সে ব্র্যাকেটে লিখেছে। সে

জানে বিগত দশ বছর আমার চেহারাতে বয়সের রঙ না ঢেলে কিছুতেই বিদায় নিয়ে থাকতে পারে না।

''আপনার কি মনে হয়?''

''আমার মনে হয় তাই-ই হওয়া উচিত। তবু নিশ্চিত নই।''

''আপনি কি জানেন তখন আমি কেমন ছিলাম?''

''ইয়েস।'' সন্দীপের 'ইয়েস' সন্দীপকে আমার খুব কাছে নিয়ে আসে। মনে হয় এক যুগ আগে থেকে ওর সঙ্গে আমার জানাশোনো। এক যুগ আগে সে আমার অনেক কাছে ছিল। অনেকেই কাছে, একেবারে আমার মনের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। সেখানে বসে সে আমার মনকে আমার নিজের চেয়েও ভালো করে পড়ে নিয়েছে। তাই তো তখনকার আমাকে নিয়ে আমি এখন ওকে প্রশ্ন করছি আর সে তার উত্তর দিচ্ছে। প্রত্যয়ের সঙ্গে।

''কেমন ছিলাম বলুন তো।''

''এমন একজন গৃহবধূর মতো যে কিনা সবাইকে সুখী করার চেষ্টা করছে।''

''লল।'' লল হচ্ছে এল ও এল যার বর্ধিত অর্থ লাফিং আউট লাউড। ''কিন্তু সন্দীপ, আমার কখনও বড় পরিবারে থাকার সৌভাগ্য হয়নি। আমার পরিবারে শুধুমাত্র আমার হাজব্যান্ড ছিলেন এবং আমার মেয়ে ছিল। আপনি কি সেই গৃহবধূকেই আপনার স্ত্রী হিসেবে পেতে চাইছেন?''

''হ্যাঁ। কিন্তু তাকে আমি কোথায় পাব?''

''আমি নিজেও জানি না। সে তো হারিয়ে গেছে।''

''আমারও তাই মনে হচ্ছে।''

''কিন্তু ভাগ্যক্রমে আপনি অনুরূপ একজনকে পেয়েছেন। সে সেই মেয়েটি থেকে প্রায় অভিন্ন। তাকে আপনি তার ক্লোন মনে করতে পারেন।''

থাম্বস আপ পাঠায় সে।

''কেন?''

''আমি এমনই একজনকে খুঁজছি।''

''আমার ফেসবুকের প্রত্যেক ডিসপ্লে পিকচারেই আপনি একটি সরল সাদাসিধে গ্রামের মেয়েরই প্রতিচ্ছবি পাবেন।''

''না রূপা, তোমার এখনকার চেহারা দেখে মনে হয় তুমি কোন উচ্চপ্রযুক্তির দুনিয়া থেকে এসেছ।''

''মারুঙ্গি।''

''বাপ্‌রে! মারের আর দরকার নেই। আই অ্যাম অলরেডি কিল্‌ড।''

পুনে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে থাকায় কলকাতার চেয়ে বেশ কিছুটা পরে এখানে সূর্যাস্ত হয়। সূর্যোদয়ও হয় দেরিতে। শহরের ভৌগোলিক অবস্থান ভারতীয় উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলের সমান্তরালভাবে বিস্তৃত পশ্চিমঘাট পর্বতমালা যা সহায়াদ্রি পর্বতমালা নামেও ততোধিক পরিচিত তার কাছে। কলকাতা বা পুনে যেখানেই থাকি না কেন রাতে বিছানা ধরা এবং সকালে বিছানা ছাড়ার সময় আমার সেই একই—রাত

এগারোটা এবং সকাল সাতটা। ফলে কলকাতার দিনগুলোকে অনেক ছোট মনে হয়। বিকেল চারটেতেই রাত তার আগমনবার্তার সঙ্গে কিছুটা অন্ধকার ঢেলে দেয় শহরের বুকে। শহরের সরু জনবহুল রাস্তা এবং রাস্তার দু'পাশে দাঁড়ানো ঘনসন্নিবিষ্ট ইমারত শুষতে থাকে সেই অন্ধকার। দিনের আলোকে পুরোপুরি উপভোগ করার আগেই আমিও ঢেকে যাই সেই ক্রমশ গাঢ় হতে থাকা প্রকৃতির চাদরে। বড্ড বিষণ্ণ লাগে মন। এখন বিকেল চারটে বেজে তিরিশ মিনিট। দু'হাজার কিলোমিটার দূরে বসে ঠিক অনুভব করতে পারছি সন্দীপও এখন ঢেকে যাচ্ছে আকাশ থেকে চুইয়ে পড়তে থাকা সেই অন্ধকারে। নিশ্চয় তারও মন খুব অস্থির হয়েছে। কিন্তু তার অস্থিরতার কারণটা কি আসলে সেই কালো চাদর? নাকি অন্য কিছু? জীবনের অধিকাংশ বছরগুলো কলকাতায় কাটিয়ে দেওয়ার কারণে সে নিশ্চয় সেই কালো চাদরের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া সে রোজ সকালে আমার চেয়ে আগে জেগে যাচ্ছে দেখছি। জেগে আমায় গুড মর্নিং করছে। অর্থাৎ দিনটাকে সে মোটামুটি বড় দৈর্ঘ্যেই পাচ্ছে। হয়ত সন্দীপের এখনকার মন খারাপ মনের মতো সঙ্গীর অভাব থেকে। মনের মতো সঙ্গী খুঁজছে সে ফেসবুকে। মনের মতো সঙ্গী খুঁজতে গিয়ে সেখান থেকে সে আমার মতো অজপাড়াগাঁর মেয়েটির আরেকটা ফটো মোবাইলে উঠিয়ে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছে। জিজ্ঞেস করছে, ''এটা কতদিন আগেকার?'' ফটোর চেহারা আজকের তারিখ থেকে অন্ততপক্ষে কুড়ি বছর আগের বলে মনে হয়। তবু সন্দীপ তাকে কুড়ি বছর আগের বলে একবারও ভুল করতে পারে না। সম্ভবই নয়। কুড়ি বছর আগে আমাদের হাতে স্মার্টফোন আসেনি।

আমি লিখি, ''সাত আট বছর। কারণ আমার হাতে যে স্যামসাং গ্যালাক্সি এস ডুওটা দেখছেন তা তখনই ইন্ডিয়াতে লঞ্চ হয়েছিল।''

''ইউ আর লুকিং এক্সট্রিমলি বিউটিফুল অ্যান্ড গর্জাস। তুমি শাড়িও বেশ সামলে নিতে পারো দেখছি।''

আমাকে সুন্দরী লাগেছে দেখতে! কি যে বলেন না আপনি সন্দীপ। ''অনেক হল। এবার এসব বন্ধ করুন প্লীজ।''

সন্দীপ ফেসবুকে আমার আরেকটা ফটো দেখে ফেলেছে। আমার আগের স্কুলের 'অ্যানুয়াল ডে'তে তোলা। আমি একটি স্পীকার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ফটোটির সঙ্গে যে তাদের রেলের ইউনিটের কোন মিল খুঁজে পেয়েছে। মেসেজে আমি ওকে এত সময় দিতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে এভাবে মেসেজের দ্বারা সারাজীবনেও আমি ওর কৌতূহল মেটাতে সক্ষম হব না। সময় বাঁচাতে কিছু কথা মুখে মুখে বলে নেওয়া প্রায়োজন। ওকে ফোন করতে বলি। সে ভিডিও কল করে। ভিডিও কলের নেশা ধীরে ধীরে পেয়ে বসছে সন্দীপকে।

আজ রবিবারেও রিলির অফিস ছিল। মর্নিং শিফট। রাতে ডিনার সেরে আমি সবেমাত্র বিছানার দিকে পা বাড়িয়েছি এমন সময় সে ইন্টারলক খুলে ঘরে ঢুকেই হইহই কাণ্ড বাঁধিয়ে দিল। হইচই-এর কারণ হল তার সঙ্গে আসা এক জড় নীরব অতিথি—টবে বসা আড়াই ফুট উচ্চতার একটি সবুজ রঙের প্লাস্টিকের গাছ। গাছের

গোড়ায় সারমাটির বদলে আছে সাদা রঙের পাথরের কুঁচি। রিলির পয়সায় দোকান থেকে ক্যাবে উঠে গিয়ে রিলির ঘরে ঢুকে পড়েছে সে।

আমি বেডরুম থেকে বেরিয়ে ওর ঘরের সামনে দাঁড়াতেই মহা-উল্লাস দেখি ওর মুখে, ''দেখেছ? সুন্দর না? কত রিয়াল লাগছে মাম্মা!'' হাত-পা ছুঁড়ে টিটিং টিং টিটিং টিং নাচ নেচে নেয় রিলি। ''কত দাম বলোতো এটার?''

''কত আর হবে! পাঁচশো?''

''কি মাম্মা, পাঁচশো টাকায় এমন প্লান্ট পাওয়া যায়?''

''তাহলে কত? আটশো?''

''শুধু প্লান্টের দাম বলছ নাকি স্টোনগুলোর সঙ্গে বলছ?''

''সবকিছু নিয়েই।''

আমার হেঁয়ালিমার্কা অনুমানের ধরন দেখে রিলির চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে মুখের চেহারা পাল্টে দেয়। ''শুধু এই গাছটারই দাম আঠারোশো টাকা। পাঁচশো টাকা দিয়ে স্টোন আমি আলাদা কিনেছি।''

''অকারণে এতগুলো টাকা নষ্ট করলে। ঘরে জায়গা আছে রাখার?''

''হ্যাঁ আছে।'' হাত-পা-ছোঁড়া আরেক প্রস্থ নাচ শেষ হয়—''টিটিং টিং টিটিং টিং।''

রিলি গাছটি রাখার উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পায় না। চার দেওয়ালের কোথাও এতটুকু খালি নেই। রাখতে হলে কিছু না কিছুর সামনেই রাখতে হবে। সে ভেবে পাচ্ছে না কার সামনে রাখা উচিত। কখনও মনে হচ্ছে আলনার সামনে ভালো দেখাবে, কখনও মনে হচ্ছে আয়নাটার সামনে, কখনও শু-র‍্যাকের সামনে। দু'চারবার এদিক সেদিক করার পর আয়নার সামনেই সে গাছটিকে পাকা স্থান দিয়ে দেয়। আমি বুঝি কেন। রিলি ভাবছে সেখানে রাখলে আয়নায় গাছের প্রতিফলন দেখা যাবে। মিথ্যের জোরে একটু বেশি সবুজ লাগবে ঘর।

গাছের ব্যাপারটা মিটে যেতেই সে আলনা নিয়ে পড়ে। পুরনো ফ্রকগুলোকে সরিয়ে সেখানে আজই অনলাইন পোর্টাল থেকে আসা নতুন ফ্রককে জায়গা দিতে হবে। কয়েকদিন আগেই রিলির এমন নতুন-পুরনোর স্থান পরিবর্তনের খেলায় আমার বেশ কিছু সংখ্যক প্যান্ট-টপের প্রাপ্তি ঘটেছে। মানে রিলি সেগুলোকে জোর করে আমার ওয়ারড্রোবে ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্যান্ট-টপগুলো ওর কাছে পুরনো হলেও আমার কাছে নতুন। সম্পূর্ণ নতুন। ওর কাছে পুরনো হয়েছে চোখের দেখায় এবং ট্রায়াল করায়। আমি সেগুলোকে আগে কখনও চোখেও দেখিনি। পাওয়ার পর রিলির জেদে ট্রায়াল করে অল্প কয়েকটা পরছি, বেশিরভাগটা রেখে দিয়েছি ভবিষ্যতের জন্য। আজ সে ওর ফ্রক নিয়ে আমার মাথা খেয়ে ফেলছে, 'এটা পরে দেখো, ওটা পরে দেখো...''

''আমি ফ্রক নেব না।''

''না নেবে।''

''এই বয়সে ফ্রক পরলে আমাকে হাস্যকর দেখতে লাগবে,'' করুণ মিনতি আমার।

''না লাগবে না। বাই দ্য ওয়ে, এটা ফ্রক নয়। এটাকে বডিকন ড্রেস বলে।''

''তা হোক।''

''তা হোক না। পরো।''

সকাল থেকেই নানা ফোন কলে উত্যক্ত ছিলাম। বেশি উত্যক্ত হয়েছি ঘোড়াই-এর ওপর। সেই রাগ এখনও কমেনি। তার ওপর রিলি আমাকে আরও রাগিয়ে দিচ্ছে। ওর দেওয়া রাগের প্রকাশ আমি ওর সামনে করতে পারছি না। আমি একগুণ রাগ দেখালে সে দু'গুণ দেখাবে। দাঁড়াও একটু আসছি বলে বেডরুমে ঢুকে সন্দীপকে মেসেজ করলাম, ''একটু কল করুন তো। খুব ডিস্টার্বড আছি। ঘুমোতে পারছি না।''

সে উত্তর দিল, ''চেষ্টা করো ঘুমনোর।''

''আরে, সেই লোকটা মেসেজ করেছে, আমি আপনাকে এখনই বিয়ে করতে চাই বলে।''

''কে? যে হোয়াটসআপে বিয়ে করবে বলছিল?''

''হ্যাঁ। এদিকে মেয়ে একটা আর্টিফিশিয়াল প্লান্ট নিয়ে এসে ননস্টপ বকবক করে চলেছে।''

''কি বকবক করছে?''

''ওই...কি সুন্দর, কত দাম, কত সস্তায় পেয়েছে এসব। এক কথা বারবার বলছে। একটা থ্রীডি পাজলও কিনে নিয়ে এসেছে। জেদ ধরেছে এখনও ওর সঙ্গে বসে সেগুলোকে জুড়তে হবে।''

''যাও, ওর সঙ্গে বসো।''

''ওর ফ্রক পরার জন্য জোর করছে।''

''ইয়েস। আমিও দেখতে চাই ফ্রক পরে তোমাকে কেমন লাগে।''

আমার মনে হল সন্দীপ মজা করছে। আমরা দু'জন এক প্রজন্ম আগের মানুষ, সুতরাং এই প্রজন্ম থেকে আলাদা হয়ে ছোটছোট বৈষম্যকে সঙ্গে নিয়েই আমরা যে এক হয়ে যাব তাতে কোন সন্দেহ নেই, যেমন বৈষম্যকে সঙ্গে নিয়ে আধুনিক মানুষ শিম্পাঞ্জী থেকে আলাদা হয়ে এক হয়ে গেছে কিংবা পুরুষ এক হয়ে গেছে মহিলা থেকে আলাদা হয়ে। ওর কাছে অনুযোগ রাখি, ''এখনই তাকে ট্রায়াল করে দেখাতে হবে। কি ফালতু জেদ বলুন তো!''

''পরো। আমিও আমার ডিনার সেরে এসে তোমায় দেখব।''

সন্দীপকে এবার সিরিয়াস মনে হচ্ছে। আমার মাথা থেকে কি এক ভয়ের বিদ্যুৎ পায়ের দিকে বইতে শুরু করেছে। বিদ্যুৎ বলছে, মনে রেখো সন্দীপ কিন্তু এখানেই থেমে থাকবে না। তুমি তার একটা চাহিদা পূরণ করলে সে আরও কিছু চেয়ে বসবে। আজকে না হলেও কালকে। এর আগে তোমার এমন অভিজ্ঞতা হয়নি কি? বিদ্যুৎ বইতে বইতে তা আমার হাতদুটোকেও কাঁপিয়ে দিচ্ছে। নড়বড়ে হাতে একটা মেসেজ ছেড়ে দিই সন্দীপের উদ্দেশ্যে, ''পুরো দুনিয়া আধুনিকতার পাগলামিতে মেতে গেলেও আমি আমার সেই সেকেলে আমি নিয়েই খুশি থাকব।''

আবার লিখি, ''এটা কোন হাল্কা রসিকতা নয় বলুন? হতেই পারে না। আপনি যে খুব ব্রিলিয়ান্ট। আই আই টিয়ান।''

আমার সব মেসেজকে উপেক্ষা করে সে লেখে, ''আমি পনেরো মিনিটে ফ্রী হব।''

পনেরো মিনিট সময় নিয়ে গোগ্রাসে খাবার খেয়ে সন্দীপ বারো মিনিট পরেই হাজির হয়। জিজ্ঞেস করে, ''তুমি কি রেডি?''

''ধ্যুর, এটা কখনই হতে পারে না।''

''অবশ্যই হতে পারে। দেখাও আমাকে প্লীজ।''

''উল্টোপাল্টা বলবেন না তো!''

মেয়ের কথা টেনে প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টা করি, ''শুধু শুধু আড়াই হাজার টাকা নষ্ট করল।''

''এটা ওদের যুগ। ওরা এমনই করবে—নষ্ট করেই আনন্দ পাবে,'' বলেই সন্দীপ আগের কথায় ফিরে যায়, ''আমার মনে হয় ফ্রক পরলে তোমাকে দেখতে খুব সুন্দর লাগবে।''

''আপনিও কি শৈবাল ঘোড়াই-এর মতো পাগল হলেন?''

''একটু পাগল হয়েছি।''

''বেঙ্গলি ম্যাট্রিমোনি থেকে সব আদর্শ লোকজন উঠে আসছে দেখছি। বিয়ে টিয়ে আমি করছি না। একাই ঠিক আছি।''

''বিয়ে করবে কি করবে না এটা তোমার ব্যাপার।''

আহত হই। তার মানে ভালবাসছি জেনেও সন্দীপ আমাকে বিয়ে করার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ রাখছে না। তাহলে আমার অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও আমাকে আমার ফ্রক পরা চেহারা দেখানোর জন্য জোর করছে কেন? কোন সম্পর্কের অধিকারে বা কোন সম্পর্কে বাঁধা পড়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগোনোর সূত্র ধরে?''

আহত মন নিয়ে লিখি, ''নিশ্চয়, আমার সিদ্ধান্ত।'' মনে মনে চাইলাম ওর এই মন্তব্য নিয়ে সে আর একবার ভেবে দেখুক। কিন্তু সন্দীপ সেই ভাবনাতে একদমই গেল না। তার মাথায় এখন ফ্রক ভর করেছে। বলল, ''সামনে এসো প্লীজ।''

''কেন?''

''তুমি নিশ্চয়ই দেখতে খুব অ্যাট্রাকটিভ লাগছ তাই।''

সে পরপর আরও কয়েকটি মেসেজ লিখল। একবারে অধৈর্য হয়ে।

—ফ্রক পরে তোমার বয়সও নিশ্চয় অনেকটা কমে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে?

—কেমন লাগছে তোমাকে দেখতে?

—কি অনুভব করছ তুমি?

—ফ্রকটা নিশ্চয় খুব সুন্দর?

''রিলির আবদারের কথা বলে আমি আপনাকে এটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম যে রিলি কত ছেলেমানুষ। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে আমি ভুল করেছি।''

''মাদার্স ডেতে সে তার মাকে কমবয়সি এবং প্রাণবন্ত দেখতে চাইছে।''

''আর আপনি?''

''আমি তোমাকে খুশি দেখতে চাই।''

''আমাকে দিয়ে জোর করে সেই কাজটি করিয়ে যেটা আমি করতে পছন্দ করছি

না?"

"ট্রায়াল করো প্লীজ। তোমাকে দেখতে নিশ্চয় অনেক গর্জাস লাগবে।"

শরীরকে অনাবৃতকরণের ভিত্তিতে কোন মহিলাকে যদি খারাপ ভালোর পর্যায়ে ফেলা হয় তাহলে আমি নির্ঘাত খারাপেরই পর্যায়ে পড়ব। খোলা-মেলা অল্প কাপড়ের ব্লাউজ পছন্দ করি, জিনসের সঙ্গে হাতকাটা টপ এবং সময়বিশেষে শ্রাগের নিচে স্পাগেটি পরি। তবে আমার এই ড্রেস-কোড বিশেষ কোন একজনকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নয়। যখন কোন ড্রেস রাস্তাঘাটে চলার সময় উদাসীনতার সঙ্গে সবাইকে দেখানো হয় তখন বস্তুতপক্ষে কাউকেই দেখানো হয় ন।

ফ্রক আমি না পরলেও সন্দীপের জোরাজুরিতে আমার তৃতীয় চোখ খুলে গেছে। সেই চোখ দিয়ে আমি দেখছি সন্দীপ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে চশমা পরে। তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি চশমার কাচকে ভেদ করে আসার সময় বহুগুণ বিবর্ধিত হয়ে একসঙ্গে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো অংশকে গ্রাস করে ফেলেছে। দৃষ্টি অন্তর্ভেদী হওয়ায় সে শুধু আমার শরীরের খোলা অংশটাকেই দেখছে না, ঢাকা অংশটাকেও দেখছে। খুব অসুবিধে হচ্ছে। খুব রাগ হচ্ছে সন্দীপের ওপর।

"আমি একজন অন্ধ লোকের ভালবাসা পেতেই বেশি পছন্দ করব," রাগে গজগজ করতে করতে টাইপ করি মেসেজ।

সে উত্তর দেয়, "তাহলে তো তোমাকে তার কাছে যেতে হবে যাতে করে সে তোমাকে ছুঁয়ে অনুভব করতে পারে।"

এবার রাগে আমার গা ঘিনঘিন করে। কোন একটা অন্ধ লোক যাকে আমি চোখেই দেখিনি, যার চেহারা কখনও আমার কল্পনাতেই আসেনি, ফলে যার ভালবাসা পাওয়ার প্রশ্ন মনে উদ্রেকই হতে পারে না, যার নাম এমুহূর্তে শুধু উল্লেখ করার জন্যই আমি করেছি তার গায়ের সঙ্গে আমার গা লাগিয়ে দিল সন্দীপ! ছি ছি। ফ্রকের মোহে আমার সম্মানের একটুও খেয়াল রাখল না! ফ্রকের মোহে যেন-তেন-প্রকারেণ কোন না কোন পুরুষের কাছে নিয়ে গিয়ে আমাকে অনাবৃত করেই ছাড়ল সে!

সন্দীপ লেখে, "ভিডিও কল করো। রাত হচ্ছে। আমাদের ঘুমোতে হবে।" এ যেন কোন মেসেজ নয়—আদেশ।

"হুঁ। এমন আশা রেখে লাভ নেই। আপনার সঙ্গে আমার মাত্র চার পাঁচদিনের মেলামেশার অধ্যায়। বিয়ে করব! অসম্ভব। ভুলে যাব সব।"

"বিয়ে করতে বলিনি তো। ভিডিও কল করতে বলেছি।"

"তারপর?" রাগের দমকেও আমি সন্দীপকে দূরে ঠেলতে পারছি না। ফিরে ফিরে আসছে সে আমার কাছে, তার প্রতি আমার দুর্বলতার জায়গাতে।"

"তারপর...ফ্রক।"

"তারপর?"

"করো না..."

"কি?"

"ভিডিও কল।"

''তারপর?''

''তারপর আমি তোমার হাতে মাথা রেখে ঘুমবো...''

''তারপর?'' দেখতে চাই সে কি বলে। পরখ করে নিতে চাই আমার শরীরে বয়ে যাওয়া ভয়ের বিদ্যুৎ ঠিক বলেছে না ভুল বলেছে।

''তোমাকে জড়িয়ে ধরব...''

এবার আমার একটা বুলেট মেসেজ গিয়ে পৌঁছয় সন্দীপের কাছে, ''ডেটিং সাইটে যান।''

''কোন ডেটিং সাইট?''

''অনেকই তো আছে। আপনি আমার চেয়ে বেশি জানেন।''

''টিন্ডার...?''

ভয়ের বিদ্যুতের ঝটকা খাই। টিন্ডারের নাম সন্দীপ জানে! তাহলে কি সে সেখানে যেতে অভ্যস্ত? এক মিনিটের মধ্যে লিখে ফেলি, ''আপনার স্ত্রী এইজন্যই বুঝি আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে?''

''না, এটা কোন কারণ নয়।''

''আমি বিশ্বাস করি না।''

''আমার মনে হয় আমি তোমাকে সবকিছু বলেছি।''

''না, আপনি সবকিছু বলেননি। এমনকি আমিও জিজ্ঞেস করিনি।''

''আমরা আলোচনা করেছিলাম। প্রয়োজন হলে আবার আলোচনা করতে পারি।''

আমি দেখছি আমি রাগলেও সন্দীপ রাগছে না। খুব ঠাণ্ডা মাথায় সে আমার বিগড়ে দেওয়া মেজাজকে সামাল দিয়ে চলেছে। সে নিশ্চয় জানে সামনের ভালবাসার মানুষটি রাগে চঞ্চল হয়ে উঠলে তার নিজেকে স্থির রাখতে হবে। অথবা এমনও হতে পারে আমার রাগ তার ভালবাসার বহিরাবণকে ভেদ করে তাকে ছুঁতেই পারছে না। তাই আমি যখন লিখেছি, 'আমার কাছে আসা শুধু দুষ্করই নয়, প্রায় অসম্ভব' সন্দীপ তার মেজাজ শূন্যে নিয়ে গিয়ে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে দিয়েছে। দিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, ''তাহলে আমি এখন কি করি?''

''অন্য কোন মহিলার কাছে যান।''

''এখন তো রাত। অনেক দেরি হয়ে গেছে।''

''আমি এখনকার কথা বলিনি। আপনার বাকি জীবনের জন্য বলেছি। এখনকার জন্য টিন্ডার ডট কম আছে।''

খুব নিরাশ লাগছে। সন্দীপ আজ আমাকে বিয়ের কোন ইচ্ছেই দেখায়নি। তার বদলে যা দেখিয়েছে তা আগে আরও অনেক পুরুষের মধ্যে আমি দেখেছি। তারাও সম্পর্কের বন্ধন নিয়ে ভাবে না। তারাও মেয়েদের মন পড়ে না, তাদের ভালো বা খারাপ লাগার খেয়াল রাখে না, মেয়েদের মন কোথায় ঘা খেল তারা তা বোঝে না, কেননা তারা মেনেও মানতে চায় না যে সব মেয়েরা একরকমের হয় না। ফ্রক পোশাকটাকে খারাপ বলার সাহস নিশ্চয় আমার নেই। কিন্তু আমি একজন পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই ভারতীয় বাঙালি মহিলা বিগত পঁচিশ বছর ধরে যেমন তা পরতে অভ্যস্ত নই আমার দৃঢ় বিশ্বাস সন্দীপও তার চুয়ান্ন বছর বয়স পর্যন্ত এমন মহিলাকে এমন

পোশাকে দেখতে অভ্যস্ত নয়। কাজেই এই বিশেষ দেখা এবং দেখানোর ব্যাপারটা আমার পক্ষে বিশেষ ধরনের সম্পর্কের জন্যই সম্ভব হতে পারে। হলেও হঠাৎ করে নয়। সময় প্রয়োজন, প্রচেষ্টার প্রয়োজন—একদিনের, দু'দিনের বা তিনদিনের। অনেক না না হবে, অনেক হ্যাঁ হ্যাঁ হবে, যাও তোমার সঙ্গে কথা বলব না হবে, তারপর। অন্তরঙ্গ সম্পর্কে বাঁধা পড়লেও দু'জন দু'জনের যে সবকিছু মেনে নেবে তার আশা করা মানে ভুল করা এবং আশা করে না পেয়ে নিরাশ হয়ে সম্পর্ক নষ্ট করা মানে চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে নরকবাস করা। সন্দীপের সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক? ভালবাসার? কি ধরনের ভালবাসা? কি ভবিষ্যৎ আছে তার? সন্দীপ তো বুঝিয়েই দিয়েছে আমি ওকে বিয়ে না করলেও তার কিছু আসে যায় না। তাহলে টিন্ডার থেকে পাওয়া মেয়ে এবং ভারত ম্যাট্রিমোনি থেকে পাওয়া আমি মহিলার মধ্যে এমন কি পার্থক্য রইল! পার্থক্য শুধু এটাই যে টিন্ডারের মেয়ের সঙ্গে পুরুষের একদিনেরও আবেগময় কথা জড়িয়ে থাকে না কিন্তু আমার সঙ্গে সন্দীপের পাঁচদিনের আবেগময় কথা জড়িয়ে আছে। সন্দীপের সঙ্গে আমার এই পাঁচদিনের আবেগ আমাকে না তাকে অনেক দূরে সরিয়ে দেওয়ার অনুমতি দিচ্ছে না তাকে জামাকাপড়ের বাধা সরিয়ে অনেক কাছে টেনে নেওয়ার অনুমতি দিচ্ছে। জামাকাপড়ের বাধা সরিয়ে কাছে টানতে হলে যে ঘরের দরকার পড়ে সেই ঘর আজ সন্দীপের মোটেও প্রয়োজনীয় মনে হয়নি। রাতে ভিডিও কল নয়, ভয়েস কলে আমি সন্দীপের সামনে আমার মন উথালপাথাল করে দেওয়া ভাবনাগুলোকে শান্তভাবে তুলে ধরি। সে আমাকে কতটা উপলব্ধি করতে পারে বুঝি না। শুধু বলে, ''আমি খারাপ তো কিছু বলিনি। তোমার যদি আমাকে নিয়ে কোন সংশয় থাকে তাহলে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে পারো।''

''আমি কারও কথায় চলি না। আমি আমার মন যা বলে তাই করি। আমার সিদ্ধান্ত আমার কাছে। কিসে আমার সুখ কিসে দুঃখ তা আমার চেয়ে ভালো কেউই বুঝবে না।''

''ঠিক কথা।''

মন আমার খারাপই থাকে। সকাল ছ'টা একুশে সন্দীপ আমাকে গুড মর্নিং করে। তারপর লেখে, ''আমি ভেবেছিলাম তুমি জিজ্ঞেস করছ তোমাকে ফ্রক পরে দেখার পর আমি কি করব। তাই আমি লিখেছিলাম আমি ঘুমবো।'' *না সন্দীপ, তুমি বলেছ আমার বাহুতে মাথা রেখে শোবে, আমাকে জড়িয়ে ধরবে। জড়িয়ে ধরো, তাতে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। কিন্তু ঘরটা বানিয়ে যা করার করো। আমার শত দ্বিধা হলেও মেনে নেব। দ্বিধা না হলে তো নেবই*। উত্তর দিতে মন চায় না। ছ'টা একান্নতে সে আমাকে কল করতে বলে। বলে তাহলে সবকিছু এক্সপ্লেন করতে পারবে।

কল না পেয়ে আটটা চুয়াল্লিশে সন্দীপ লেখে, ''অন্তরঙ্গ মুহূর্ত সম্পর্কের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ কেননা তা বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ায়। কিন্তু আসল সুখ অর্গাজম থেকে আসে না। অর্গাজম হল ক্ষণস্থায়ী। আসল বা সত্যিকারের সুখ সম্পর্কের আরও অনেক উপাদানের ওপর নির্ভর করে যেমন সে তোমাকে কিভাবে দেখছে, কিভাবে

পর্যবেক্ষণ করছে, তোমার সঙ্গে কিভাবে কথা বলছে, তোমার কথা কিভাবে শুনছে, কিভাবে সে তোমার ভাবনাকে সম্মান করছে, এবং...এবং সবথেকে বড় কথা তোমার শরীর যখন কাপড়ে সম্পূর্ণ আবৃত তখন সে তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছে।"

মেসেজটা পড়ে অল্প ভালো লেগেছে। অনেক নয়। সন্দীপ এত কিছু ব্যাখ্যা করেছে কিন্তু কোন সম্পর্ককে ঘিরে সেই ব্যাখ্যা সেটাই বলেনি। তাহলে আমি কি এটাকে তার গতকাল রাতের মন্তব্যের ওপর ভিত্তি করে প্রণয়ী-রক্ষিতার সম্পর্ক ভাবব?

আমাকে নিশ্চুপ দেখে ওদিকে সন্দীপ অশান্ত হয়ে পড়েছে। কয়েক মিনিট বাদে সে জানায়, ''আমাজনে দুটো লাইন লিখেছি। প্লীজ চেক করো। আমি ঠিক পড়তে পারছি না।"

দু'দিন আগে সন্দীপের সঙ্গে আমার বই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সে বলেছে বইগুলোর প্রচার দরকার। আমি বলেছি বই-এর প্রচার প্রকাশকের কাজ। এটা তার ব্যবসায়িক কলা কৌশল। লেখককে প্রচারের কাজে নামতে হলে তাঁরা লিখবেন কখন? ভেবেছিলাম আমাজনে নিজের জন্য একটা সেলারস' অ্যাকাউন্ট খুলব। খুলতেও গিয়েছিলাম। মাঝখানে সমস্যা নিয়ে আটকে গেছি। আমাজনে ফোন করে সেই সমস্যার সমাধান আজও হয়নি।

পরপর আরও কয়েকটি মেসেজ আসে সন্দীপের।

—আজ আমাকে অফিস যেতে হবে। কত বিরক্তিকর।

---আমাজনে যে দুটো লাইন লিখেছি তা হল, একজন লেখক যিনি কনফিউশিয়াসের নৈতিক আচরণ-কেন্দ্রিক দার্শনিক মতবাদে বিশ্বাস করেন এবং তীব্র বিষাদ চিরস্থায়ী হতে পারে না।

বুঝতে পারছি আমাকে মানানোর চেষ্টা করছে সে। কিছুটা ভালো লাগা এবং কিছুটা খারাপ লাগা নিয়ে আমি রিলির ঘরে গিয়ে ওকে ট্রেডমিল বন্ধ করতে বলি। পড়াই ওকে সন্দীপের অর্গাজমের সেই মেসেজটা। সে বলে, ''সুন্দর লিখেছে।"

সম্পর্কের ধরন নিয়ে ধারণা স্পষ্ট না হলেও রিলির কথা শুনে মন আরেকটু ঠিক হয়। আশাবাদী হই—আমরা তো ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটেই একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, আমাদের গন্তব্যস্থল বিবাহ নামক সংস্থা না হলে সন্দীপ এভাবে আমার কাছে নিশ্চয় আসতে চাইত না।

রিলি বলে, ''জানো সেক্সুয়াল রিলেশনশিপ থেকে খুব কম মেয়েরাই অর্গাজম পায়? আসলে খুব কম মেয়েরাই অর্গাজমের ব্যাপারটা জানে। আর ছেলেরা তো প্রায় জানেই না। তারা মনে করে ছেলেদের ইজাকিউলেশনই হল দু'জনের জন্যই ইন্টারকোর্সের ক্লাইম্যাক্স স্টেজ।" রিলি বাংলা জানে না। আমি জানি। ক্লাইম্যাক্স স্টেজকে বাংলায় বলে সঙ্গমের চূড়ান্ত পর্যায়।

বস্তুত অর্গাজম শব্দটা আমিও মাত্র কয়েকমাস আগেই প্রথম রিলিরই কাছ থেকে জেনেছি। সেদিন আমি কলকাতার ঘরে বসে ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলাম। কোন প্রসঙ্গে এমন আলোচনা শুরু হয়েছিল বিস্মৃত হয়েছি। শুধু মনে আছে আমি অর্গাজমের মানে জিজ্ঞেস করায় সে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল, ''মাম্মা,

তুমি অর্গাজম কি জানো না মাম্মা! লাইফে তুমি কি পেলে মাম্মা!" রিলি জানে না আমার জন্য তার সেই কান্না আমার জীবনের অনেক খালি পাত্র কানায় কানায় ভরে দিয়েছে।

আজ রিলি ট্রেডমিল থেকে নেমে গায়ের ঘাম টাওয়েলে মুছতে মুছতে বলছে, ''আমার তো অর্গাজম চাই বাবা। কিন্তু জানি না কে আমাকে সেটা দিতে পারবে।"

খুব হাসি ওর কথা শুনে। কথা বলার ধরন দেখে। ছেলেমানুষি দেখে। সন্দীপের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ওঠা আলোচনায় ফেটে পড়েছে এমন হাসির কথা। কিন্তু আমি তা সন্দীপকে বলতে পারব না। সে রিলিকে এখনও তেমনভাবে জানে না। কথা তো কখনও হয়ইনি তার রিলির সঙ্গে। আর সবথেকে বড় ব্যাপার আমি সন্দীপকে ঠিক যেন চিনেই উঠতে পারছি না।

দুপুরের দিকে আমার-সন্দীপের রাতের মেসেজগুলোর স্ক্রিনশট নিয়ে অনিন্দিতাকে পাঠিয়েছিলাম। সেসব নিয়ে সে তার মতামত জানিয়েছে। এক একটা করে মেসেজ ধরে মতামত। যেমন ঃ

—ফ্রকের কথায় সে লিখেছে, কত রোমান্টিক! তোর জন্য পাগল সে একটু হতেই পারে। এটা তোর ক্রেডিট।

—জড়িয়ে ধরার কথায় সে লিখেছে, খারাপ তো কিছু দেখছি না!

—সকালে ফোন করতে বলার কথায় সে লিখেছে, যখন বলেছে এক্সপ্লেন করবে তখন একবার মিস কল দে। কাছের মনে করেছে বলেই তো বলেছে। কি জানি বাবা, তোকে বুঝতে পারব না। ও কিন্তু খুব একটা ভুল নয়।

অনিন্দিতাকে লিখি, ''ও সকালে ফোন করেছিল। আমি রিসিভ করিনি।"

''ওকে একবার এক্সপ্লেন করার সুযোগ দে। ব্রিলিয়ান্ট লোক। তুই ওকে উল্টো বুঝলে ওর খারাপ লাগবে।"

অনিন্দিতা স্ক্রিনশট থেকে মেসেজের কিছু পয়েন্ট বুঝেছে, কিছু বোঝেনি। সম্পর্কের ব্যাপারটাকে পুরো এড়িয়ে গিয়ে সন্দীপের প্রতি এক অসম্ভব দুর্বলতা থেকে সে ক্রমাগত তার তরফদারি করে চলেছে। আমি এটা বুঝছি। বুঝেও ওর বা সন্দীপের ওপর আমার রাগ হচ্ছে না। আমি সন্দীপকে আসলে ভয় পাচ্ছি। কাছে গিয়ে কাছে না পাওয়ার ভয়।

অনিন্দিতা বলে, ''কোন মানে হয় না এই ভয়ের। সে হয়ত নিজেও একা। তোকে কাছে পেয়ে একটু আবেগপ্লুত হয়ে পড়েছে। একটা কথা মনে রাখিস, বুদ্ধিমান লোকজন কিন্তু ডায়ানেমিক হয়।"

''জীবনে অনেক ঘা খেয়েছি। কোয়ালিফিকেশন, টাকার মোহ আমার নেই। আমি শুধু একটা ছলনাহীন মানুষকে সঙ্গে চাই। স্থায়ীভাবে।"

''তুই একটা কাজ কর। ভারত ম্যাট্রিমোনি থেকে তোর নামটা সরিয়ে দে। আমি কিন্তু ওর সাইডে।"

আমার কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে অফিসে সন্দীপের মন বসে না। দুপুর একটা চৌত্রিশে সে লেখে, ''আমি এখন কি করি?" মনকে ছুঁয়ে যায় তার আত্মসমর্পণ।

একটা সাঁইত্রিশে মেসেজ আসে, ''তোমার হোয়াটসাপের ডিপিটা চেঞ্জ করো। অনেকক্ষণ ধরে সেখানে একই ছবি রেখেছ।''

হোয়াটসাপের ডিপি আমি ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিবর্তন করি। এটাই আমার টাইমপাস। সে বুঝেছে মন নিশ্চয় আমারও ভালো নেই। তাই ভালো লাগার জিনিসটিও করতে আমার ভালো লাগছে না। ডিসপ্লেতে আমার পরিবর্তে রিলির ছবি আছে। ডিসপ্লেতে রিলির ছবি অনিন্দিতারও অপছন্দ। বলেছে, ''এই সময় ডিসপ্লেতে তোর ছবি রাখলে কি ক্ষতি হত?''

সন্দীপ তার অফিসের একটা চেম্বারের ফটো পাঠিয়েছে। ''আমি আগে যখন কলকাতায় পোস্টেড ছিলাম তখন এই চেম্বারে বসতাম। এখনও এখানেই বসে আছি, অর্ডারের অপেক্ষা করছি।'' পাঁচ মিনিট পরে ভুল সংশোধন করে, ''বসিনি, শুধু অপেক্ষা করছি।''

তার ঘণ্টা দেড়েক বাদে, ''কিছু বলো না।''

তার পনেরো মিনিট বাদে, ''কল করো না।''

''তার পনেরো মিনিট বাদে, ''তুমি কি ফ্রী আছ? আমি কল করি?''

চারচাকার গাড়িটা নিয়মিত চালানো হয় না বলে খুব সমস্যা দেয়। প্রত্যেকবার পুনেতে এসে দেখি কোন না কোনভাবে ওটা খারাপ হয়ে বসে আছে। মেরামতের অপেক্ষা করছে। এবার গাড়ির সামনের টিউবলেস টায়ারদুটোতে টিউব ঢালতে হবে মনে হচ্ছে। মেকানিকের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আমি ওকে জানাই, ''বাইরে আছি।''

''ওকে।''

''আমি আপনার উপযুক্ত নই।''

''কি বলছ তুমি? তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?''

''সত্যি কথাই বলছি।''

''আমি মানি না।'' আবার পরপর কয়েকটি মেসেজ করে সে।

—আমাজনে ওই লাইনদুটো তোমার পছন্দ হয়েছে? একটা তোমাকে নিয়ে লিখেছি। অন্যটা তোমার উপন্যাসকে নিয়ে।

—আমার বোন আসছে। সে চলে যাওয়ার পর তোমার সঙ্গে কথা বলব।

—তুমি একজন দারুণ মহিলা।

—আমি এটা কালকেই জেনেছি।

একটা মেসেজ লিখে আমি ডিলিট করি। সে জানতে চায়, ''কি করছ? কি লিখেছিলে?''

আরেকটা মেসেজ লিখে ডিলিট করি। সে বলে, ''তোমার কি হয়েছে রূপা? বারবার মেসেজ লিখছ আর ডিলিট করছ!''

রাত দশটা ছাপান্নতে বোনকে বিদায় দিয়ে সে লেখে, ''আমি এখন ফ্রী।'' কিন্তু ততক্ষণে আমি আমার হোয়াটসআপের ডিসপ্লে পিকচার পাল্টে অশান্ত মন নিয়ে ঘুমনোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি।

চারটে সাতান্নতে সন্দীপ আমাকে নক করে, ''গুড মর্নিং।''

কলকাতায় এখন নিশ্চয় সকাল। সকাল না হলেও ভোর। আমার ঘরে যতটুকু আলো তা মাথার উপরে ঝুঁকে থাকা দুটো এক ভোল্টের নাইট ল্যাম্পের দৌলতে। উঠে গিয়ে স্লাইডিং দরজার পর্দাদুটো দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে কাচের বাইরে ঘন অন্ধকারকে দেখি। সেখানেও সূর্যের সাদা আলোর শুভাগমনের কোন বার্তা নেই। পর্দা আবার টেনে দিয়ে বিছানায় ফিরে আসি। রিলি পাশে ঘুমিয়ে আছে। সেকেন্ড শিফট করে রাত বারোটায় ঘরে ঢুকেছে সে।

দু'মিনিট পরে আমি ওকে উত্তর দিই, ''এত রাতে!''

''তোমার কথা ভাবছিলাম।''

''কি কথা?''

''গতকাল আমাদের কোন কথা হল না...তারপর...আগের দিনের ইভেন্টগুলো...''

''ইভেন্টস?''

''হ্যাঁ, আগের দিন আমাদের মধ্যে যা যা হয়েছে সেসব...''

''কি করছ?'' জিজ্ঞেস করে সে।

''কিছু না।''

''রাতে কি ঘুমিয়েছিলে? নাকি এখনও লিখছ?''

''না ঘুমিয়েছি না লিখছি।''

''তাহলে...?''

''তাহলে আর কি! কিছুই করিনি।''

''এখন কি ঘুমোতে চাও...?''

''জানি না।''

''কথা বলবে...?''

''কেন?''

''জানি না...''

''তাহলে আমিই বা কি করে জানব যে কি কারণে আমাদের কথা বলা উচিত?''

''হয়ত এই জন্যই যে আমি তোমার মিষ্টি আওয়াজটা অনুভব করতে চাই...''

''অনুভব করতে চান!''

''...আমার সঙ্গে কথা বলার সময় তোমার কোনকিছু ফীল হয় না...? তুমি কি রোবট?''

হয়, অনুভব হয়, অনেক কিছুই অনুভব হয়। সন্দীপ, তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় আমার মন কেঁপে ওঠে। ভীষণ ভালবাসতে ইচ্ছে করে আমার তোমাকে। কিন্তু আমি সেই ইচ্ছেকে দমন করে রাখি। কেন রাখি সে তুমি বুঝবে না।

''হ্যাঁ...রোবট।''

''তুমি জানো কি ডেটিং সাইটগুলো আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স বেসড (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক) রোবট তৈরি করার চেষ্টা করছে? তারা কথাবার্তা থেকে শুরু করে সবরকমভাবে মানুষকে এন্টারটেন করবে। বলো তো এমন হলে তখনকার অবস্থাটা কেমন হবে...?''

ইশ্ সন্দীপ, তুমি আবার শুরু করলে। শরীরের গঠন, লুক, ভালবাসাবাসি,

ডেটিং, ফিলিং এসব ছাড়া অন্য কথা তুমি কেন বেশি বলো না? জানি ভালবাসা হলেই আমাদের বিয়ে হবে অথবা বিয়ে হলে ভালবাসা, তাই বলে যখন-তখন আমাকে এত ঘাঁটিয়ে দেখার কি আছে!

''আমি এসব ব্যাপারে বেশি আগ্রহ রাখছি না। পৃথিবীতে অনেক ভালো জিনিসেরও আবিষ্কার হয়েছে। সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের চলা উচিত। যারা সভ্য তারা কোন অবস্থাতেই তাদের শালীনতা হারাতে পছন্দ করে না।''

''আমি যা বলতে চাইছি তা হল, অনেক লোক না জেনেই রোবটের সঙ্গে তাদের আবেগকে জড়িয়ে ফেলবে।''

''গঠনমূলক এবং বিনাশকারী আবিষ্কার তো সেই শুরু থেকেই পাশাপাশি হয়ে চলেছে। এটা আর নতুন কি! শুধু যুগের সঙ্গে তাল রেখে আবিষ্কারের প্রকৃতির পরিবর্তন হয়েছে এই যা। এটা তাদের সমস্যা যারা এই আবিষ্কারের সুবিধে নিতে চাইবে।''

''ঠিক বলেছ। দুনিয়া নষ্ট হয়ে যাবে। কেউ এর সঙ্গে নিজেকে অভিযোজিত করতে পারবে না। কে জানে, এখনও হয়ত এগুলো হচ্ছে!''

''এসব নিয়ে ভাবতে বসলে আপনার সেই প্রফেসরজী এতগুলো জার্নাল পাবলিশ করতে পারতেন না।''

''লল,'' আমার কাছ থেকে শেখা লল আমায় ফেরত দেয় সন্দীপ।

''রোবটের কথা ভাবলে আপনিও আমাকে এত ভালবাসতে পারবেন না।''

''না, তেমন কিছু হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।''

''সম্ভাবনা আছে। দু'জনের সঙ্গে পাশাপাশি কি করে সম্পর্ক চালাবেন?'' হাল্কা রসিকতা প্রকাশ পেয়ে যায় আমার মেসেজে।

''রোবটের আবেগকে অনুভব করানোর জন্যই যদি মানুষ এতই উঠেপড়ে লেগেছে তাহলে আমার ফোনের উল্টোপাশে যে রোবট আছে তারও ইমোশনকে আজ আমি অনুভব করব...এবং এটাই হবে আমার আজকের চ্যালেঞ্জ...''

এবার আমি নিজেকে সত্যিকারের রোবট ভাবছি। আমি রোবট ওইপাশের মানুষটির আবেগকে আমার আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি। বুঝলেই সেই আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্সই তৈরি করবে আমার কৃত্রিম আবেগ এবং আমি তা বিনিময় করব তার সঙ্গে। জিতিয়ে দেব তাকে। কিন্তু সেই মানুষটি দু'মিনিটের মধ্যে তার চ্যালেঞ্জ ভুলে আমাকে বিশ্রাম নিতে বলে। রাগ হয় আমার। কৃত্রিম রাগ। বলি, ''আমি আপনার কে যে আমার বিশ্রামের খেয়াল আপনি রাখছেন? কল করুন।''

সন্দীপ ভিডিও কল করতে পারে ভেবে এক মিনিটের মধ্যেই নাইট গাউন চেঞ্জ করে একটা কালো রঙের র‍্যাপার রাউন্ড লং স্কার্ট লাল রঙের হাতকাটা টপের সঙ্গে পরে ডাইনিং টেবিলে বসি। এই টপে দেখেই সন্দীপ আমায় একদিন বলেছিল, ''বাহ্, তোমাকে তো লাল রঙ বেশ মানিয়েছে। আমি তোমাকে এমনই একটা ড্রেসে আশা করেছিলাম। পার্কিং-এ গাড়ির সামনে একটা লাল টপ পরে দাঁড়ানো যে ডিসপ্লে পিকচারটা আপলোড করেছিলে সেটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। তাই মনে

হয়েছিল তোমাকে আজ লাল রঙেরই টপ পরতে বলব।"

সন্দীপের পোশাক নিয়ে আমার কখনও কোন মন্তব্য থাকে না। মন্তব্য করার সুযোগও আমি পাই না। সে রোজই হাতকাটা গেঞ্জি পরে থাকে। নিচে খুব সম্ভবত বারমুডা। সাদা রঙের। কলকাতার পাগল করা গরমে যে খালি গায়ে থাকে না এটাই অনেক। তাই আমি ধন্য।

সন্দীপ ভয়েস কল করে। কল রিসিভ করে আমি মোবাইলটা কানের কাছে ধরি। সে বলে, ''হ্যালো।"

''বলুন।"

''তুমি বলো..." মিষ্টি টান দিয়ে বলে সে।

কোন উত্তর নেই আমার।

''কি হল? ব-লো," অনেক টানা ঢেউ খেলানো গলা এবার। মনে হল অনেক স্নেহ মেশানো।

খুব আস্তে বলি, ''কি বলব?"

''কিছু তো বলো," আবার সেই টান। তবু আমি কিছু বলি না।

''ভাবলাম মনের মতো একজনকে পেলাম। কিন্তু সে তো কোন কথাই বলছে না।"

''আপনি বলুন।"

''তুমি কি এখনও রেগে আছ আমার ওপর।"

''না না।"

''তাহলে এত চুপচাপ যে?"

''কথা খুঁজে পাচ্ছি না।"

''আচ্ছা, তুমি ডিসপ্লের ছবিতে যে ড্রেসটা পরেছ তাকে কি বলে?"

''অফ-শোল্ডার ম্যাক্সি ড্রেস।"

''এখন কি পরে আছ?"

''লাল রঙের টপ। আপনি আগে দেখেছেন।"

''তোমার এই লাল টপ এবং ওই ড্রেসটার গলার ডিজাইনের মধ্যে কোন পার্থক্য তুমি দেখতে পাও না?"

''পাই।"

''কি সেটা?"

''অফ-শোল্ডারের গলাটা একটু বড়।"

''ঠিক তাই। ম্যাক্সির গলাটা একটু নিচে নেমে এসেছে। ধরো তোমার কোন ড্রেসের গলা আরেকটু বড় হল...আরেকটু...আরেকটু...গলা বড় হতে হতে একেবারে তোমার নিপ্‌ল-এর নিচে নেমে এল...," তিন থেকে চার সেকেন্ডের নীরবতা। নীবরতা কথাটিকে বারবার আমার কানে প্রতিধ্বনিত হওয়ার জন্য সময় দেয়। বারবার প্রতিধ্বনিত হওয়া কথা আমাকে আসলে সন্দীপের একবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে থামিয়ে দিল নাকি ওর সঙ্গে আমার দু'হাজার কিলোমিটারের দূরত্বটাকে আরও বাড়িয়ে দু'গুণ করে দিল তা অনুভব করতে বলে। কিন্তু আমি কিছুই অনুভব করতে পারি না।

আমার স্নায়ুতন্ত্র ঠিকমত কাজই করছে না। অ্যাড্রিনালের ক্ষরণও বোধ হয় যথেষ্ট হচ্ছে না। তিন চার সেকেন্ড বাদে সন্দীপ বলে, ''কি এসে যায় তাতে?''

কি এসে যায় তাতে? তাই তো! কি এসে যায়! কিচ্ছু এসে যায় না। না না এসে যায়। অবশ্যই এসে যায়। ইশ্, কি বলছ সন্দীপ! আমাকে যে গুঁড়িয়ে দিলে একেবারে। এসব কথা বলে তোমার সঙ্গে আমার কি ধরনের দূরত্ব কমাতে চাইছ? আমরা তো এখনও পর্যন্ত...

সন্দীপ বলে, ''কিছুই এসে যায় না। এটা লোকের পারসেপশন...যে যেভাবে ব্যাখ্যা করবে। ছেলেদের খালি গায়ে থাকাতে, ঘুরে বেড়ানোতে কোন দোষ নেই কিন্তু একই জিনিস মেয়েদের ক্ষেত্রে আইনত অপরাধ বলে মানা হয় এবং এটা নিয়ে কথাও উঠেছে...''

হ্যাঁ, আমি অনেক বছর আগেই শুনেছি। কিন্তু এটা হতে পারে না। হতেই পারে না। সমানাধিকার দাবির রাস্তায় চলতে চলতে এটা নিয়েও যদি আমরা লড়াই শুরু করি...না না...তাহলে তো সৃষ্টিকর্তার কাছেও অভিযোগ রাখতে হবে...আন্দোলন শুরু করতে হবে...

''তুমি হয়ত জানো না কিন্তু আমি একজন পুরুষ, তাই পুরুষদের ধর্ম আমার জানা আছে। একজন পুরুষ রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে যখন কোন মহিলাকে দেখে তখন সবার প্রথমে তার চোখ যায় মহিলাটির ব্রেস্ট-এর উপর। তোমার শুনতে কটু লাগলেও এটাই সত্যি। কিন্তু ব্রেস্ট-এ চোখ গেলেই যে সব পুরুষ একইভাবে খারাপ ভাবতে শুরু করে তা নয়। এখানেও সেই একই কথা আসছে—পারসেপশন। কাজেই তোমাকে ফ্রক পরে দেখতে চাইলেই যে তোমাকে নিয়ে আমি খারাপ কিছু ভাবতে শুরু করব তা নাও হতে পারে।''

আমি উত্তর দেওয়ার কিছু খুঁজেই পাই না। সন্দীপ কিভাবে যে আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। আমার শুধু মনে হচ্ছে সে আমাকে সম্মোহিত করে রেখেছে। আমাকে যা শুনতে বলছে আমি তা-ই শুনছি, আমাকে যা বুঝতে বলছে আমি তাই-ই বুঝছি, আমাকে যা করতে বলছে সে আমি তাই-ই করছি। কোনকিছু পছন্দ না হলে প্রতিবাদ করতে চেয়েও পারছি না। ভাবছি, কথা তৈরি হচ্ছে পেটে কিন্তু মুখ খুলছে না। বাইরে বেরোতে পারছে না কথা। ভাগ্যক্রমে আজ আমি সন্দীপের থেকে অনেক দূরে বসে আছি। তা না হলে এখন কোথায় যে ডুবে যেতাম কে জানে!

''তুমি তো সেক্স-এর কথা শুনতে পছন্দ করো না।''

''না, একদমই পছন্দ করি না।''

''কিন্তু আজ আমি সেক্স নিয়েই তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই।''

''না প্লীজ...,'' আমার সচেতনতা ধীরে ধীরে ফিরে আসছে মনে হয়।

''না, তোমাকে শুনতেই হবে।''

আমি আবার সম্মোহিত হতে থাকি। ফোনে কান পেতে অপেক্ষা করি সে কি বলে তা শোনার জন্য।

''আমি যখন ক্লাস টেনে পড়ি তখন একটা খুব সুন্দরী মেয়েকে ভালবেসেছিলাম...যদিও সে তা জানত না...তার বাবা ডাক্তার ছিলেন...বাবার নার্সিং হোমে একদিন একটা প্রোগ্রাম ছিল...সেখানে মেয়েটিকে এবং মেয়েটির দিদিকে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসার দায়িত্ব আমার ওপর পড়েছিল...ফেরার সময় গাড়ি না পাওয়ায় আমি একটা সাইকেল রিকশা ভাড়া করি...রিকশাতে ক'জনের সীট থাকে তুমি জানো?''

কিছু বলি না। যেন আমি গ্রাম বা শহরতলীতে বড় হইনি। তাই কিছুই জানি না সেখানকার। যেন সাইকেল রিকশার নামও প্রথমবার শুনলাম। আসলে আমি যে সম্মোহিত সে খবর সন্দীপের কাছে নেই।

সে বলে, ''দু'জনের সীট থাকে। সুতরাং মেয়েটিকে আমার এবং ওর দিদির কোলে অর্ধেক অর্ধেক করে বসতে হয়েছিল...।''

আমি অনিন্দিতাকে সন্দীপের সেই গল্পই বলছিলাম। ''জানিস সন্দীপের তখন অল্প বয়স। ওর ইরেকশন হতে পারত, কিন্তু হয়নি?''

''মালটা ইরেকশন হয়নি বলল আর তুই বিশ্বাস করলি?''

''হ্যাঁ, বিশ্বাস করেছি। কারণ সে আমাকে খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেছে...''

''কি বুঝিয়ে বলেছে?''

''ওর তখন মনে হয়েছিল ও মেয়েটির বাবার দায়িত্ব পালন করছে।''

অনিন্দিতা হাসে, ''অবশ্য ইরেকশন হয়ে থাকলেও কোন অসুবিধে ছিল না। স্টোরি অনেকদিনের পুরনো হয়ে গেছে।'' সে জিজ্ঞেস করে, ''আর কি গল্প শুনিয়েছে মাল?''

''দিল্লির আই আই টিতে থাকার সময় সন্দীপ একটি মেয়েকে টিউশন পড়াতে যেত। তাকেও ভালো লেগেছিল ওর। কিন্তু সে নিজেকে এই বলে বুঝিয়েছে যে সে তার শিক্ষক, তাই এটা হতেই পারে না।''

''মেয়েটার সঙ্গে মালটার এখনও দেখা হয়?''

''হ্যাঁ। দিল্লিতে গেলে তার বাড়িতে যায়, চা খেয়ে আসে। কিন্তু তেমন কোন অনুভূতি নেই।''

''মালটাকে পুনে থেকে একবার ঘুরে যেতে বল।''

আমি সন্দীপকে পুনেতে আসতে বলেছিলাম। সন্দীপ জানতে চেয়েছে ও এলে আমি কিভাবে ওর যত্ন করব। আমি বলেছি, ''আপনি আমার ঘরে এলে মাছ-মাংস-ডিম-দুধ-দই-পনির-শাকসবজিতে ভরা ফ্রিজ দেখবেন।''

''কি হবে সেসব দিয়ে?''

''বা রে! আমি নিজে রান্না করে খাওয়াব।''

''অ্যান্ড?''

''আর...আপনার জামাকাপড় নিজে হাতে ধুয়ে দেব।''

''আর কি করবে?''

''আর..আমার গাড়িতে করে আপনাকে শহর দেখাবো।''

''অ্যান্ড?''

''অ্যান্ড...এখানে অনেক বড় বড় শপিং মল আছে। ফুড কোর্ট আছে। অনেক সুন্দর সুন্দর রেস্টরেন্ট আছে। সেসব জায়গাতে গিয়ে শপিং করব। লাঞ্চ, ডিনার করব।''

''আর কি করবে?''

''আর...অনেক গল্প করব।''

''অ্যান্ড?''

''অ্যান্ড? অ্যান্ড...অ্যান্ড আমার ঘরের ছয় বাই সাত বিছানাটা ছেড়ে দেব আপনাকে।''

''অ্যান্ড?''

''অ্যান্ড...অ্যান্ড কি বলি বলুন তো?''

''ব্যস! আর কিছু থাকবে না আমার জন্য?''

''থাকবে!''

''কি?''

আমি রেগে গেলে সন্দীপ নিজে শান্ত থেকে আমাকে শান্ত করে। বোঝায় আমার রেগে যাওয়া একদমই অমূলক কিন্তু আমার মেজাজ ঠাণ্ডা হলে আবার ধীর গতিতে এগোয় আমাকে উত্তেজিত করার জন্য। যে কোন কথার মাঝখানে আদর-ভালবাসা, শারীরিক সম্পর্কের ইঙ্গিত সে দেবেই দেবে।

''অ্যান্ড...অ্যান্ড দেয়ার উইল বি আ লট অফ অ্যান্ড স্টাফস।''

''সেগুলো কি? বলো আমাকে।''

''না, সেগুলো বলা যাবে না। আপনাকে অনুমান করে নিতে হবে।'' *আমাকে দেখে যদি আপনার পছন্দ না হয় তাহলে অ্যান্ড স্টাফগুলোর অসম্মান হবে যে সন্দীপ*!

''আমি যদি অনুমান করি...আমার কিছু অনুভূতি হবে...এবং তাতে তুমি রেগে যাবে।''

সন্দীপকে বলা অ্যান্ড স্টাফস-এর রূপ আমি বদলে দিতে চাই। আমি ওকে জিজ্ঞেস করি, ''আপনি কি আমার সঙ্গে আংগ্রিয়াতে সফর করতে পছন্দ করবেন?'' আংগ্রিয়া আমাকে খুব টানছে। ডিলাক্স রুম, বার, রেস্টরেন্ট, সুইমিং পুল, স্পা, রিডিং রুম, ডিস্কো হল এবং আরও অনেক কিছু আছে সেখানে। একবারের জার্নিতে সবকিছুর আনন্দ নেওয়া সম্ভবও হবে না। গত ডিসেম্বরে আমার ও রিলির আংগ্রিয়াতে সফরের পরিকল্পনা টিকিটের অভাবে হয়নি। এখন রিলি যেতে চাইছে না। ক'দিন বাদে সে সাংহাইতে যাবে সেই কসপ্লেয়ার বন্ধুর সঙ্গে। সাংহাইতে আমিও যাব। কিন্তু রিলি বারবার অফিস থেকে ছুটি পাবে না।

সন্দীপ জানতে চায়, ''আমার কাছে কি অন্য কোন বিকল্প আছে?''

সন্দীপকে আংগ্রিয়ার কথা বলেও আমি জড়তার চাদরে ঢেকে যাই। ভাবি ওকে

জোর করা ঠিক হবে না। দ্বিধা এবং ইচ্ছের যৌথ চাপে বোকা হয়ে যাই। ভুল বুঝে ওর পরের কয়েকটি কথার পাগলের মতো উত্তর দিই।

বলি, ''নিশ্চয়!''

—একদমই নয়।

—কেন যেতে চাইছেন না? আপনাকে কোন খরচা করতে হবে না। তাছাড়া আপনি ভালমতই জানেন যে আমার কাছে আপনি একদম নিরাপদ।

—আমি বলতে চাইছিলাম যে তুমি যদি সিদ্ধান্ত নাও তাহলে আমি না বলতেই পারব না। আমাকে যেতেই হবে।

—কিন্তু আপনি কেন ইন্টেরেস্টেড নন?

—না না, আমি তো তা বলিনি!

—তাহলে কি বললেন?

—আমি বলতে চেয়েছি, তুমি যখন কাউকে ভালবাস তখন তোমার নিজের পছন্দ বলে কিছু থাকে না।

—তবুও আমি বলব আপনি না বললে আমি মোটেও আহত হব না।

পাগল আমাকে অনেকক্ষণ সহ্য করে সন্দীপ লেখে, ''কিন্তু ওখানে গিয়ে যদি আমাদের ঝগড়া হয় তাহলে তো আমাকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হবে।''

''হা হা হা।''

''রূপা, তোমার সঙ্গে থাকতে আমার খুব ভালো লাগবে।''

''কেন?''

''আমি তোমাকে ভালবাসি!''

''কতটা?''

''সমুদ্রের অতলস্পর্শী গভীরতার সমান।''

''সমুদ্রের গভীরতা মাপা যায় এবং অ্যানগ্রিয়াতে গিয়ে আপনাকে তা মাপতে হবে।''

''তোমাকে অনেক ভালবাসি রূপা কিন্তু কতটা...আমি সত্যিই জানি না কি করে তাকে মাপা সম্ভব।''

''কোমরে একটা দড়ি বেঁধে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। সমুদ্রের গভীরতা মাপা হলে আমি আপনাকে জল থেকে টেনে তুলব।''

''হ্যাঁ, আমাদের ঝগড়ার পরে।''

''আপনি অফিসের জন্য দেরি হয়ে যাচ্ছেন।''

''আমি ভাবছি আজ অফিসে না গিয়ে তোমার সঙ্গে সময় কাটাবো।''

''সত্যি?''

''হ্যাঁ।''

''এভাবে ছুটি নষ্ট করবেন না প্লীজ।''

''না না, আমি ডিউটিতে থাকব...ছুটি নেওয়ার প্রয়োজন হবে না।''

''আমি আপনাকে দুপুর দুটোর পরেই সময় দিতে পারব সন্দীপ।''

''তাহলে আমি অফিসে গিয়ে তিনটে বা চারটের দিকে ফিরে আসছি।''

শৈবাল ঘোড়াই আমাকে মেসেজ করেই চলেছে। আমি ওকে ব্লক করিনি। অনিন্দিতাই ব্লক করতে দেয়নি। বলেছে, ''জানি ওই মালটা তোকে খুবই বিরক্ত করছে। আগে ওর প্ল্যানটা আরও ভালো করে জান। আমার তো ঘোড়াই-এর কথা শুনে খুব হাসি পাচ্ছে। শালা, ফিসিক্যাল শাটিসফ্যাকশনটা পেয়ে গেলে...। বুঝতে পারছি বিয়ে করলে ওর বউয়ের কি দুর্দশা হবে।''

''কি হবে প্ল্যান শুনে?''

''আরে শোন-ই না। অকাজের কথা তো অনেক শুনলি। কিছু কাজের কথাও শোন। ওর তৈরি প্ল্যানে আমিও এখানে কোচিং ক্লাস খুলে ফেলতে পারি।''

''তোর এত টাকা কোথায়?''

''আরে আমার স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল বুড়োটা আছে না! আমার পেছনে সারাক্ষণ ঘুরঘুর করছে। তাকে বলব খুলে দিতে।''

''শৈবাল ঘোড়াই তো ওর প্ল্যান আমাকে বলেছিল। তুই শুনেছিস।''

''আগে বলেছিলেন বলতিস। এখন বলেছিল বলছিস যে!''

''ওর মান অনেক নিচে নেমে গেছে তাই।''

''হা হা হা। আচ্ছা, ম্যান পাওয়ার আর ইনকাম স্ট্যাটেজিটা আরও ডিটেলস-এ জানতে চাই।''

ওর চাপে পড়ে আমি দু'তিনবার শৈবাল ঘোড়াইকে ফোন করেছিলাম। সে ব্যস্ত থাকায় আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেনি। তারপর সেদিন সন্দীপের সঙ্গে অ্যাংগ্রিয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে মেসেজ বিনিময় হওয়ার পরেই শৈবাল ঘোড়াই-এর ফোন পাই। সে তখন অফিসে যাওয়ার পথে। ''হেলো, এখন বলতে পারেন।''

''এতক্ষণে সময় হল?''

''আমি এমনি বসে থাকি না। আমার অনেক কাজ।'' গলায় অদ্ভুত ন্যাকা স্বর।

''এত ব্যস্ত হলে কোচিং সেন্টার কেমন করে চালাবেন?''

''সেটাই তো ভাবছি।''

''আপনার কোচিং সেন্টার নিয়ে আমার আরেকটু বিস্তারিত জানার ছিল।''

''আপনি রাইস মাইসের নাম শুনেছেন? পাথফাইন্ডার, আই বি? ওই ধরনের আর কি। সার্ভিশে (সার্ভিসে) আমার ডিউটির সময় হচ্ছে দশটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা, কলকাতার একটা প্রাইম জায়গাতে। এর বাইরের সময়টা আমি দেব। আর শনি রবিবারের পুরো দিন। আপনাকে অতি অবশ্যই শুক্রবারদিন সন্ধ্যা ছ'টা থেকে সোমবারদিন সকাল ন'টা পর্যন্ত যেখানে যেখানে আমি যাব—পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র—সেখানে সেখানে যেতে হবে। আমি অ্যাকাডেমিক ব্যাপারটা শুপারভিশন্ (সুপারভিশন) করব, আপনাকে ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটা ইয়ে করতে হবে।''

''এই সময়টাতে আপনি পড়াবেন তো?''

''হ্যাঁ, এফেকটিভলি ফিসিক্যালি (ফিজিক্যালি) প্রেসেন্ট (প্রেজেন্ট) থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের একশোটা ব্রাঞ্চ আমি কোভার (কভার) করব।''

''একশোটা ব্রাঞ্চ আপনি একা কি করে কভার করবেন? কি করে তা সম্ভব?''

কি করে হবে? ইয়ে আছে। টাটা বিড়লা, অমুক তমুক চেন ওয়াইস সব ব্যাপার আছে। এবার...''

''মানে বাকি দিনগুলোতে বেশি পড়ানো হবে না। শুধু শনি রবিবারে...''

''না না। সারা সপ্তাহ ওই কলকাতা বেস জায়গাটা—সেটা ওই ছ'টা দশটা। সকাল ছ'টা থেকে দশটা। আবার সন্ধ্যাবেলা ইভনিং-এও ছ'টা থেকে দশটা।''

''সেখানেও আপনি পড়াবেন?''

''হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট। আমার ব্যাজ হচ্ছে দু'ঘণ্টার।''

ব্যাজ শুনে ভাবছিলাম শব্দটা খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কিন্তু ওটা কি আসলে ব্যাজ? ইংরেজিতে ব্যাজ বলে কোন শব্দ আছে? আমার ব্যাজ হচ্ছে দু'ঘণ্টার, মানে স্টুডেন্টসদের পড়ানোর সঙ্গে ব্যাজ কথাটা যুক্ত! নাহ্, খাপে ঠিক বসছে না। তাহলে কি সেটা? কি সেটা? তারপর মনে পড়ল, হ্যাঁ হ্যাঁ, শব্দটা আসলে ব্যাচ।

''আপনি একাই পড়াবেন? আর কোন সাবজেক্টের স্পেশালাইজড টিচার থাকবে না?''

''ফিফটি টিশার থাকবে। টুয়েন্টি ফাইভ ডিরেক্ট হচ্ছে টিচিং ফ্যাকাল্টি—মানে সোফোল (সফল) টিচিং ফ্যাকাল্টি—মানে রিনাউন্ড। আর টুয়েন্টি ফাইভ হল শাপোর্টিং (সাপোর্টিং)—শাপোর্টিং স্টাফ—তারাও চিটিং ফ্যাকাল্টি কিন্তু তাদের নামটা প্রিন্টেড হবে না। ওরা যে কোন ইনশটিটিউটে (ইনসটিটিউটে) যেরকমই পড়াক, যাই হোক না কেন শাকশেসের (সাক্সেসের) ব্যাপারে আমাকে দরকার। আমি একাই একশো। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে..সেখানে ব্যাপার আছে। আমার এক একটা শেন্টারে শুরুর টার্গেট হল ওয়ান লাখ। প্রতি মাসে টার্গেট ওয়ান লাখ করে বাড়বে। প্রথম মাসে ধরুন এক লাখ, দ্বিতীয় মাসে দু'লাখ। এইভাবে বারো মাসে বারো হওয়ার কথা। সেখানে দু'মাস ছাড় দেব। তাহলে দশ লাখ হবে।''

''এক একটা সেন্টার থেকে দশ লাখ?''

''হ্যাঁ, কালেকশন টার্গেট। কলেকশন টার্গেট নট হচ্ছে লাভ। এইবার—এইবার হছে আমার আপনার হিসেব—আপনাকে তো আমি বললাম আপনি হবেন অফিসের ইনচার্জ বা ওইরকম ম্যানেজমেন্টের ইনচার্জ, আমি হচ্ছি অ্যাকাডেমিক ইনচার্জ, আরেকজন দরকার হবে—শেন্টার ইনচার্জ। শেন্টার ইনচার্জ আমার মা বাবা এরকম কেউ হবে। মোট তিনজন চার পার্শেন্ট (পার্সেন্ট) করে চার তিনে বারো পার্শেন্ট পাবে। এইবার—চার পার্শেন্ট মানে? একশো টাকা আসলেই চার টাকা আমার! তার মানে একলাখ আসলে আপনি এবং আমি চার হাজার টাকা করে পাব। এই আয় হবে একটা শেন্টার থেকে। একশো খানা শেন্টার থেকে মিনিমাম কত আয় হবে তাহলে? চার লাখ।''

''একশোখানা সেন্টারের মধ্যে আপনার কলকাতার সেন্টারগুলোও থাকছে তো?''

''হ্যাঁ, অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল।''

''কলকাতায় কতগুলো থাকবে?''

''অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গলে বললাম তো একশোখানা। তাহলে এবার বুঝে নিন কলকাতায় কিরকম থাকতে পারে। গোটা কুড়ি। এইবার টিশিং ফ্যাকাল্টি যারা—টিশিং বা শাপোটিং—তাদের হিসেবটা এরকম—ফিমেল একজন কাজ করবে—মাশ্‌ট (মাস্ট) বি পোস্ট গ্রাজুয়েট—সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা—এর হচ্ছে টু পার্শেন্ট।''

'সে কি কাজ করবে?''

''ফিসিক্যালি যা করার দরকার। রিশেপশনেরও (রিসেপশনেরও) কাজ করতে পারে আবার পড়াতেও পারে, লোকের সঙ্গে কথাও বলতে পারে—যা কিছু দরকার মানে অ্যাকাডেমিক বাদ দিয়ে বাকি সবকিছু। শুরুতে প্রতিটি জায়গায় যেতে হবে সবকিছু ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা দেখার জন্য। পরে একটা জায়গা থেকে ফোনে ফোনে কন্ট্রোল করা যেতে পারে। আপনার যদি কলকাতায় রেশিডেন্স (রেসিডেন্স) থাকে ভালো, না হলে আমি প্রভাইড করে দেব। কিন্তু আপনাকে শুক্রবার সন্ধ্যা ছ'টা থেকে সোমবার সকাল ন'টা পর্যন্ত আমার পি এ হয়ে আমার সঙ্গে একদম সেঁটে থাকতে হবে। বড় বড় অর্গানাইজেশনে যেরকম পি এ হয়—পি এ টু প্রিনশিপ্যাল (প্রিন্সিপ্যাল), পি এ টু শি এম (সি এম), পি এ টু...তারা যেরকম কাজ করে আপনিও ওইরকম ইয়ে করবেন। আপনি দেখবেন...''

''আপনার মোট বারো আর দুই মিলিয়ে চৌদ্দ পার্সেন্ট হল। বাকি পার্সেন্টের হিসেবটা কিরকম?''

''একটা ছেলে—মাশ্‌ট বি গ্রাজুয়েট—সে সন্ধ্যা ছ'টা থেকে সকাল ছ'টা পর্যন্ত থাকবে। তার হচ্ছে ওয়ান পার্শেন্ট। তাহলে মোট পনেরো পার্শেন্ট হয়ে গেল। ফ্যাইভ পার্শেন্ট দেব হচ্ছে ইয়ের জন্য। ফ্যাইভ কেন, ফ্যাইভ টু টেন পার্শেন্ট ব্যয় করব ভেনুর জন্য। পনেরো পার্শেন্ট ব্যয় করব স্টাডি ম্যাটেরিয়ালের জন্য, পাঁচ পার্শেন্ট ব্যয় করব অ্যাডভার্টাইশমেন্টের (অ্যাডভার্টাইজমেন্টের) জন্য। পাঁচ পার্শেন্ট অন্য কারণে। বাকি থ্যাকল পঞ্চাশ পার্শেন্ট। ওই পঞ্চাশ পার্শেন্ট থেকে পঁচিশজন টিশিং ফ্যাকাল্টি এবং পঁচিশজন শাপোটিং ফ্যাকাল্টির সবাইকে ওয়ান পার্শেন্ট দেওয়া হবে। এই হচ্ছে ব্যাপার। কিন্তু যেহেতু আমার সঙ্গে সবসময় থাকতে হবে, এগোতে হবে এইজন্য ভালো হয় লাইফ পার্টনার কাম বিশনেশ (বিজনেস) পার্টনার।

আর শুধু এডুকেশনই নয়। এডুকেশন রিলেটেড—যেমন ট্যুরিজমও আছে এর মধ্যে। প্রতি সপ্তাহে দার্জিলিং থেকে সুন্দরবন শিক্ষামূলক ট্যুর আছে, এ আছে, ও আছে, অমুক তমুক। সবগুলোকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে একজায়গায় দাঁড় করাতে হবে যেখান থেকে রোজগারটা আসে।''

অনিন্দিতার হাজব্যান্ড পাঁচ বছর চাকান প্লান্টে ছ'হাজার টাকা বেতনে চাকরি করার পর আহমেদনগর ফোর্জে দু'বছর চৌদ্দ হাজার টাকা মাইনেতে চাকরি করেন। তারপর বিলাসপুরে কে এইচ কে প্রেসিং অ্যান্ড ফোর্জিং-এ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা

মাইনেতে জয়েন হন। পাঁচ বছর বাদে কে এইচ কে প্রেসিং অ্যান্ড ফোর্জিং-এর অবস্থা খারাপ হলে সেখানে এক বছর অর্ধেক মাইনেতে কাজ করেন। হাজব্যান্ডের চাকরির অনিশ্চয়তা, অনিয়মিত উপার্জন, হাজব্যান্ডের সঙ্গে বনিবনার অভাব এবং ফোনে প্রতিদিন হাজব্যান্ডের সঙ্গে থাকতে হবে বলে মা-বাবার নীতিকথা, উপদেশ অনিন্দিতাকে হতাশার রোগী বানিয়ে ফেলছিল। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে ফেলতে কোনওভাবে নিজেকে সামলে নিয়েছে সে। বিলাসপুরে গিয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করেছে, বি এড করেছে। অতঃপর প্রাইভেট স্কুলে চাকরি নিয়েছে। প্রাইভেট স্কুলের মাইনে অতি সামান্য, তবু দিনের অনেকটা সময় মানসিক যন্ত্রণা ভুলে অন্য মেজাজে কেটে যায়। মেয়ে এখন বি ফার্মের স্টুডেন্ট। অবস্থা কিছুটা হাতের মুঠোয় এলেও নিঃসঙ্গতা পিছু ছাড়েনি অনিন্দিতার। মাঝে মাঝে ফোনেই কান্নাকাটি করে। বলি, জীবনের প্রতি এত নিরাশ হবার কিছু নেই। সোনালির অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। আমিই বা কি সুখে আছি! তবু আছি তো বেঁচে। আত্মহত্যার দুর্বুদ্ধি মাথায় আসে না। ভাবছি জীবন আমাদের যেসব বিবিধ অভিজ্ঞতা দিয়েছে এমন অভিজ্ঞতাই বা ক'জন পায়! অনিন্দিতা বোঝে না। একদিন সে কাঁদতে কাঁদতে বলে, ''ভগবান আমাকে নিয়ে শুধু খেলেছেন। খারাপ থেকে খারাপতর দিন দেখিয়েছেন। এজীবনে আর কিছু ভালো দেখার নেই। এখন যা হবে আরও খারাপ হবে। আরও দুর্বিষহ। আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। আমি মরতে চাই। কয়েকটা ঘুমের বড়ি নিয়ে এসে দে আমাকে।''

''ঘুমের বড়ি খেয়ে যদি শেষপর্যন্ত বেঁচে যাস তাহলে কি হবে?''

''সেটাই তো ভয়। তাহলে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে। লোকে আমাকে দেখে টিটকিরি দেবে। বলবে, ওই দেখ পাগলি মরতে গিয়েছিল। তাহলে একটা কাজ কর। শুনেছি পটাশিয়াম সায়ানাইড জিভে ঠেকালেই নাকি মৃত্যু অনিবার্য। কোথায় পাওয়া যেতে পারে ওটা বল।''

''আমার দোকানে।''

''এমন সিরিয়াস মোমেন্টে মজা করিস না রে। ভালো লাগে না,'' অধৈর্য হয়ে পড়ে সে। ''আমিও কিরকম বেহায়া দেখ! এর পরেও মা-বাবার সঙ্গে কথা বলি। ওদের বাড়ি যাই।''

জিজ্ঞেস করি, ''তোকে নিয়ে তোর ভাইয়ের কি বক্তব্য?''

''সে-ও মা বাবার দিকে।''

''ভাইয়ের বউ কি বলে?''

''কিছুটা বোঝে আমাকে। কিন্তু ও একা বুঝে কি করবে!''

আমি অনিন্দিতাকে শৈবাল ঘোড়াই-এর ম্যান পাওয়ার এবং ইনকাম স্ট্র্যাটেজির কথা বলি। সঙ্গে সঙ্গে ওর মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। বলে, ''লোকটি শব্দের খিচুড়ি পাকিয়ে কথা বলে দেখছি।''

''বুঝতে পারলি না?''

''কিছুটা বুঝেছি। দাঁড়া, আমি আমার স্কুলের বুড়োটাকে বলে দেখি।''

''লোকটি বলে অন্ততপক্ষে দশ লাখ টাকার ইনভেস্টমেন্টের প্রয়োজন আছে।''

''এত কেন?''

''পাথফাইন্ডার বা আই বির মতো গ্রুপের ফ্র্যানচাইজি নিতে হলে হয় হাজার স্কয়ার ফুট জায়গা থাকতে হবে না হলে দশ লাখ টাকার ব্যালান্স।''

''তাহলে হবে না। বুড়ো দশ লাখ ইনভেস্ট করবে না।''

''এরা সব হায়ার লেভেলের। তুই তো খুলবি মাধ্যমিকের জন্য। ঘোড়াই-এর ইচ্ছে ওঁদের প্লাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে নিজের নামের কোচিং সেন্টারকে দাঁড় করানোর—তখন তার নামে ফ্র্যানচাইজি চলবে...। নেট, সেট-এর সিলেবাস নাকি ওর কাছে জলভাত।''

''লোকটার অনেক জ্ঞানও আছে তার মানে।''

''কি জানি! বলে কামাল হোসেন হলেন ডাবল এম এ। আমি ছ'খানা সাত খানা সাবজেক্টে এম এ করে কি আঙ্গুল চুষব?''

''হা হা হা।''

শৈবাল ঘোড়াই-এর প্রসঙ্গ কেটে অনিন্দিতাকে আমি সন্দীপকে বলা সেই অ্যান্ড স্টাফের ব্যাপারটা শোনাই। সে মজা করে, ''ওর কন্টাক্ট নম্বরটা আমাকে দিস। তোরা যখন অ্যানগ্রিয়াতে যাওয়ার প্ল্যান করবি তখন আমি ওকে অ্যান স্টাফের লিস্টটা দিয়ে দেব।''

কিন্তু সন্দীপ অনিন্দিতাকে তার নম্বর দিতে চায় না। বলে, ''আমি তোমার কাছ থেকে ফোনে এখনই শুনে নেব।''

''আপনি মনে হচ্ছে আমার নিজের নাম ভুলিয়ে দেবেন।''

''রূপা তুমি একজন খুব সুন্দর মহিলা। তুমি আমাকে পাগল করছ।''

আমি দেখছি সন্দীপ আমার লেখার কথাটা ভুলেই গেছে। সেই একদিন শুধু প্রশংসিত লেখিকা বলেই ছেড়ে দিয়েছে। বই পড়ার ইচ্ছেও মোটেও রাখছে না। একদিন ফেসবুক খুঁজে আমার অফিশিয়াল নাম বের করার পর সেটা আর মনে রাখারও প্রয়োজন আছে বলে মনে করছে না। এটা নিয়ে রিলি একদিন মন্তব্য করেছিল, ''তোমার লেখাকেই যদি সে ভালো না বাসে তাহলে তোমাকে আর কি ভালবাসবে!'' কথাটা আমি সন্দীপকে বলেছিলাম। সে মোটেও গায়ে নেয়নি। গায়ে না নিয়ে যা করার তার সে করে চলেছে। আমি ওকে বলি, ''মানুষ তার নামের পরিচয় নিয়েই বেঁচে থাকতে চায় তাই নয় কি?''

''আমি কি তাহলে তোমাকে বনি বলে ডাকব?''

''কোন শর্টকাট নয়। পুরো নাম ধরে ডাকুন। মরে যাওয়ার পরে এছাড়া আমার আর তো কিছু বেঁচে থাকবে না।''

''হ্যাঁ, সবার কানেই নিজের নামটাই বড় মধুর শোনায়।''

সন্দীপ বুঝতে পারছে না আমি চাইছি সে আমার অফিশিয়াল নামটাও মনে রাখুক। অফিশিয়াল পরিচিতির সঙ্গে। ওর সঙ্গে পরিচয়ের পর আমার লেখা মাথায় উঠেছে। দিনের চব্বিশ ঘণ্টা ঘোরে কেটে যাচ্ছে। কবে এই ঘোর থেকে বেরোতে পারব জানি না। বড় টানছে সে আমাকে। টান খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ব কে জানে! পড়ে আহত হয়ে আধমরা অবস্থায় দিন কাটবে।

তখন কেউ-ই হয়ত আমাকে সুস্থ করতে আসবে না। সন্দীপও না। মন বলে আমার নিজেকে সামলানো দরকার। আমি তো একা বাঁচা শিখেই নিয়েছিলাম। একা মরার জন্য মানসিক প্রস্তুতিও নিয়ে ফেলেছিলাম। আবার এসবের মধ্যে জড়িয়ে যাওয়া মানে অনেকটা পিছিয়ে যাওয়া।

সন্দীপ আমার সুরে সুর মিলিয়ে দেয়। সেও মানে কাউকে সঙ্গে নিয়ে চলার অর্থ নিজের স্বাধীনতা খর্ব করা। তবু সে লেখে, ''আমি তোমাকে ছেড়ে বাঁচতে পারব না বনানী।'' আমাকে আমার আসল নাম ধরে ডেকে সে দাবি করে তার প্রতি আমার ভালবাসাও যেন আসল হয়, সত্যিকারের হয়, তার মধ্যে এতটুকুও খাদ যেন মিশে না থাকে, এতটুকুও অভিনয় যেন না থাকে, শুধু মুখে বা ভাবনাতে যেন না থাকে, যেন বাস্তবে নেমে আসে ভালবাসা। বলি, দু'রকমের ভালবাসা আছে—ফর্মাল এবং ইনফর্মাল। অফিশিয়াল নাম ধরে ডাকলে ফর্মাল লাভ পাওয়া যায় এবং আনঅফিশিয়াল নাম ধরে ডাকলে পাওয়া যায় ইনফর্মাল লাভ।

''তাই নাকি? আমি তো শুধু ট্রু এবং ভার্চুয়াল জানতাম। মানে সত্যি এবং মিথ্যে। ভার্চুয়াল অর্থাৎ মিথ্যে ভালবাসা মরীচিকার মতো পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। তাকে ধরা যায় না।''

খুব সুন্দর কথা বলো তো! ''সন্দীপ আপনি খুব সুন্দর।''

''তোমার মতো সুন্দর নই...তুমি খুব মিষ্টি...আই মিন ইট...তোমাকে আমি ভালবাসি বনানী।''

''আপনি আসলে নরম কথার বাড়ি মেরে মেরে আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছেন। টুকরো করে দিচ্ছেন আমার অস্তিত্বকে। চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে সব।''

''সেই ভাঙা টুকরোগুলোকে আমাকে হাত দিয়ে উঠিয়ে নিতে হবে। রাখতে হবে কাছে, বুকের কাছে, যত্ন করে।'' *এমন করে কেন কথা বলো সন্দীপ? ভগবানের কি সৃষ্টি তুমি?*

রিলি আমাকে খবর দেয় সাংহাই-এর টিকিট আমাদের হয়ে গেছে। ওর কসপ্লেয়ার বন্ধু কেটেছে টিকিট। ওকে আটচল্লিশ হাজার টাকা দিতে হবে। রিলি হামেশায় বড় কৃপণ। অন্তত আমার কাছে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার সঙ্গে ওর শুধু টাকারই সম্পর্ক। আমার শরীর খারাপ নিয়ে সে তেমন অস্থির হয় না যেমন আমার কাছ থেকে টাকা না পেলে হয়। মাত্র কয়েকমাস হল সে চাকরি করছে। জোর করে তাকে দিয়ে চাকরি করানো হচ্ছে। বই না কিনে, পড়াশোনা না করে কোনরকমে বি টেকের আটটা সেমিস্টার পাশ করেছে রিলি। পাশের পর এক বছর ঘরে বসা। গতানুগতিক ধারায় অফিসে গিয়ে পয়সা উপার্জনের কোন ইচ্ছে নেই। গতানুগতিক ধারার বাইরে গিয়ে কিভাবে উপার্জন করবে টাকা সেব্যাপারেও খোলাখুলি কিছু বলে না। ইনস্টাগ্র্যামে ফটো ঢেলে ঢেলে কয়েকটি নামকরা ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন করার অফার পেয়েছে যেমন ড্যানিয়েল ওয়েলিংটন-এর হাতঘড়ি, লিনো পেরসের শোল্ডার ব্যাগ, ফর এভার টুয়েন্টি ওয়ান-এর ড্রেস ইত্যাদি। বদলে শুধু জিনিসগুলোই ফ্রীতে

পেয়েছে। আর কিছু নয়। এছাড়াও কয়েকটি খাবার আইটেমেরও বিজ্ঞাপন করেছে। ফ্রীতে পেয়েছে খাবার। কিন্তু এভাবে তো তার প্রতিদিনের খরচা চলতে পারে না। ফ্যাশন চলতে পারে না। প্রতিদিনের খরচা এবং ফ্যাশনের জন্য সে আমার এবং রাজার কাছে হাত পাতে। আমাদের টাকা তার ব্যাংকের সেভিংস-এও যায়। টাকা না পেলে মেজাজ খারাপ। অশান্তি। কাউন্সেলরকে দিয়ে রিলিকে বোঝানো হয়েছে এটা ঠিক নয়। আমারও বয়স বাড়ছে। আমার ভবিষ্যতের আর্থিক নিরাপত্তা প্রয়োজন। তাছাড়া রাজার প্রাইভেট কম্পানিতে চাকরি, আজ আছে তো কাল নেই। প্রায়ই শুনি কম্পানি বন্ধ হয়ে যাবে। কম্পানি বন্ধ হলে বুড়ো বয়সে নতুন কোন চাকরি পাবে অথবা চাকরি পেলেও মাইনে যথেষ্ট হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তেমন হলে সে সারেন্ডার করে দেবে। ডিভোর্সের শর্ত শুধু কাগজেই দৃশ্যমান হবে, খালি পড়ে থাকবে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। যাই হোক, রিলি এখন অ্যাকসেঞ্চারে জব করছে। তবু বাবার কাছ থেকে মাসে দু'শো ডলারের ভাগ ছাড়েনি। রিলিকে ভাগ দিতে গিয়ে আমার ভাগ কমে গেছে। এত কিছুর পরেও তার অ্যাকাউন্টে পাঁচশ-হাজার টাকার বেশি ব্যালান্স থাকে না। সারাক্ষণ নেই নেই রব। তার নিজেরই একটু বড় কোন খরচার প্রসঙ্গ এলে আমার কাছ থেকে টাকা ধার করে। পরে দু'মাসের নামে ছয় মাসে শোধ করে সেই টাকা।

রিলি আমার এবং সন্দীপের মাঝখানে ঢুকে পড়ে, ''মাম্মা, তোমার গুগল পে থ্রু পাঠিয়ে দাও টাকা। এখনই। আমি আমার টিকিটের দামটা পরের মাসে তোমাকে দিয়ে দেব।"

সন্দীপকে মেসেজ করি, ''আপনার সঙ্গে একটু পরে কথা বলছি। একজনকে একটা জিনিস কিনতে দিয়েছিলাম। তার জন্য অবিলম্বে ৪৮কে পাঠাতে হবে।"

এক মিনিটের মধ্যেই সে নিজের মতো করে কে-র মানে বের করে, ''কি বললে? আটচল্লিশটা কিস পাঠাবে?" সবসময় আমার মধ্যে স্পর্শের শিহরণ জাগাতে সে তৎপর।

''আবার শুরু করলেন? আমি আপনার সঙ্গে অ্যাংগ্রিয়াতে ট্র্যাভেল করতে পারব মনে মনে হচ্ছে না।"

সন্দীপ এখন আবার একটা নতুন কায়দা শুরু করেছে। আমার বই থেকে অফিশিয়াল নামটি উঠিয়ে নিয়ে এসে তা কারণে অকারণে ভালবাসার খাঁচায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে। যদি বলি এখানে আমি রূপা নামটিকেই চাইছি, সে বলছে সে চাইছে না। যদি জিজ্ঞেস করছি কেন, সে বলছে বনানী নামটি নাকি ওকে গভীর অনুভূতি দিচ্ছে। বলছে রূপা সৌন্দর্যের এবং বনানী চিরসবুজের প্রতীক। সে চিরসবুজকে বেশি পছন্দ করছে। সে এটাও বলছে তার এই গভীর অনুভূতির জন্য তাকে দায়ী করা যায় না। কারণ নামের গভীরতার প্যাঁচে পড়েই হচ্ছে এসব। সন্দীপের খুনসুটিতে পাগল হয়ে যদি বলছি আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করুন, সে জিজ্ঞেস করছে আজ থেকে না কাল থেকে? যদি বলছি আজ থেকে, সে বাহানা খুঁজছে—তুমি বলেছ ধীরে ধীরে বন্ধ করতে। যদি বলছি তাহলে আধ ঘণ্টা, একঘণ্টা, দু'ঘণ্টা করে সময়ের ব্যবধান বাড়াতে হবে, সে বলছে—ঠিক আছে এই রোবটটিকে এইভাবেই প্রোগ্রামড করা

হচ্ছে। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে সহ্য করতে হবে। মাঝখানে সরি ফর দ্য ইনকনভিনিয়েন্স বলে সে জিজ্ঞেস করছে, ''অ্যান্ড স্টাফগুলো কি?''

''সেগুলো বুঝে নিতে হয় সন্দীপ।''

''ঠিক আছে। রোবটকে ইনসট্রাকশন দেওয়া হল।''

আমি বুঝি সন্দীপের আমার গল্প পড়তে অসুবিধে হয়। বাংলাতে লেখা বলে। সেই জন্যই সে রূপা এবং বনানীকে একই জায়গাতে নিয়ে এসে জড়ো করেছে। ওকে জিজ্ঞেস করি, ''আমার গল্প পড়ব। শুনবেন?''

সে লেখে, ''রোবট শোনার জন্য একদম রেডি আছে। কল করো।''

''ইউ আর রিয়ালি ইমপসিবল। সত্যিই আর বাঁচব না।''

''তাহলে আমি খুব খুশি হব। আমার ওপাশের রোবট মারা গিয়ে মানুষের জন্ম দেবে। করো না কল।''

সময় অপরাহ্ন, পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ। এখানে সন্ধে হতে এখনও ঢের দেরি। আমার তিনতলার বারান্দায় আমি সূর্যের টকটকে আলোতে আলোকিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। দেখছি চারপাশের গাছপালা, আকাশ, বাতাস, বাতাসে পাখির উড়ে যাওয়া। দেখছি আমাদের বিল্ডিং-এর সামনের বাগানটিতে টগর এবং মাধবীলতার গাছগুলো মনের উদারতায় ফুল ফুটিয়ে কিভাবে আমার মনকেও ফুলেরই মতো রঙিন করে দিতে চাইছে। সন্দীপ সেটা জেনে লেখে, ''আমি তোমার সুন্দর চেহারাটা দেখতে চাই।''

''খুব ক্লান্ত সন্দীপ।'' *তুমি সারাদিন আমাকে একটুও বিশ্রাম নিতে দাওনি তাই।*

''একবার প্লীজ। আমাকে বোনের বাড়িতে ডিনার-এ যেতে হবে। সন্দীপের ছোটবোন আগে মুম্বাই-তে ছিল। মাত্র কয়েকদিন আগে তার হাজব্যান্ড কলকাতায় ট্রান্সফার নিয়েছেন।

''কখন বেরোবেন?''

''শীঘ্রই। রাত এগারোটায় ফিরব।''

''আমাকে পনেরো মিনিট দিতে হবে।''

''ঠিক আছে।''

তাড়াহুড়ো করে একটা নতুন তুঁতে এবং ঘিয়ে রঙের লেহেঙ্গা পরে নিই। গলায় আমার সোনার নেকলেস, হাতে সোনার চুড়ি, কানে সোনার বড় বড় দুল, কপালে টিপ এবং ঠোঁটে লিপস্টিক। তৈরি হয়ে ওকে ভিডিও কল করতে বলি।

সন্দীপ জানে আমার ড্রেসের বিশাল সংগ্রহ। চাইলে বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের প্রত্যেক দিন অন্তত দশটি নতুন সাজে আমি ওর সামনে আসতে পারি। তাই সে রোজ আমাকে দশটি নতুন সাজেই দেখতে চায়। কোন পোশাকের পুনরাবৃত্তি পছন্দ করে না। অনিন্দিতা তা জেনে বলেছিল, ''মালটাকে বলিস ওর ফ্ল্যাটে তোর জন্য একটা বুটিক বানাতে।'' শুনে সন্দীপ বলেছে, হয়ে যাবে।

আমি আমার বেডরুমে আয়নার সামনে লেহেঙ্গা পরে বসে আছি। সন্দীপ বসে আছে ওর বেডরুমে, বিছানায়, ওর চিরাচরিত গেঞ্জি এবং শর্টস গায়ে গলিয়ে। আমি শুধু ফটোতে ওকে প্যান্ট শার্ট পরে দেখেছি। সে ফটোও বেশ কয়েক বছরের পুরনো। এখন প্যান্টশার্ট পরে সে দেখতে কেমন লাগে জানি না। জানার বিশেষ আগ্রহও

নেই। আমরা এখনও সামনাসামনি কেউ কাউকে দেখিনি। তবু সন্দীপ যেমনই হোক, আমার তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু আমাকে প্রত্যক্ষ দেখার পর তার সেই সমুদ্রের অতলস্পর্শী গভীরতার মতো ভালবাসা জলের উপরিতলে উঠে এসে ঢেউ-এ ভেসে অদৃশ্য হয়ে যে যাবে না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। সন্দীপ আয়নার সামনে বসা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার মধ্যে সে কি দেখছে তা আমি কিছুটা অনুমান করতে পারি। অনেকক্ষণ বসি। উঠে গেলে সে হয়ত অসন্তুষ্ট হবে। আমি ওকে ভালবাসি। হাজব্যান্ড হিসেবে পেতে চাই। এই বিশ্বাস নিয়ে বাঁচতে চাই যে বেঙ্গলি ম্যাট্রিমোনি আমার জীবনে সত্যিই এক চমৎকার নিয়ে এসেছে। তাই সবসময় ওকে অসন্তোষ দিই কি করে! তাহলে সাক্ষাতে হ্যাঁ অথবা না হওয়া তো দূরের কথা, সাক্ষাৎই হয়ত আমাদের হবে না।

পনেরো মিনিট পরে সন্দীপ আমাকে ওঠার অনুমতি দেয়। দিয়েই আমাকে মেসেজ করে, 'কিছু হবে না'র মানে তুমি জানো?

আমাকে দেখার সময় আমার দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি রেখে সে জিজ্ঞেস করেছিল, ''মনে করো তুমি এখন আমার ঘরে আমার সামনে বসে আছ। কি হবে তাহলে?'' লজ্জা ঢেকে বলেছিলাম, ''কিছু হবে না।'' তার উত্তরে সন্দীপের এই প্রশ্ন।

বললাম, ''কিছু হবে নার মানে খুব সহজ—নাথিং উইল হ্যাপেন।''

আমাকেও যেতে হবে একটা পার্টিতে। পার্টিতে যাব বলেই গতকাল আমার গাড়ির টায়ারটি মেরামত করা হয়েছে। সন্দীপকে বলেছি আমার ফিরতে দেরি হবে। তার ফেরার কথা ছিল রাত এগারোটায়। কিন্তু সাড়ে দশটাতেই সে তার শুভাগমনের কথা জানিয়ে দেয়। আমি কোন উত্তর না দিয়ে বোঝাই যে এখনও ফিরিনি। সুতরাং আজ আর কথা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

ভোর সাড়ে চারটেতে উঠে পড়ে সে। কলকাতার সকালবেলায় পুনের অর্ধস্তিমিত, অর্ধনিদ্রিত অন্ধকারকে গুড মর্নিং জানায়। তার দাবি আমাকে ভিডিও কল করতে হবে। কেন জিজ্ঞেস করায় বলে, ''দেখতে চাই তোমাকে দেখতে এখন কেমন লাগছে।''

''না।''

''করো না প্লীজ।''

''ঘুম পাচ্ছে।''

''আমাকে দেখিয়ে ঘুমোও।''

''আপনাকে আমার ভয় করে সন্দীপ।''

''ভয় পাওয়াই উচিত।''

''প্লীজ এখন না।''

''করো। তোমাকে দেখতে দাও,'' কড়া আদেশ।

''আমাকে এখন ঘরের কাজের লোকের মতো দেখতে লাগছে।''

''তাহলেও ঠিক আছে। কল করো। কি হল? আমি করি?''

''সন্দীপ, আপনি বড় অধিকার দেখিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেন। আমি আপনার কে বলুন তো? আমাকে সব পোশাকে যখন তখন দেখার কি প্রয়োজন আপনার?''

''করো কল।''

আমাকে কল করতে বলে পাঁচটা উনচল্লিশে সে নিজেই ভিডিও কল করে। অপেক্ষা আর সয় না। রিলি যথারীতি পাশে ঘুমিয়ে আছে। লাইট জ্বালিয়ে কিংবা আওয়াজ করে তাকে জাগানো যাবে না। অন্ধকারে ডিভান হাতড়ে একটা টপ বের করে র‍্যাপার রাউন্ডের উপরে পরে নিই। ড্রয়িং রুমে এসে বসি। সন্দীপের কল রিসিভ করে তবে আমার বোধ আসে টপের গলাটা ঢিলে এবং বড়। বারবার নিচে নেমে আসছে। বারবার আমাকে উঠিয়ে দিতে হচ্ছে গলা। চোখ নামিয়ে দেখতে পারছি না এই ভয়ে যে আমি দেখলে সন্দীপ দেখবে। এতক্ষণ কিছু না বুঝে থাকলে এখন বুঝবে। আবার না দেখে অনুমানও লাগাতে পারছি না টপ আমাকে কতটা উন্মুক্ত করল এবং সে আমার কতটা দেখল।

প্রায় এক ঘণ্টা হোয়াটসআপ ভিডিওতে দেখে আমার ঘুমের সত্যনাশ করে তবে সন্দীপের তখনকার মতো সাধ মেটে। বড় ক্লান্ত লাগছে। রাতের পর রাত ঘুম হচ্ছে না। বেডরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখি চোখের নিচে কালি পড়েছে। মুখের ত্বকের চমক কমে গেছে। হাত পায়ের খোলা অংশগুলো কেমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই ক'দিনে বয়সও প্রায় দু'বছর বেড়ে গেছে। সব হয়েছে সন্দীপের পাল্লায় পড়ে। আমার আজকের এই চেহারার জন্য সে-ই দায়ী। রাগ হল আমার ওর ওপর। বললাম, ''আপনি আমাকে ঘুমোতে দিলেন না। আপনাকে কল ড্রপ করার অনুমতি দেওয়া ঠিক হয়নি।''

''তাহলে কল করো।''

''না থাক।''

''ঘরের ছেলেটিকে ব্রেকফাস্ট বানানোর জন্য ইন্সট্রাকশন দেওয়ার দরকার ছিল। তাই কিছু সময়ের জন্য ফোন রাখতে বলেছিলাম।''

শুধু নিজের প্রয়োজন বুঝে চলছ। আমার একটুও খেয়াল রাখছ না।

সন্দীপকে নিয়ে আমি বিভ্রান্ত। সে এক একবার এক এক রকম কথা বলে। একবার আমার গায়ে ঘেন্না চড়িয়ে দিয়ে বলে শৈবাল ঘোড়াইকে বিয়ে করো, তার অনেক টাকা আছে, আমি চাইলে এক মুহূর্তে তোমাদের নিগোসিয়েশন ফাইনাল করে দিতে পারি। যদি প্রতিবাদ করি, নোংরা কথা বলবেন না তো, সে বলে তুমিই তো আমাকে বলেছ যে আই অ্যাম আ ব্যাড পার্সন...উইথ ফিলিংস। যদি মেনে নিই, সত্যিই ইউ হ্যাভ ব্যাড ফিলিংস সে বলে না, আই হ্যাভ গুড ফিলিংস। বলে এটাই সত্যি। বুঝতে পারি না সে ঠিক বলছে না ভুল বলছে। যদি বলি আমি একটা ভালো মানুষ চাই, তার একটু কম টাকা থাকলেও চলবে সে বলে, তাহলে আমি কি করি? সেই পাগল করে দেওয়া কথা শুনলেই আমার ওকে বলতে ইচ্ছে করে—সন্দীপ তোমার বাঁ হাতটা বিছানায় পেতে দিয়ে শুয়ে থাকো, আমিও শুয়ে থাকব তোমার পাশে, তোমার হাতে মাথা রেখে। তুমি তোমার ডান হাত আমার মাথায় রাখবে, চুলে বিলি কেটে দেবে। কিন্তু আমি তা বলি না কারণ কি করে জানব সে আমাকে এখন সেই নিরাপদ আশ্রয় দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে! বলি, জানি না আপনি কি

করবেন আর তা শুনে সন্দীপ বলে আমি কি তাহলে সমুদ্রে ঝাঁপ দেব? আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে তুমি মিস্টার শৈবালের উপর ঝাঁপ দিতে পারবে।

আমি এই মুহূর্তে যে নিরাপদ আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি সন্দীপের কাছে মনে মনে চেয়েছি তা সে মেসেজ করে নাকি একদিন দিতে চেয়েছিল। বলতে চেয়েছিল তুমি তোমার শারীরিক অসুস্থতার জন্য কলকাতায় আসতে চাইছ না কিন্তু তোমাকে এই ভরসা দিতে পারি যে এখানে এলে তোমাকে সুস্থ রাখার দায়িত্ব আমি নেব এবং তুমি আমার হাতে মাথা রেখে শুয়ে থাকলেও আমি নিজে থেকে তোমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করব না। শেষপর্যন্ত সেই মেসেজ আমার মোবাইলে ঢোকেনি। কারণ টাইপ করেই ডিলিট করে দিয়েছে সে মেসেজ। তারপর আমাকে ফোন করে সুসংবাদটি দিয়েছে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, ''ডিলিট করলেন কেন?'' মূর্তিমান জবাব দিয়েছে, ''ভাবলাম তুমি পছন্দ করবে না।''

অনেক কথাই বলে সে। অনেক কথাই বলছে। সন্দীপ আমার কলকাতায় যাওয়ার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়লেও এবার আমার মোটেও কলকাতায় যেতে ইচ্ছে করছে না। সেখানে একটি নতুন ফ্ল্যাট ভাড়াতে নিয়ে জিনিসপত্র পার করেই আমি পুনেতে এসেছি। নতুন ফ্ল্যাটে কোন বারান্দা নেই। মন খারাপ করলে যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরের লোক দেখব তার কোন উপায়ই নেই। এছাড়াও ফ্ল্যাটে আরেকটি সমস্যা আছে। জানালার কাচগুলো কালো। ঘরে লাইট জ্বালালে বাইরে থেকে ভেতরের সবকিছু স্পষ্ট দেখা যায়। এদিকে ফ্ল্যাট নিচতলাতে হওয়ায় বেশ অন্ধকার। দিনের বেলাতেও লাইট জ্বালাতে হয়। সুতরাং দিনরাতে ফ্ল্যাটে কোন প্রিভেসি থাকে না। সন্দীপ এসব শুনে বলেছে, আমার ফ্ল্যাটে এসে থাকবে। আমি রাজি হইনি। কয়েকদিন পরে আমি যখন ওকে বলেছি, দশ মিনিটের জন্য হলেও আপনার ফ্ল্যাটটি একবার দেখতে যাব তখন সে আবার উল্টে দ্বিধা দেখিয়েছে। বলেছে, ''আমার বাথরুমটা তোমার পছন্দ হবে না।''

''কেন?''

''দশ বছর এখানে আছি তো। একটু পুরনো হয়ে গেছে।''

''তাতে কি হয়েছে?''

''মুখে বললেও এত সহজ নয় রূপা।'' ক'দিন আগেই যে সন্দীপ আমাকে আমাদের হেঁটে চলাফেরা করার অভ্যেস থাকা উচিত বলে বক্তৃতা দিয়েছিল সে-ই এখন বলছে, ''তুমি এভাবে থাকতে অভ্যস্ত নও। তুমি পারবে না। তবে আমি তোমাকে প্রমিস করছি যদি তুমি বাথরুমটা পছন্দ না করো তাহলে ভেঙে নতুন করে বানিয়ে দেব।''

সেদিন মুহূর্তের জন্য এক অসম্ভব ভালো লাগার সমুদ্রে আমি ভেসে গিয়েছিলাম। মুখে এসে গিয়েছিল এক প্রশ্ন, ''কেন? আমি আপনার কে? কি ভাবনা আপনার আমাকে নিয়ে? ঘরে রাখার? রাখলে কি সম্পর্কে?'' কিন্তু সামলে নিয়েছি মুখ। এর আগে একদিন যখন সে আমায় বলেছিল দুপুরে একটা খুব সুন্দর স্বপ্ন দেখেছে, আমি জানতে চেয়েছিলাম কি স্বপ্ন। সে বলেছে আমি নাকি ওর ঘরে ঢুকছি এবং আমার হাতেই আছে ওর ঘরের চাবি। জিজ্ঞেস করেছিলাম, ''আপনি আপনার ঘরে

আমাকে কল্পনা করেছেন নিশ্চয়?" সে বলেছে, ''তা করেছি।" সবকিছুই ঠিক আছে এক সম্পর্ক ছাড়া। আমাদের মধ্যেকার বন্ধনের কোন নাম নেই।

মাস দু'য়েক আগে একটি লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তাঁরও ডিভোর্সের কেস ঘোঁট পাকিয়ে আছে। ম্যাট্রিমোনির সাইটে নেভার ম্যারেড, অ্যাওয়েটিং ডিভোর্স, ডাইভোর্সড, উইডোড ইত্যাদি ম্যারিট্যাল স্টেটাসের মধ্যে সন্দীপের মতো অ্যাওয়েটিং ডিভোর্স-এর দলে পড়েন উনি। এই সমস্ত লোকগুলো অনতিবিলম্ব-বিবাহের জন্য প্রস্তুত থাকেন না। তবু মেয়ে দেখার লোভও সামলাতে পারেন না। ভদ্রলোকের নাম নির্মল দাস। আমি অবশ্য ম্যাট্রিমোনির প্রিমিয়াম মেম্বারশিপে তাঁর নাম বিমল কান্ত দাস দেখেছি। জিজ্ঞেস করেছিলাম, নামটি আলাদা হল কেন? উনি বলেছিলেন, যদি ওঁর পরিচিতরা দেখে বুঝতে পারে তাহলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে তাই। নাম তো আমিও আলাদা দিয়েছি। তবে আমার কারণ আলাদা—দুরভিসন্ধিসম্পন্ন লোকজন আমার আসল নাম জানুক আমি চাই না। বেছেবুছে যাদেরকে জানানো যেতে পারে বলে মনে হবে তারাই শুধু জানবে আসল নাম। যাই হোক, ভদ্রলোক স্টীল অথরিটি অফ ইন্ডিয়াতে কাজ করতেন। আমার সঙ্গে পরিচয়ের দু'দিনের মধ্যে রিটায়ার করেছেন। মালদায় নিজের নামে বাড়ি। বাড়ি মানে দুই বেডরুমের ফ্ল্যাট। কলকাতার নাকতলাতেও একটি দুই বেডরুমের ফ্ল্যাট আছে। সেটি স্ত্রীর সঙ্গে যৌথ নামে। সেই ফ্ল্যাটটি স্ত্রী দখল করে আছেন। স্ত্রীর সঙ্গে ছেলেও আছে। ছেলে বিপিও-তে চাকরি করে। ভদ্রলোক আমাকে আশ্বস্ত করেছেন, ''আপনার চিন্তার কিছু নেই। মালদাতে আমার একটা আম বাগানও আছে। ওটার দাম দেড় কোটি টাকা। আমি আমার দ্বিতীয় স্ত্রীর জন্য কিছু ব্যবস্থা তো করে যাবই যাতে করে তাকে ভবিষ্যতে কারও কাছে হাত পাততে না হয়।"

ভদ্রলোকের বক্তব্য ওনার স্ত্রী অনেকদিন আগে থেকেই ওনাকে ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে টাকাপয়সা গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। নিজের নামে একটা বিউটি পার্লার উনি বানিয়ে নিয়েছেন স্বামীকে দিয়ে। পার্লারে ভদ্রলোকের নয় লাখ টাকার ইনভেস্টমেন্ট আছে কিন্তু উপার্জন থেকে এক পয়সাও উনি পান না। স্ত্রী দেন না। ডিভোর্সের কেসও অনেকদিন ধরে ঝুলে আছে। কথায় কথায় আমার আইনি জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে নির্মল দাস আমার সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। আমি তাতে খুব আগ্রহ দেখাইনি এই বলে যে তৃতীয় ব্যক্তি হওয়ায় আমার এখানে নাক গলানো ঠিক হবে না। তা শুনে উনি ভুলভাল ইংরেজিতে লিখেছিলেন, ''আপনার প্রোফাইল আমার সঙ্গে ম্যাচ করেছে। তাই আমি আপনাকে তৃতীয় ব্যক্তি নয় বরং দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবেই দেখছি।" লেখেন, ''আপনি আমার সঙ্গে আরও কথা বলুন। আমার বিশ্বাস আপনার মন্দ লাগবে না।" উনি মাঝে মাঝে আমার পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে আলোচনা করতে চান। আমি প্রায় প্রতিদিনই বিকেলে ঘরে আছি জেনে জিজ্ঞেস

করেন, ''আপনার বাইরে যেতে ভালো লাগে না?''

''প্রয়োজন হলে কেন লাগবে না?''

''না ধরুন, আপনাকে যদি বলি, চলো বিকেলবেলায় গাড়ি নিয়ে কোথাও থেকে ঘুরে আসি—তাহলে আপনি কি না বলবেন?''

অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎকে হাতের মুঠোয় নিয়ে ভদ্রলোকের এমন কাল্পনিক প্রস্তাব বিরক্তিকর লাগে। বলি, ''বর্তমানের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে এসব কথা ভাবার মতো অবস্থায় আমি নেই।''

''আপনি রান্না করতে ভালবাসেন?''

''তা তো বলতে পারব না!''

''কেন?''

''কখনও ভাবিনি এসব নিয়ে। একসময় প্রয়োজন ছিল গতানুগতিক প্রথায় রান্নাঘরে যাওয়ার। এখন আর সেই প্রয়োজন নেই। ব্যস, এটুকুই বলতে পারি।''

''এখন কি খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন?''

''কেন বন্ধ করব? আমরা মূলত ফলমূল খেয়ে থাকার অভ্যেস তৈরি করে নিয়েছি। অল্পস্বল্প যা রান্নার জন্য থাকে তা যখন ইচ্ছে হয় তখন করি। সময়ের বাধ্যবাধকতা নেই।''

''কিন্তু বিয়ে করলে তো এভাবে নাও চলতে পারে।''

''দেখুন, রান্নায় পারদর্শী লোকের অভাব নেই যাদের মাসে কয়েকশো টাকার বিনিময়ে পাওয়া যায়। আমার এসবের পেছনে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।''

''না...মানে...''

ভদ্রলোকের ভাবনাচিন্তার অতি ছোট বহর দেখে আমি হাঁপিয়ে পড়ছিলাম। এবার আর তাঁকে কথা শেষ করার অবসর দিই না। বলি, ''নিজেই সময়ের ক্রাইসিসে আছি। আমি এমন একজন লোক চাই যে আমার নিজের জন্য আরও কিছু সময় বের করে দিতে পারবে।''

''করাটা তো একপাক্ষিক হয় না। দু'জনকেই দু'জনের জন্য করতে হবে।''

ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটে আই ডি খুলেছি। তবু আমার সঙ্গে আরেকজনকে মিলিয়ে দু'জন শুনলেই ঘেন্নাতে গা রিরি করে উঠছে। আমার সঙ্গে যে জুড়তে চাইবে সেই লোকটি আমার একেবারে মনের মতো না হওয়া পর্যন্ত—রোমান্স দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, যত্ন দিয়ে, সততা দিয়ে আমাকে পাগল করে দিতে না পারা পর্যন্ত দু'জন কথাটা আমার একেবারেই সইছে না।

আমি বলি, ''দেখুন আমার কাউকে সেভাবে প্রয়োজন নেই। যদি কারও আমাকে প্রয়োজন থাকে কোনরকম প্রত্যাশা ছাড়াই সে আমার জন্য করবে। আমাকে নির্ভরশীল করে দেবে তার ওপর। স্বাভাবিকভাবেই তখন আমার নিজের প্রয়োজন থেকেই তাকে ভালো রাখা আমার এক অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াবে।''

ভদ্রলোক প্রায়ই ফোন করেন, প্রায়ই আমার কাছ থেকে হ্যাঁ বা না জানতে চান। ওঁর কাছ থেকে ছাড়া পেতে আমি ওঁকে লিখেছিলাম, ''দেখুন আমি একশো শতাংশ

বিশুদ্ধতা রাখতে চাই। সুতরাং এত তাড়তাড়ি হ্যাঁ বলাটা একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে।" তার দু'দিন পরে উনি আমাকে ফোন করেন। ফোন রিসিভ করতেই 'আপনি কে? আপনাকে আমি চিনি না' বলে রেখে দেন। খুব অপমানিত বোধ করলেও ছোট্ট ঠাণ্ডা উত্তর ছাড়ি, ''অদ্ভুত! আমি অবশ্য কিছু মনে করিনি।"

''আপনি মুখে একশো শতাংশ বিশুদ্ধতা চান বলেন কিন্তু কাজ একদম উল্টো করেন।"

''বাংলাতে লিখুন। আপনার ইংলিশ বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে। আর ফোন করে ওইরকম ব্যবহার করার কারণ কি?"

''আপনার সঙ্গে আমার আর কোন যোগাযোগ রাখার ইচ্ছে নেই।"

''তাহলে ফোন করার কোন প্রয়োজন ছিল না।"

''আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতে চেয়েছিলাম কিন্তু কথাবার্তা বলতে গিয়ে যখন পিওর ইমপিওরের প্রশ্ন এসে গেল তখন আমি নিজেকে সরিয়ে নিলাম।"

''আমার কাছে তো ভয়েস রেকর্ডিংগুলো আছে। ফোন করে বলেছিলেন যে বেঙ্গলি ম্যাট্রিমোনি থেকে আপনার নম্বরটা পেয়েছি, বন্ধুত্ব করতে চাই, তাই না?"

''শুরুতে একে অন্যের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশে তবেই এগোয়।"

''সেটা বিয়ের ইচ্ছেতেই। যাকগে, তারপর কি হল?"

''আপনার ওই হান্ড্রেড পার্সেন্ট পিওরিটির মানে কি হয়?"

''মানে খুব সহজ। আমি যেহেতু কাউকে ঠকাতে চাই না তাই অনেক ভাবার প্রয়োজন আছে। এমন হওয়া উচিত নয় যে হঠাৎ করে হ্যাঁ বলে দিলাম এবং কিছুদিন পর বুঝলাম ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

দিন দশেক আর কোন কথাবার্তা নেই। তারপর একদিন হোয়াটসআপে আমার ডিপির প্রশংসা করে বসলেন ভদ্রলোক, ''শাড়ির কোন বিকল্প নেই।"

আমি ওঁকে ফোন করে বুঝিয়েছিলাম আমাকে ওসব কথা বলা তাঁর শোভা দেয়নি। উনি নিজেই ডিভোর্সের কেসে ঝুলে আছেন। কবে সমস্যার সমাধান করে ফ্রী হতে পারবেন তার কোন ঠিক নেই। এত আগে থেকে ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটে এসে মেয়ে খোঁজার কোন মানে হয় না। কিসের আগ্রহে মেয়েরা অনিশ্চিত কালের জন্য তাঁর সঙ্গে আটকে থাকবে?

ভদ্রলোক মেনেও ঠিক মানেন না। বলেন, ''প্রেমের আগ্রহে।"

প্রেমের দুনিয়া বোধ হয় খুব কম মেয়েই সুতপার মতো নেড়েঘেঁটে দেখেছে। নেড়েঘেঁটে তার নাড়িভুঁড়ি দিয়ে সে এক প্রবাদ রচনা করেছে—

প্রেম না বাল,
খালি চোদার তাল।

সুতপা মোটেও মৃদুভাষী নয়। লোকের মন ঘেঁটে ঘেঁটে শরীরের সব অকারণ রোমান্স ঝরে গেছে। তার প্রথম হাজব্যান্ড অভিষেকের অভাব অনটনের সংসারে খাড়কির অ্যামিউনিশন ফ্যাক্টরিতে সরকারি চাকরি করা রজত চক্রবর্তীর যাতায়াত শুরু হয়েছিল। রজত অভিষেকেরই বন্ধু। অভিষেকের বাড়িতে রজতের যাতায়াতের

মাঝখানে তার সঙ্গে সুতপার প্রেম জমে উঠেছিল। প্রেমে পাগল হয়ে সুতপা অভিষেককে ডির্ভোস দিয়ে তার ধানোরিতে অনেক পরিশ্রম করে ব্যাংক থেকে একগাদা টাকা ধার নিয়ে কেনা এক বেডরুমের ফ্ল্যাট হেলায় অভিষেকের হাতে ছেড়ে দিয়ে ছেলে নিয়ে রজতের টিংরে নগরের ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠেছিল। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করেছিল সে রজতের সঙ্গে। এই বিয়েতে আমার একেবারে মত ছিল না। আমি বুঝেছিলাম রজত লোকটি ভালো নয়। আগেও ভালো লাগত না। বিয়ের কয়েকদিন আগে সে আমার কাছে একেবারে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। তখন সুতপা গিয়েছিল আসানসোলে। বাবার বাড়িতে। রজত কয়েকদিন থেকে অনবরত আমাকে মেসেজ করে, ফোন করে আমার বাড়িতে আসার বাহানা খুঁজছিল। জোর করে বেরও কলে নিয়েছিল বাহানা। রিলি স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে। ওকে ওয়ারিয়া কলেজে সায়েন্স নিয়ে ভর্তি করেছি। কলেজের কাছাকাছি একটা কোচিং সেন্টার খুঁজছিলাম যেখান থেকে সে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের উপযুক্ত গাইড পেতে পারে। পেয়েও গিয়েছিলাম প্রাইম একাডেমী। রজত বলে, ''প্রা-প্রা-প্রাইম ভালো না। আ-আ-আকাশ ক্লাসে দাও।'' একটু তোতলানো কথা। তোতলানোটা সাধারণত সেন্টেন্স-এর শুরুতেই হয়। বেশ স্পীডে কথা বলে এবং স্পীডের কারণেই তোতলানো।

''সেটা কোথায়?''

''ও-ওয়ানড়িতে।''

''অনেক দূরে তো।''

''এ-এ-এমন কিছু দূরে নয়। আমার জানাশোনা আছে। আ-আ-মি নিয়ে গিয়ে কথা বলিয়ে দেব। কম পয়সায় হয়ে যাবে।''

আমি যেতে চাই না আর রজত আমাকে নিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাও আবার রিলিকে ছেড়ে। ফেরার পথে সে নাকি বাইরে কোথাও আমার সঙ্গে বসে চাও খাবে।

''এখানে তো কলকাতার মতো চায়ের দোকান নেই।''

''ও-ও-ওই মানে কোন রেস্টরেন্টে গিয়ে বসব।''

''সুতপা এখন এখানে নেই। ওর কাছ থেকে পারমিশন নিন আগে।''

''ও-ও-কে জানাতে হবে না। আমি তো প্রয়োজন আছে বলেই তোমাকে নিয়ে যেতে চাইছি।''

''কিন্তু আমি ওইভাবে যেতে পারি না।''

সেই সন্ধেতে রিলি ঘরে ছিল না। বান্ধবীর বাড়ি গিয়েছিল। রজত আমাকে রাজি করানোর তুমুল ইচ্ছেতে তার জার্মানি নাকি রাশিয়ার কোন একটি মেয়ের গল্প পিতপিত করে চোখ অর্ধেক বন্ধ রেখে শোনালো। মেয়েটি নাকি রজতের প্রেমে পড়েছিল। বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। রজতের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি সেই প্রস্তাব। সে নাকি তাকে শুধু বন্ধু হিসেবেই দেখেছিল। আমি জানি ছেলেরা এরকম করে। কাউকে প্রেম নিবেদনের আগে, সেই প্রেম শুধু মেয়েটির শরীর ভোগ করার উদ্দেশ্যে হলেওবা এমন এমন গল্প করে নিজে যে খুব সহজলভ্য নয় বোঝাতে চায়। নিজের দাম বাড়ানোর জন্য, যাতে করে মেয়েটি সুযোগ হাতছাড়া করার বোকামি না করে।

রজতের চোখ ছোট, এতটাই ছোট যে হাই পাওয়ারের চশমার নিচেও বড় লাগে না। আমার তো চোখদুটো বন্ধই মনে হচ্ছিল। শুধু ঠোঁটদুটো নড়ছিল। ছাগল গাছের পাতা খেতে গিয়ে যেরকম নড়ায় সেরকম। সে সোফা ছেড়ে ডাইনিং টেবিলে আমার পাশের চেয়ারে এসে বসল।

''সা-সারাদিন ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগে তোমার?''

আমি কয়েকদিন ঘরেই বসে আছি। বছর খানেক আগে স্কুল ছেড়ে স্পাইসার কলেজে বি এড-এর জন্য ভর্তি হয়েছিলাম। পরীক্ষা হয়ে গেছে। রেজাল্টও হাতে এসেছে। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছি। এখন স্কুলে চাকরির জন্য আবার চেষ্টা করতে হবে।

বললাম, ''ঘরে অনেক কাজ থাকে।''

''আ-আমি বলতে চাইছি একা একা...।''

''মন্দ কি!''

''জী-জীবনটাকে উপভোগ করতে ইচ্ছে করে না?''

''হ্যাঁ করে।''

''তা-তাহলে করছ না যে!''

''কে বলছে করছি না?''

''কো-কোথায়? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না।''

''মানুষ বিশেষে জীবন উপভোগ করার ধরন আলাদা হয়। কাজের ফাঁকে আমি কিছু সময় একান্ত নিজের জন্য ম্যানেজ করার চেষ্টা করি এবং তা নিজের সঙ্গে উপভোগ করি।''

''হেঃ, নিজে নিজেই! তাই আবার হয় নাকি! তুমি কিন্তু ঘরে বসে থেকে মোটা হয়ে যাচ্ছ।''

রজতের কথা শুনে আমার খুব অস্বস্তি হল। ''ছাড়ুন না এসব কথা।''

''দে-দে-দেখছ পেটে তোমার কত মেদ জমা হয়েছে?''

''আমার মেদ নিয়ে আপনার এত মাথাব্যথার দরকার নেই তো! সে আমি বুঝব।'' বিরক্তি মেশানো জবাব দিই।

''তো-তো-তোমার ভালোর জন্যই বলছি। বাইরে ঘোরাঘুরি করো। প্রেম করো। মেদও কমবে আনন্দ মজাও হবে।''

''কার সঙ্গে ঘুরব?''

''ব-ব-বলছি তো আমার সঙ্গে চলো।''

রজত এর আগেও ওর সঙ্গে জীবন উপভোগ করার প্রস্তাবের আভাস আমাকে দিয়েছে। অম্বানগরীতে সরস্বতী পুজোর সময়। আমার এম এস সি করার ইচ্ছে জেনে দুপুরে খিচুড়ির থালা কোলে নিয়ে বলেছিল, ''লেখাপড়াতেই যদি এত সময় নষ্ট করবে তাহলে আনন্দ মজা কবে হবে?'' সুতপা শুনে বলেছিল, ''বুঝতে পারলে তো রূপা, রজত বলতে চাইছে পড়াশোনা না করে তুমি রজতের সঙ্গে ঘুরে বেড়াও।'' আমার মনে হয় সুতপা আগেই বুঝতে পেরেছিল রজতের চরিত্র খারাপ। তা স্বত্ত্বেও ওদের প্রেমের ফেভিকলের বন্ধন খুলল না।

আজ রজতের কথা অসহনীয় মনে হল। ''ব্যস, একবার বলেছেন। এনাফ।

দ্বিতীয়বার শুনতে পছন্দ করব না।"

আমার কাছে সুবিধে করতে না পেরে রেগে যায় সে। বলে, ''তোমার মেন্টাল ব্লকেজ আছে।"

''ওহ্! আপনার সঙ্গে ঘুরছি না বলে, প্রেম করছি না বলে মেন্টাল ব্লকেজ দেখলেন? এবার তার সাইজ দেখুন—বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে।"

অপমানিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে রজত। হাত-পা থরথর করে কাঁপে। রাগে কথা আরও তোতলিয়ে যায়। রেগেবেগে বেরিয়ে যায় সে। যাওয়ার আগে আমাকে শাসিয়ে বলে, ''কা-কা-কা-কা-কাজটা ভা-ভা-ভালো করলে না।"

লোকটিকে তাড়িয়ে দিয়ে আমার নিজেরই খারাপ লাগল। সুতপা তার বাগদত্তা। কবে জানি না কিন্তু বিয়ে তো তাদের হবে। রজতের জন্য আমার ঘরের দরজা বন্ধ থাকলে বিয়ের পরে সুতপা কি করে একা আসবে! রজত সুতপাকে আমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করানোর জন্য স্কুটারে করে আমাদের বিল্ডিংয়ের নিচে ড্রপ করে যাবে এবং দেখাসাক্ষাৎ হয়ে গেলে আবার নিচ থেকেই তাকে নিয়ে ফেরত যাবে! ইশ্, তেমন হলে সেটা একদমই ভালো দেখাবে না। রজতকে ফোন করে গলা যথাসম্ভব নিচুতে নামিয়ে বললাম, ''আসুন। ওইরকম কথা আর বলবেন না।"

রজত তখন গাড়িতে স্টার্ট দিচ্ছিল। গলা রীতিমত উঁচুতে, গাড়ির ঘড়ঘড় আওয়াজ ভেদ করে স্পষ্ট আমার কানে এল তার চিৎকার, ''হেল্পফোর্থ নেভার ট্রাই টু কন্টাক্ট মী।"

সুতপাকে তখনই ফোন করলাম, ''একটা খুব বাজে ব্যাপার হয়ে গেছে।"

''কি?"

ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিলাম। দু'দিনের মধ্যেই সুতপা আসানসোল থেকে ফিরে আমার ঘরে হাজির হল। ওকে বললাম, ''ক্যান্সেল করে দে বিয়ে।"

''এখন আমার আর কোন উপায় নেই রে রূপা। অভিষেকের সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে। ওর ঘর আমি ছেড়ে দিয়েছি। কয়েকমাস ধরে পার্থর ঘরে থাকছি। ওর এমনিতেই মোনার সঙ্গে ডিভোর্সের পর থেকে মনটন ভালো যাচ্ছে না। ও আমাকে এবং আমার মেয়েকে আর রাখবে না। আমার যাওয়ার আর কোন জায়গা নেই।" পার্থ হল সুতপার পিসতুতো ভাই।

''তোকে ঘর ছাড়ার কথা বলে দিয়েছে সে?"

''না, মুখে কিছু বলেনি। কিন্তু হাবভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া পার্থরও দ্বিতীয় বিয়ের দিনও ফাইনাল হব হব করছে। আমি কতদিন আর ওর ঘাড়ে বসে থাকতে পারব!"

''তুই তো বলেছিলি তোর ডিভোর্সের পরে রজতের মতিগতি তুই বুঝতে পারছিস না।"

''তা ঠিক। তাই তো পার্থ একদিন ওকে শাসিয়েছে—এই শালা একে অভিষেকের কাছ থেকে আলাদা করিয়ে এখন মজা মারছিস! কবে বিয়ে করবি বল।"

''এখন সে বিয়েতে রাজি?"

''কি জানি বাবা। কিছু বুঝতে পারছি না।"

''কিন্তু তুই এই লোকটিকে নিয়েই বা সুখী হবি কি করে?''

''হতেই হবে।''

''আগে বুঝতে পারিসনি?''

''পেরেছিলাম। আরে ছাড় না। মহিলাদের সঙ্গে ফ্লার্ট করে করে যখন একঘেয়েমি এসে যাবে তখন আবার আমার কাছেই ফিরে আসবে দেখবি।''

খুব তাড়াতাড়ি, মানে কয়েকদিনের মধ্যেই রজত সুতপাকে বিয়ে করে ফেলল। আমার মনে হল আমার সঙ্গে ঝামেলা হওয়াতে সে নিজের ভালোমানুষির পরিচয় দিতেই বিয়েতে আর দেরি করেনি। কিন্তু রজতকে নিয়ে সুতপার ভবিষ্যৎবাণী সঠিক বেরোল না। অনেক মহিলা ঘাঁটাঘাঁটি করেও ক্লান্ত হয়ে সে তার কাছে আর ফিরে এল না। এখনও পর্যন্ত নাকি সে মেয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেই চলেছে। তার বর্তমান প্রেমিকা শুনেছি পার্থরই দ্বিতীয় বউ। একই সঙ্গে দুটো বিদেশি বস্তু যাকে বলে ফরেন পার্টিকলস ঢুকে পড়ায় সুতপা এবং সুতপার ভাইয়ের বাড়িতে ঘুন ধরেছে।

সুতপার ভাইয়ের দ্বিতীয় বউয়ের আরেক গল্প। কলকাতায় বেলঘরিয়া থেকে অনুষ্ঠান করে সাদরে পুনেতে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে। আগে বোঝা যায়নি। কিন্তু বিয়ের কয়েকদিন পর থেকেই শ্বশুরবাড়িতে ঝটকা দিতে শুরু করল বউ। ঘরে শ্বশুর-শাশুড়ি এলে সে তাঁদের সুটকেস বাথরুমে নিয়ে গিয়ে জমা করে। কারণ জিজ্ঞেস করলে নেকো স্বরে বলে, ''ওমা তোমরাই তো বললে রাখতে!''

''বাবু, আমরা ট্রেনের জামাকাপড়ের কথা বলেছি।''

''সুটকেসের জামাকাপড়ও তো ট্রেনে করেই এসেছে।''

বউ রাতে ঘুমোয় না। বরকে ঘুম পাড়িয়ে বিছানার উপর চুপচাপ বসে থাকে আর বর ডিউটিতে গেলে রোদের মধ্যে ছাতা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। বউটিকে সুতপার ভাইয়েরই এক পড়শি একদিন আবিষ্কার করে আর এস আই ক্লাবের সামনে। ক্লাবটি ঘর থেকে কম করেও দশ কিলোমিটার দূরে। পড়শি খবর সুতপার ভাইকে চালান করে। রাতে ঘরে ফিরে সুতপার ভাই বউকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, ''আমি তোমাদের এখানকার ভাষা জা-নি না তো, তাই বাসে উঠতে ভ-য় করে। সেইজন্য ভেবেছি হেঁটে হেঁটেই শহরটাকে দেখব।'' বউটি সবসময় নেকো স্বরেই কথা বলে।

একদিন সে সুতপাকে সেই নেকো স্বরে বলেছে, ''দিদি তুমি আমার আন্ডারগাম-সটা করে দেবে গো?''

সুতপা জিজ্ঞেস করেছে, ''সেটা আবার কি বাবু?''

''ও-মা, তুমি একজন বিউটিশি-য়া-ন। তুমি জা-নো না আন্ডারগামস কি?''

''তোর আন্ডারটা বুঝলাম কিন্তু গামসটা বুঝলাম না। কীসের আন্ডার, জায়াগাটা একটু দেখিয়ে দে।''

হাতদুটো উপরে তুলে বগলতলা দেখায় বউ, ''এই দুটোকে আন্ডারগাম-স বলে।''

''এবার বুঝলাম। বাবু, এগুলো আন্ডারগামস নয়—আন্ডার আর্মস।''

''ওই হল।''

বিয়ে হলে বউ পাগল হোক আর ছাগল বন্ধ্যা না হলে তার জরায়ু সন্তান ধারন

করবেই। সুতপার ভাইয়ের বউ ক'দিন বাদে মেয়ের মা হল। মেয়েও বড় হতে থাকল। দুষ্টুমি করে সে, ভাত রুটি খেতে চায় না। বুকের দুধ খেতে সাধারণত বাচ্চারা মাকে বিরক্ত করে না। তখন বাইরের কাক-পাখি দেখানোর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ভাত রুটি খাওয়াতে প্রয়োজন হয়। মন ভোলানোর প্রয়োজন হয়। ব্যাপারটা এমন হয় যে বাচ্চা খাচ্ছে অথচ সে বুঝতে পারছে না সে খাচ্ছে। মধুবন সোসাইটিতে সুতপার ভাইয়ের ফ্ল্যাটটি বেশ ছোট। নিজেদেরই চলাফেরার জন্য যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যায় না, মনে হয় ঘরে মানুষের ভিড় লেগে আছে। ভিড়ের মাঝখানে বিনা নিমন্ত্রণে কাক-পাখিদের ঢোকার সাহস নেই। জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আয় রে কাক, আয় রে শালিক করে চিল্লিয়েও লাভ হয় না। বউ রান্নাঘর থেকে মশলার ডিব্বা নিয়ে এসে মেয়ের সামনে রাখে। মেয়ে ডিব্বা থেকে কালোজিরে, গোলমরিচ, মেথি হাতের মুঠোয় উঠিয়ে উঠিয়ে জলে ফেলে আর ভাত গেলে।

শাশুড়ি জিজ্ঞেস করেন, ''এ কি করছ তুমি?''

''না হলে মেয়ে খাবে না।'' নেকো স্বর।

বউয়ের বাপের বাড়িতে অভিযোগ করা হয়েছিল, ''আপনার মেয়ে নাকি বি এ পাশ করেছে? ভোডাফোনে চাকরি করত? তাই যদি হয় তাহলে বোধবুদ্ধি এত কম কেন?''

তখন মেয়ের মা স্বীকার করেছেন, ''মেয়ে যখন ক্লাস এইটে পড়ত তখন তার ব্রেন টিউমার হয়েছিল। অপারেশন করতে গিয়ে ব্রেন-ড্যামেজ হয়েছে, তাই আর পড়ানো যায়নি। কিন্তু মেয়ে আমার রূপসী। আপনার ছেলের থেকে তিন ইঞ্চি লম্বাও আছে। বেমানান হওয়ার তো কিছু নেই।''

সেই মেয়ে রূপের তাড়নায় রজতের সঙ্গে প্রেম শুরু করল। বউয়ের প্রেমের খবর পেয়ে সুতপার ভাই দুটো উবার ভাড়া করে তেরোখানা সুটকেস এবং পোঁটলাপুঁটলিসহ বউকে আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেসে চড়িয়ে দিয়েছে। ওদিকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছেই বউ বরের বিরুদ্ধে ঠুকেছে ডোমেস্টিক ভায়লেন্সের কেস। বারো হাজার করে ইন্টেরিম ভরছে সুতপার ভাইও।

সুতপা এখন আর অভিষেকের ঘরে ফিরে যেতে পারবে না। পুনেতে আসলে ঘরই নেই অভিষেকের। চাকরি ছেড়ে দিয়ে ফ্ল্যাটটি অনেক কম দামে বেচে ব্যাংকের লোন শোধ করে সে কৃষ্ণনগরে মায়ের কাছে চলে গেছে। শুনছি সেখানে আবার বিয়েও করে নিয়েছে অভিষেক। মেয়েটি কালো, বয়স্কা কিন্তু সরকারি প্রাইমারি স্কুলে চাকরি করে। বেকার অভিষেকের ভরণপোষণ চালিয়ে নেয়। অভিষেকের দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছে অনেকদিন আগেই। সুতপা জেনেছে মাত্র একবছর হল। তার সঙ্গে সুতপার ফোনে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। ছাড়াছাড়ি হওয়াতে একসঙ্গে থাকার প্রশ্নই নেই, টাকাপয়সা দিয়েও সাহায্য করতে পারে না অভিষেক। উল্টে সুতপার কাছ থেকে সে নিজেই যখন তখন টাকা চেয়ে বসে। তা স্বত্ত্বেও দু'জনের মানসিক বন্ধন অটুট ছিল। রজতের থেকে ঠোক্কর খেতে খেতে সুতপা আবার অভিষেকের কাছে ফিরেও যেতে চেয়েছিল। অভিষেক শুধু বলেছে সম্ভব নয়। বলেনি যে বিয়ে করেছে বলে সম্ভব নয়। অভিষেকের বোন সুতপার মেয়ের মোবাইলে বিয়ের একটা ফটো

পাঠিয়ে দেওয়ায় জানাজানি হল। ঘটনাটি ঘটেছে অভিষেকের অনুরোধে প্রতিবেশী মেয়ে মনীষার মায়ের কাছ থেকে সুতপা একশো টাকা ধার করে অভিষেকের মোবাইল রিচার্জ করে দেওয়ার পরদিন।

বিয়ের আগে আমার ঘরে এসে সুতপা আমাকে আশ্বস্ত করেছিল, ''তুমি একদম চিন্তা করো না রূপা। তোমার আমার বন্ধুত্ব একইরকম থাকবে।'' কিন্তু বন্ধুত্ব আমাদের একরকম থাকেনি। কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের পর দুর্গা ঠাকুরের ঘটে হাত রাখিয়ে রজত সুতপাকে দিয়ে পড়িয়ে নিয়েছিল 'আজ থেকে রূপার সঙ্গে আমি চিরদিনের মতো কথা বন্ধ করলাম'। তারপর সে এক হাতে সুতপাকে ভোগ করছিল আর অন্য হাতে আমাকে নোংরা নোংরা মেসেজ লিখে পাঠাচ্ছিল—আমি একজন পাতি মহিলা, বিদ্যে নেই, বুদ্ধি নেই, রূপ নেই, আমাকে কেউ পছন্দ করে না ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তখন অরুন্ধতি ঘোষ নামে এক পরিচিত বাঙালি বউদির বাড়িতে বসা। আমি পড়ছি মেসেজ, বউদিও পড়ছেন। মোবাইল টেবিলের উপর খোলা পড়ে আছে। বউদি জিজ্ঞেস করেন, ''জবাব দিবি না?''

''কি জবাব দেব বউদি?''

''লেখ আঙ্গুর ফল টক।''

লিখলাম।

রজত উত্তর দিল, ''হে হে, আসল আঙ্গুর ফল তো এখন আমার হাতের মুঠোয়।''

''এবার কি লিখি বউদি?'' কাতর কণ্ঠে বউদিকে আমার জিজ্ঞাসা।

''আর কিছু লিখতে হবে না। লোকটি বড্ড নোংরা। তুই ওর সঙ্গে লড়াই করে জিততে পারবি না।''

রজত তবু ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে অনেকক্ষণ ধরে একপাক্ষিক গুলিবর্ষণ চালিয়ে গেল, ''তুমি নিজেই আমাকে তোমার বাড়িতে আসতে বলেছিলে...তুমি আমাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিলে...তুমি আমাকে চুমু খেতে চেয়েছিলে...তুমি আমাকে...''

''ও মাগো বউদি, কি সব লিখছে নোংরা লোকটা! গা তো দেখিনি, কিন্তু ওর সারা মুখ এবং গলা ওয়ার্টে ভরা। আমি পড়েছি এসব হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের ইনফেকশন হলে হয়...জানি না লোকটি কোথায় কোথায় গিয়ে ওসব করে...আমি কিনা ওকে...।''

''চুপ থাক তুই। আর কিছু বলিস না। শুধু দেখ আর কত নামতে পারে সে।''

আমি বউদির কথামত কোন উত্তর দিলাম না তবুও সে লিখল, ''খবরদার পুলিশের কাছে যাবে না...গেলে আমি তোমাকে দেখে নেব...কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না...আমার ঘরে অনেক বড় বড় লোকের যাতায়াত...।'' বড় বড় লোক বলতে আমাদের বেঙ্গলি কমিনিউটির প্রেসিডেন্ট এবং দু'য়েকজন ব্যক্তি যেমন কালচারাল সেক্রেটারি বা ক্যাশিয়ার। সুতপার সঙ্গে আগে থেকেই কথাবার্তা ছিল, তাই বিয়ের পর ওরই জন্য রজতের বাড়িতে তাঁদের পদার্পণ হয়ে থাকবে।

কোন ছেলেকে পাশে না পেয়ে আমি রাজাকে রজতের কথা জানাই। সে তখন সিয়েরা লিওনে। আমার দুঃখের কথা শুনে বুঝলাম রাগে তার গলা থরথর করে কেঁপে উঠেছে। বলল, ''পুনেতে আমার অনেক মস্তান বন্ধু আছে। যদি বলো একবার

ভালো করে ধোলাই করিয়ে দিই?"

জীবনে প্রথমবার, তাও আবার ডিভোর্সের পরে আমার প্রতিরক্ষা নিয়ে রাজাকে এত উদ্‌বিগ্ন হতে দেখলাম। অবাক হলাম আমার সম্মান ফিরিয়ে দিতে তার সাহসের বাড়াবাড়ি দেখে। বললাম, ''এখনই তার দরকার নেই। তুমি এসে ওর বাড়ি গিয়ে ওকে একটু ভদ্রভাবে ধমকে দিও তাহলেই হবে।"

আমার খুব কষ্ট হয়েছিল রজতের দ্বারা এমন নোংরা অপমান সহ্য করতে। অনেকবার মনে হয়েছে মানহানির কেস করি। কিন্তু প্রত্যেকবারই নিজেকে সামলে নিয়েছি বারবার কোর্টে যেতে হবে, টাকাপয়সা খরচা হবে, রিলির লেখাপড়ার ক্ষতি হবে ভেবে। রজত তো একটা ছাড়া বলদ। পরিবার ছেলেমেয়ে কি জানে না। ওর হাতে অগাধ সময়। লোকের ক্ষতি করার জন্য অগাধ মনোবল ওর। আমি তো ওর মতো হতে পারি না। একটা নতুন প্রাণকে আমি পৃথিবীতে নিয়ে এসেছি। তাকে পুরো যত্ন দিয়ে বড় করার দায়িত্ব আমার কাঁধে। তাতে টাকাপয়সা বা সময়ের টানাটানি হলে চলবে না।

রাজা সিয়েরা লিওন থেকে এসে আমাকে আরও ব্যথা দিল। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল রজতের ব্যাপারটা পুরো ভুলে গেছে। আমি রাজাকে বারবার বলি ওর বাড়ি না যাও অন্তত পক্ষে ফোন করে বলো আমাকে এমন মানসিক যন্ত্রণা দিয়ে ঠিক করেনি সে। ভবিষ্যতে আর কখনও এমন হলে কিন্তু ভালো হবে না। রাজা গাঁই-গুঁই করছে, ''এখন আর বলে কি হবে?"

''না, বলো। এতদিন ছিলে না, বলোনি। এখন এসেছ, একবার হলেও বলো। বোঝাও যে আমরা একা নই। কোন ছেলেও আছে আমাদের সঙ্গে। এখানে শুধু আমরা মা-মেয়ে থাকি, কোন আত্মীয়স্বজন নেই। ভয় করে। লোকে বলে না শক্তের ভক্ত নরমের যম? কথাটা একেবারে অমূলক নয়।"

আমার কাছ থেকে ধাক্কা খেয়ে রাজা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যায়। আবার ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে আসে। জিজ্ঞেস করি, ''করলে ফোন?"

''হ্যাঁ করেছি।"

''কোথায় থেকে করলে?"

''ওই বিশ্রান্তওয়ারির রাস্তায় দাঁড়িয়ে।"

''বাড়ি থেকে কেন করলে না? বিল্ডিং-এর নিচে গিয়েই বা করলে না কেন? রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোন কথা শোনানো যায়?"

''শোনালাম তো।"

''কি শোনালে?"

''ওই যে...রূপার সঙ্গে এমন কেন করলেন?" বড্ড মিনমিনে গলা রাজার।

''সে কি বলল? ভয় পেল?"

''না না, ভয় কোথায় পেল! উল্টে আমাকে ধমকালো তোমার বিরুদ্ধে এফ আই আর করতে পুলিশ স্টেশনে যাবে বলে।"

''আর তুমি শুনে লেজ গুটিয়ে চলে এলে!"

''আর কি করব! মারামারি করব?"

রজতের সঙ্গে সুতপার বিয়ের পর প্রথম একমাস রোমাঞ্চকর কেটেছে। তারপর সুতপার ওপর শুরু হল লোকটির রঙ বদলানো ব্যবহার। রজতের প্রথম পাল্টি খাওয়া রঙটি সুতপা দেখল ভায়ের বিয়েতে পরবে বলে ওকে দুটো শাড়ি এবং দুটো লিপস্টিক কিনতে বলায়। তাতে রজত নাকি রেগে গিয়ে বলেছে, ''আমি কিনব কেন? তোর অভিষেক কি তোর খরচা দিয়ে তোকে আমার বাড়িতে পাঠিয়েছে?'' তারপর অফিস থেকে ফিরে শাড়ি চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সুতপাকে নিয়ে কলীগদের মন্তব্য সুতপাকে ছুঁড়ে দিয়েছে। ''মহিলাটি তো খুব লোভী! বিয়ের একমাস হতে না হতেই চাইতে শুরু করল!''

শেষপর্যন্ত জিনিসগুলো কিনে দিয়েছিল রজত। আবার সমস্যা শুরু হল দু'মাস পরেই। ঘর পরিষ্কার করতে দেবে না সে। সুতপার মতে ওটা তো ঘর নয়, ডাস্টবিন। রজত শাসায়, ''পরের বউ-বাচ্চাকে নিয়ে এসে পালছি। আমি এখানে যেভাবে আছি সেভাবেই থাকতে হবে। আমাকে আমার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শেখাতে এসেছে!''

মৌখিক অপমান বাড়তে বাড়তে রজতের হাত উঠল সুতপার গায়ে। বাড়তে থাকল অত্যাচার। সুতপার মতে তখন রজতের বাইরে আফেয়ার চলছে। অত্যাচার সহ্য করতে করতে একদিন তার কপালের আলুটি ফুলে গেল। সঙ্গে চূড়ান্ত মাথাব্যথা। ব্লাড প্রেসার বেড়ে গেছে। সুতপার কপালের আলু হল কপালের একপাশে লালচে রঙের হিমটোমা। গত পঁচিশ বছর ধরে সেটা সেখানে একই আকার নিয়ে অবস্থান করছিল। না বাড়ে না কমে। মাঝে মাঝে ডাক্তারের কাছে গিয়ে সে চেক আপ করিয়ে নেয়। ডাক্তার বলেন ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু সেদিন, ব্লাড প্রেসার বেড়ে যাওয়ায় আলুর সাইজ চারগুণ হয়ে গিয়েছিল। ফেটে যাব যাব অবস্থা। সুতপাকে রজতই ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার আলু ফোলার সঠিক কারণ অনুমান করে রজতকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ''বউকে অনেক মানসিক চাপে রেখেছেন মনে হচ্ছে?''

কোর্টে ডিভোর্সের পিটিশনটা রজতই ফাইল করেছে। টাকার অভাবে সোনার বালা বিক্রি করে উকিল অ্যাপয়েন্ট করেছিল সুতপা। মেয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং-এর খরচাও মাথার উপর এসে পড়েছিল। এডুকেশন লোন নিয়ে সেটাও সামলে নিয়েছে সে। দেখতে দেখতে চার বছর পেরিয়ে গেছে। চার বছরে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। দুর্গার ঘটে হাত রাখা শপথ ভেঙে সুতপা আমার সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছে। রজত ঘর ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে কাছেই এক দিদির বাড়িতে। তার ফ্ল্যাটে সুতপা আছে মেয়ে নিয়ে। সেখানে রজত সকাল সন্ধ্যায় এসে ঠাকুরের পুজো করে দীপ জ্বেলে যায়। মাঝে মাঝে সুতপাকে গালিগালাজ এবং অভিসম্পাতও করে। সুতপার মেয়ে পাশ করে চাকরি নিয়েছে। এখন সুতপা পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে আছে নিশ্চিন্তে। অ্যালিমনি পেলেই সে রজতকে ছেড়ে দেবে। কোন তাড়া নেই। ডিভোর্স না পেলেও কোন অসুবিধে নেই। রজত মারা গেলে ওর সব সম্পত্তি সুতপারই প্রাপ্য। ততদিন পর্যন্ত সমীরণ টিকে থাকলে ভালো না থাকলে অন্য কেউ না কেউ এসে যাবে।

সেক্স-এর কাছে পরাজিত হয়ে সম্পর্ক ভাঙতে অথবা কয়েক মিনিটের বা

কয়েক দিনের সম্পর্ক গড়তে মেয়েরা যে একদমই পারদর্শী নয় তা নয়। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে এই শতকরা সংখ্যাটা অনেক কম। আমার মনে হয়েছিল মাত্র চার শতাংশ, সেদিন এক ভদ্রলোক বললেন তার অনুমান দশ শতাংশ। পুরুষদের সংখ্যাটা তাহলে আমার হিসেবে ছিয়ানব্বই শতাংশ এবং তাঁর হিসেবে নব্বই শতাংশ। ভদ্রলোকের নাম বিপ্লব মুখার্জি। আমার ফেসবুকের ফ্রেন্ড লিস্টে আছেন। উনি মাঝে মাঝে আমার টাইম লাইনে এসে বেশ মজার মজার মন্তব্য করেন। যেমন আমার জন্মদিন পেরিয়ে যাওয়ার পর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিলেটেড হ্যাপি বার্থডে লিখে। সঙ্গে একটা ধীর গতিতে হেঁটে যাওয়া কচ্ছপের ছবি। বোঝাতে চেয়েছেন যে কচ্ছপের পাল্লায় পড়ে উনি সময়মত পৌঁছতে পারেননি। ছবিটা আমি রিলিকে দেখিয়েছিলাম। রিলি আমার চেয়ে বেশি মজা পেয়েছে। কেননা সে কচ্ছপের উপর একটা শামুককে বসে থাকা অবস্থায় দেখেছে। বুদ্ধিমান লোকজন পছন্দ বলে আমি ইনবক্সে তাঁর সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ অনুভব করেছিলাম। উনি সেখানেও নিয়মিত আমাকে গুড মর্নিং জাতীয় মেসেজ করতেন।

গবেষণায় দেখা গেছে যে মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের মধ্যে সেক্স ড্রাইভ শুধু বেশিই নয়, সেক্স ড্রাইভ দ্বারা প্রভাবিত হওয়াও তাদের ক্ষেত্রে অনেক সহজ ব্যাপার। আবেগ না থাকলে মেয়েরা সাধারণত ছেলেদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না। তারা সেক্স ডিজায়ারের স্পার্ক অনুভব করে না। এমন ক্ষেত্রে শারীরিক সম্পর্ক হলেও সেখান থেকে তারা সুখ পায় না। তাছাড়া শারীরিক সম্পর্ক করার আগে একটি মেয়ে তার নিজের এবং ছেলেটির শিক্ষা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, পারিবারিক কাঠামো, কোন সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা নিয়ে উভয়ে বড় হয়েছে, এবং সম্পর্কের অতীত ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে। ছেলেরা এসব নিয়ে মাথা ঘামায় কম।

সেদিন সুতপা আমার কাছে এসে আড্ডা মেরে ঘরে ফিরবে। আমি নিচে পার্কিং-এ গিয়েছিলাম ওকে সী-অফ করতে। সুতপার দ্বিতীয় হাজব্যান্ড ২০১০-এ তার দ্বিতীয় বিয়ের দু'বছর আগে অর্থাৎ ২০০৮-এ তাকে তেরো হাজার টাকা দিয়ে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড কাইনেটিক হোন্ডা কিনে দিয়েছিল। বার্থডে গিফট। সেই গাড়ির সীটে বসে স্টার্ট দেওয়ার প্রাক্কালে আমার মুখের উপর লজ্জার লাল রঙ টেনে দিয়ে তার সেই স্বরচিত প্রবাদবর্ষণ।

বলি, ''বড্ড কড়া ভাষা ব্যবহার করেছিস।''

কড়া ভাষা কিরে রূপা! এটাই ঠিক। শালারা শুধু ওটার ধান্দা নিয়েই ঘুরে বেড়াবে তাতে কোন দোষ নেই আর সত্যি কথাটা বলতে গেলেই দোষ! তোর সন্দীপও দেখবি...''

''প্লীজ মুখ বন্ধ কর এবার।''

''আমি মুখ বন্ধ রাখলেই কি সে তার জামাপ্যান্ট খোলা বন্ধ রাখবে?''

আমি একদিন সন্দীপকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি তো আমাকে আপনার কাছে সহজ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। নিজে কতটা সহজ হতে পারবেন আমার কাছে?'' সে বলেছিল, যতটা বলবে।

''গেঞ্জিটা খুলে ফেলতে পারবেন?''

''ঠিক আছে।'' এক মুহূর্তে গায়ের সাদা হাতকাটা গেঞ্জিটি খুলে ফেলল সে। অবাক হয়েও নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এটা এমন কি আর বড় ব্যাপার। অনেক পুরুষই শুধু ঘর কেন, রাস্তাঘাটেও খালি গায়ে নির্লজ্জ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। উলঙ্গ হতে পারলে বুঝব কিছু করতে পেরেছে।

''শর্টসটা খুলতে পারবেন?''

''ঠিক আছে,'' বলেই সে দেখি তার বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো। আমি লজ্জায় হাত দিতে আমার মোবাইলের স্ক্রিন ঢেকে রেখেছি। ওর উলঙ্গ চেহারা দেখার ইচ্ছে আমার মোটেও নেই অথচ উলঙ্গ হচ্ছে কি হচ্ছে না তা বোঝার কৌতূহলও সামলানো যায় না। আঙুলের ফাঁক দিয়ে আমি উঁকি মারি। ভাবি শর্টস খুলতে শুরু করলেই চোখ ফিরিয়ে নেব। সন্দীপ হেঁটে ঘরের ওইপাশটাতে গেল দেখলাম। হাতে একটা সাদা কাপড় টেনে নিল বলে মনে হল। নাকি নিল না। আমি চোখ বন্ধ করি। বলি, ''অনেক হয়েছে। থাক আর হিরোগিরি নয়।''

মোটামুটি তিরিশ সেকেন্ড বাদে দেখি সন্দীপ বিছানার উপর যথাস্থানে বসে আছে।

''আপনি কি সত্যি সত্যিই ওটা খুলে ফেলেছিলেন?''

''হ্যাঁ।''

''লজ্জা করল না?''

''না। একবার দেখে নিলেই...।'' দেখে নিলেই-এর পরের কথাগুলো বুঝতে পারলাম না। মনে হল বলতে চাইছে ওর উলঙ্গ চেহারা একবার দেখে নিলেই আমার নিজেরও লজ্জা অনেক কমে যাবে।

ঘরে আমার কাছে এসব কথা শুনে নিচে গিয়ে মতামত ছুঁড়ছে সুতপা এই বলে যে সন্দীপও সেই একই দলেই পড়ে।

সন্দীপকে আমি অধিকাংশ সময় ঘরেই বসে থাকতে দেখি। মন বলে লোকটি একদমই বহির্মুখী নয়। প্রতিদিন বিকেলে শুধুমাত্র কিছুসময়ের জন্য সে বাইরে হাঁটতে বেরোয়। ফেরার পথে শাকসবজি এবং রান্নার প্রয়োজনীয় উপকরণ কেনে। ঘরের কাজের ছেলেটি বোধ হয় এসব করে না। সে শুধু রান্না করে। মাঝে মাঝে তার ঘরে বোন যেচে নিমন্ত্রণ নিয়ে ডিনারে আসে, মাঝে মাঝে সন্দীপ যায় বোনের বাড়ি। বোনের সঙ্গে থাকলে সে আমার সঙ্গে কথা বলে না। তখন আমার সামনে হেলায় জামা-প্যান্ট খুলে ফেলার ক্ষমতাসম্পন্ন লোকটিকে অনেক দূরের লাগে। এমন দূরের লোক আমি জীবনে অনেক দেখেছি। এখনও দেখছি। আমার খুব মানসিক পরিশ্রম হয় সেসব লোকের দল থেকে সন্দীপকে আলাদা করে উঠিয়ে নিয়ে আসতে।

সোনালি জিজ্ঞেস করে, ''কি রে, কি খবর? একদম ডুব মেরে গেলি যে!''

''খুব ব্যস্ত।''

''বাব্বা! কিসের এত ব্যস্ততা?''

''একা প্যারেন্ট ছেলেমেয়ে সামলাচ্ছিস বুঝিস না? আমার অবস্থা কি তোর চেয়ে অনেক আলাদা?''

''আলাদাই তো।''

''যেমন?''

''তাপসদা বললেন তুই নাকি প্রেম করছিস?''

''ওহ্, তোর কাছে পৌঁছে গেছে খবর?''

''কেন এমন বলছিস?''

''তাপসদা বলেন উনি নাকি কারও কথা কাউকে বলেন না। কিন্তু আমি তো এ জীবনে ওঁর চাইতে বড় ছেলে দূত আর দেখিনি।''

''ছাড় এসব কথা। আসল কথায় আয়।''

''তাপসদাকে যা খোশমেজাজে বলেছিলাম এখন তা সত্যি হয়েছে।''

''আ-রে সাব্বাস!''

''কিন্তু জানি না, কতদিন টিকবে।''

''কেন? টিকবে না কেন?''

''পরে বলব।''

তারপর থেকেই দেখি সোনালি ঘণ্টায় ঘণ্টায় হোয়াটসআপে আমার ডিপির প্রশংসা করছে। আমার জীবনে এক ভবিষ্যৎহীন প্রেমের দৌলতে সব ডিপিই সোনালির ভালো লাগছে, অনিন্দিতার ভালো লাগছে। প্রতিদিনই সোনালি জিজ্ঞেস করছে, ''তোর বর্তমান হিরোর খবর কি?'' উত্তর পাওয়াও ধৈর্য নেই। তার আগেই বলছে, ''তোর এই ডিসপ্লে পিকচারগুলো দেখলে তো সে মূর্ছা যাবে।'' আমার প্রেমের প্রগতি শোনার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে ওর মন। কিন্তু সময় একদমই করে উঠতে পারছে না। অফিসে রবিবার ছাড়া শুধুমাত্র দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শনিবারে ছুটি থাকে। ছুটির দিনগুলো ঘরের কাজের চাপে, মেয়ের দেখাশোনা করতে করতে কিভাবে শেষ হয়ে যায় বুঝতে পারে না। তবু বলে, ''আয় না, বল না। এত ইন্টারেস্টিং কথা সামনে বসে মন দিয়ে না শুনলে মজা আসে না।''

সোনালির সঙ্গেও বছর দুই তিন আমার বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। কোন মনোমালিন্য নয়—এমনি। বিশেষ যোগাযোগ ছিল না মানে দেখাসাক্ষাৎ হত না। শুধু অনেকদিন বাদে বাদে ফোনে কথাবার্তা হত। আমি যখন ওকে ফোন করতাম তখন রাজার সঙ্গে আমার কলহের সব কথা বলতাম। রাজা কিভাবে পর্ন সাইটে গিয়ে বেশ্যাগুলোর সঙ্গে চ্যাট করছে এবং ওদের নোংরা ফটো দেখে আরও না জানি কি কি সব করছে। বলতাম ইংল্যান্ড-আয়ারল্যান্ড নয়, আমেরিকা-কানাডা নয়, অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডও নয়, সে কেবলমাত্র আফ্রিকার সিয়েরা লিওনের মতো একটি গরিব দেশে গেছে, যে দেশটি তারই কম্পানিকে দিয়ে প্রোজেক্ট করিয়ে দশ মিলিয়ন ডলার ঝুলিয়ে রেখেছে, কম্পানিকে পথে বসাতে চলেছে। সেখানে গিয়েই রাজা কেমন ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে। দুনিয়া জুড়ে যত নোংরা জাতের মেয়ে আছে তাদের সবাইকে মেল করেছে, হোয়াটসআপ করেছে, ''আই অ্যাম নট আ পার্সন টু সিট ইন ওয়ান প্লেস। মাই হবি ইজ ট্র্যাভেলিং। আই অ্যাম আ বিগ-হার্টেড

ম্যান। ইউ ক্যান ফ্রীলি শেয়ার এভরিথিং উইথ মী।" সোনালি শুধু শুনেছে। তখন তার বরের সঙ্গেও যে রীতিমত মারামারি ফাটাফাটি চলছে তা সে আমায় বলেনি। বলেনি যে সিভিল কোর্টে, ক্রিমিন্যাল কোর্টে তার কোমর বেঁধে যাতায়াত শুরু হয়েছে। খবরটা পেয়েছিলাম আমি সুতপার কাছে। সুতপা বলেছে সোনালির বর ওদের সোসাইটির রাকেশ নামে একটি লোকের সঙ্গে সোনালির অবৈধ সম্পর্ক আছে বলে সব বাঙালির বাড়িতে গিয়ে প্রচার করে এসেছে। প্রচারের বিষয়বস্তুর সত্যতা যাচাই না করেই বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের মহিলামহল কোনরকম পূর্বাভাষ বিনা হঠাৎ করে সোনালির বাড়িতে গিয়ে ওকে অপমান করে এসেছে, ছেলেমেয়ে নিয়ে ওকে একঘরে করে দিয়েছে এবং রটিয়েছে সোনালি বরকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে বলে। আমার বিশ্বাস হয়নি। বারবার মন বলছিল সোনালি একটি ধৈর্যশীল, অচঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে, তার এমন বুদ্ধিবিপর্যয় ঘটতে পারে না। পরপুরুষের দিকে মহিলাদের মোটেও যে দৃষ্টিনিক্ষেপ হয় না তা নয়। তবে পরপুরুষরা পরমহিলার দিকে যেভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝুঁকে পড়ে সেরকম তারা করে না। সাধারণত মেয়েদের চাহনিতে অশ্লীলতাও কম থাকে, লজ্জা লজ্জা ভাব বেশি থাকে। ছেলেরা জিনিসগুলো সত্যি সত্যি না করা পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয় না। কিন্তু মেয়েরা শুধুমাত্র কল্পনা করে নয়তো বান্ধবীমহলে আলোচনা করেই খুশি থাকে। শৈশব থেকে মানবসভ্যতায় মোবাইলের অবতরণের আগে পর্যন্ত রাস্তাঘাটে ছেলেদের লোলুপ চাহনি, টন্টিং অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি। মোবাইল এলে হঠাৎ করে অজানা অচেনা নম্বর থেকে 'প্রেম না বাল'এর অনেক মেসেজ পেয়েছি, অন্য মেয়েদেরও পেতে দেখেছি। তারপর ইন্টারনেট আসার পর সেই অনেক মেসেজের সংখ্যাটা অসংখ্যতে গিয়ে পৌঁছেছে।

বছর তিনেক আগে ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খুলেছিলাম। খোলার চার ঘণ্টার মধ্যেই একান্নটি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট। আনন্দে মন নেচে উঠেছিল। আনাড়ি আমি সবগুলোকেই অ্যাক্সেপ্ট করব ভেবে টিক দিতে শুরু করেছিলাম। রিলিই আমায় শাসিয়ে থামিয়ে দিয়েছে, ''মাম্মা! কি করছ? দাঁড়াও।"

''কেন?"

''যে সব রিকোয়েস্টের প্রোফাইলে ফলমূল, চেয়ার-টেবিল, নায়ক-নায়িকা যেমন সাহিদ কাপুর, ঋত্বিক রোশন, টাইগার স্রফ, কারিনা কাপুর, আলিয়া ভাট, ক্যাটরিনা কাইফ-র ছবি আছে না হলে 'এল আই সি'র লোগো, কালীমাতার মুখ কিংবা সিনারি আছে সেগুলোকে ডিলিট মারো।"

''কেন রে?" কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন আমার। আসলে বলতে চাওয়া, ''করিস না বাবু ডিলিট।"

''না, মারো ডিলিট। এগুলোর বেশিরভাগই ফেক আইডি।" মোবাইল হাত থেকে কেড়ে নেয় সে। ''আর দেখছ এই ডিপিগুলো? সব কিসিং, ফাকিং-এর ছবি।"

''তাই তো! এসব কেন দিয়েছে?"

''বুঝতে পারছ না কেন দিয়েছে? ওইসব করার জন্যই ফেসবুকে এসেছে এরা। এগুলোকে স্প্যাম বলে মার্ক করতে হয়।"

বেঁচে রইল মাত্র আটটা রিকোয়েস্ট যেগুলোতে বন্ধুত্বে ইচ্ছুক লোকগুলো আসল ছবি দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আটটার মধ্যে একটাতে একটি ছেলে মাঠের মধ্যে বাইক পাশে রেখে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে আছে, একটাতে একটি লোক মোবাইল কানে নিয়ে ব্যস্ত ব্যস্ত ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদের দেখে ভক্তি আসে না। একটাতে মুখের ফটোর চারপাশে দু'হাজার উনিশের ফ্রেম—মালা চড়ানো নেই তবু দেখে লোকটি জীবিত আছে বলে বিশ্বাস হতে চাইছে না। সুতরাং রিকোয়েস্ট রিজেক্ট করতে ইচ্ছা করছে। রিলির ছোঁয়া লেগে কয়েক সেকেন্ডেই আমার পছন্দের মান অনেক উপরে উঠে গেছে মনে হচ্ছে।

বাকি পাঁচটার একজন অবাঙালি। শ্যামরাজ ধকাতে—নাম পড়েই বিকর্ষণ অনুভব হয়, দেখেও মূর্খ গাঁওয়ার লাগে। আরেকজন বাঙালি কিন্তু তার নামটিও সুবিধের লাগে না—কামদেব মোদক। রিলি থাম্বনেলের উপর ক্লিক করে লোকটির টাইম লাইনে গেল। দেখি পাঁচবার দুটো প্রোফাইল পিকচার ঘুরে ফিরে পোস্ট করা হয়েছে। স্ক্রোল ডাউন করলে পাঁচটা প্রোফাইল পিকচারের পর টাইমলাইন আর নিচে যায় না। অর্থাৎ শেষ। রিলি বলে, ''এটাও ইনবক্সে উল্টোপাল্টা চ্যাট করার জন্য অ্যাকাউন্ট খুলেছে।''

বাঁচা তিনটেকে একটু ভদ্রসদ্র লাগে। টিক টিক করে রিকোয়েস্ট কমফার্ম করে দেয় সে।

সেই তিনখানার মতো তিনবছরে আরও সাড়ে চার হাজার নাম আমার ফ্রেন্ডলিস্ট-এ এসেছে। তাদের সামাল দিতে দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। সবাই টাইমলাইন এড়িয়ে গিয়ে পোকামাকড়ের মতো পুট করে ইনবক্সে ঢুকে পড়ে। এরা কেউ মেয়ে বা মহিলা নয়। এরা সব ছেলে বা পুরুষ। বিবাহিত হলেও ইনবক্সে আসা চাই, বিবাহিত না হলে তো চাই-ই চাই। তাদের টাইমলাইনে বউয়ের সঙ্গে ফটো আপলোড করা থাকলেও ইনবক্সে আসা চাই, ফটো না থাকলে তো চাই-ই চাই। ফ্রেন্ডলিস্টে এসেছে মানে ইনবক্সে আসার পুরো অধিকার তাদের আছে এমন বদ্ধ ধারণা নিয়ে চলে তারা। এসে নানা প্রশ্ন—কোথায় থাকো, কি পড়াশোনা করেছ, কি করো, বাড়িতে কে কে আছেন ইত্যাদি। উত্তর না দিতে চাইলে নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখায়। হয় বলে, ''নিজেকে খুব বড় ভাবছ নাকি?'' নয় বলে, ''অদ্ভুত মহিলা তো! চ্যাট করবে না!'' তা না হলে বলে, ''চ্যাট না করলে আনফ্রেন্ড করে দাও।'' আরে বাবা সাড়ে চার হাজার জনকে ইনবক্সেই যদি আলাদা আলাদা করে নিজের বিস্তারিত বিবরণ দিতে হয় তাহলে প্রোফাইলে সেসব উল্লেখ করেছি কেন! যদি বলি আপনি আনফ্রেন্ড করুন তাহলে বলে, ''আমি কেন করব? তুমি কথা বলতে চাও না, তুমি করো।'' অনেকে আবার ইনবক্সে ঢুকেই প্রশ্ন করে ''লাঞ্চ করেছ?'' বা ''ডিনার করেছ?'' এমন হাবভাব যেন এদের সঙ্গে আমার অনেকদিনের পীরিতের সম্পর্ক। জানে এক মিনিটের মধ্যে ফুটে যেতে পারে বন্ধুত্ব তবু। হয় তারা ফুটিয়ে দেবে আমাকে নতুবা আমি ফুটিয়ে দেব তাদেরকে। কেউ কেউ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস একতরফা শুভসকাল, শুভ মধ্যাহ্ন, শুভ অপরাহ্ণ, শুভসন্ধ্যা, শুভরাত্রি জানিয়ে যায়। ফ্রীতে। কেউ কেউ গান শুনিয়ে যায়। কেউ কেউ মিনমিনে কবিতা

শোনায়। সব একতরফা। সবই ফ্রীতে। এত বন্ধুপ্রীতি। এখনই যদি ফেসবুক এমন এক একটা মেসেজের জন্য এক পয়সা করে চার্জ করে সব বন্ধুপ্রীতি এক মিনিটের মধ্যেই উবে যাবে। ভদ্র মুখ দেখে ফ্রেন্ডলিস্টে নিয়েও বিপন্মুক্ত হওয়া যায় না। কেননা অনেকেই মুখোশের আড়ালে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সেক্স চ্যাটের ইচ্ছে ব্যক্ত করে। পরোক্ষভাবে মানে কথাবার্তার মাধ্যমে হামাগুড়ি দিতে দিতে সেক্স-এর রাস্তায় এগোয়, এমন সব প্রশ্ন করে যার জোর করে বহু মানে বের করা যায়। প্রত্যক্ষভাবে মানে অসম্ভব সাহসের সঙ্গে সরাসরি পর্ণ ফটো বা পর্ণ ভিডিও পাঠিয়ে। ছেলের নামে ফেক অ্যাকাউন্ট খুলে দেখেছি ইনবক্সে ঝাঁপিয়ে পড়া মেয়ের সংখ্যা অতি নগণ্য।

যাই হোক সোনালিকে নিয়ে এমন রটনা আমার অবিশ্বাস্য লেগেছিল। তবু আমি একদিন ওকে ফোন করেছিলাম, ''কেমন আছিস?''

''ভালো আছি রে।''

সুতপার দেওয়া খবর সত্যি হলে ভালো থাকা তো উচিত নয়! ''কোন সমস্যা নেই তো?''

''না না, সমস্যা থাকবে কেন?''

সুতপা পরদিন আমার ঘরে এলে বলি, ''এটা হতেই পারে না।''

''কি হতেই পারে না?''

''সোনালি এমন কাজ করতেই পারে না।''

''এই শোন, আমি মুখে মিথ্যে খবরের ইনফেকশন নিয়ে ঘুরে বেড়াই না।''

কথার সত্যতা যাচাই করতে আমি সোনালির ঘরে যাই। বলি, ''তোকে হঠাৎ দেখতে ইচ্ছে করল, তাই চলে এলাম।''

''ভালো করেছিস?''

''অর্ণবদা কোথায়?'' অর্ণবদা সোনালির হাজব্যান্ড।

''ওর তো মাথা খারাপ হয়েছে। তুই জানিস না?''

''না তো! কোথায় আছেন উনি?''

''আরে, বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে সে।''

''কেন?''

''আমার মতো চরিত্রহীন বউয়ের সঙ্গে থাকতে পারবে না বলে।'' কিছু কথা বলে সোনালি। কিছু আড়াল করে যায়। বুঝি গত দুই বছরের একরকমের যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা, আমাদের মধ্যে মানসিক দূরত্ব তৈরি করেছে। সেই দূরত্ব কমাতে আমি একদিন সোনালিকে ছেলেমেয়েসহ ডিনারে নিমন্ত্রণ করি। পঞ্চব্যঞ্জন খাওয়াতে খাওয়াতে অনেক এলোমেলো কথা বলি ওর সঙ্গে। তারপরে আসল কথায় আসি।

সে বলে, ''দুটো কেসের ধকল সামলাতে হচ্ছে। একটা কেস ফাইল করেছে ব্যাংক, ফ্ল্যাটের ই এম আই আদায় করার জন্য। ই এম আই না পেলে ফ্ল্যাট ব্যাংকের হয়ে যাবে। নিলাম হবে তার। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কেসটা আমি করেছি। কেস ফাইল হওয়ার দেড় বছর পর কোর্ট থেকে অর্ণবের ওপর মাত্র সাত হাজার টাকা ইন্টেরিম ভরার অর্ডার হয়েছে। কি বদমাস দেখ—মেয়ের স্কুলের মাইনে, টিউশনের

মাইনে, বাসের ভাড়া দিতে হবে জেনেও সময়মত টাকা ছাড়ে না। বাবা প্রতি মাসে দশ হাজার করে পাঠান। মাঝে মাঝে তাপসদা তাঁর হোটেলের কিছু ডিশ তৈরির কাজ দেন। সেখান থেকে পাঁচশো হাজার টাকা আসে কিন্তু সেই উপার্জন খুব অনিয়মিত। দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে জীবন। মাঝে মাঝেই ব্যাংক থেকে নোটিশ আসছে ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিতে হবে বলে। গত কয়েক বছরের সতেরো হাজার টাকার পাহাড়প্রমাণ ই এম আই এবং তার ওপর সুদ জমা হয়ে আছে। সবসময় ভয় মনে...এই বুঝি মেয়ে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে হয়।"

ভাবি সত্যিই তো। ছেলে না হয় রাতে যথারীতি বন্ধুর বাড়িতে থেকে নেবে কিন্তু মেয়ের তো তেমন বান্ধবীও নেই!

''আমার মনে হয় না ব্যাংক এইভাবে দু'জন মহিলাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে। অবশ্য তার জন্য যেভাবেই হোক কোর্ট থেকে স্টে-অর্ডার নিয়ে আসার প্রয়োজন।"

''অ্যাডভোকেট তো চেষ্টা করছে। দেখি কি হয়।"

''কোন কোর্টে কেস উঠেছে?"

''খাড়কি।"

আমার হিসেবে সোনালির কেস খাড়কি জুরিসডিকশনে যাওয়া উচিত নয়। সেটা ভেবে এবং সাত হাজার টাকার ইন্টেরিম মাস চালানোর জন্য অপর্যাপ্ত ভেবে আমি ওকে আমার পরিচিত একজন অ্যাডভোকেটের কাছে নিয়ে যাই। অ্যাডভোকেট কেস বুঝে নিয়ে সোনালিকে বিয়ের দিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে যা যা ঘটেছে তার বিস্তারিত বিবরণ ইংরেজিতে লিখে দিতে বলেন। সোনালির ইংরেজিতে একদমই দখল নেই। তাই বিবরণ লিখতে আমাকেই ল্যাপটপ নিয়ে বসতে হয়। সোনালি বসে পাশে। বলে, ''লেখ, আমার যখন মাত্র কুড়ি বছর বয়স তখন আমার বাবা খবরের কাগজের ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটে বিজ্ঞাপন দেখে মিস্টার অর্ণব ব্যানার্জির সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের তারিখটা ছিল ১৯৯১-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারি।"

''তারপর?"

''অর্ণব ব্যানার্জিরা পাঁচ ভাইবোন ছিল। সবাই আমার থেকে বয়সে বড়। শ্বশুর শাশুড়িও।"

''শ্বশুর শাশুড়ি বড় তো হবেনই। এটা আবার লেখার কি আছে?"

''না লেখ। ডিস্টার্ব করিস না। আমাকে মনে করতে দে। উঁ...উঁ..."

মিথ্যে মিথ্যে বলি লিখেছি। ''তারপর বল।"

''অর্ণব ব্যানার্জির বিধবা দিদি তাঁর মা-বাবার কাছেই থাকতেন। আমার বিয়ের আগে বলা হয়েছিল যে দিদির হাজব্যান্ড অসুখে মারা গেছেন কিন্তু পরে আমি শুনেছি যে ঘটনাটি আসলে ছিল আত্মহত্যার।"

''তাই নাকি?"

''হ্যাঁ। লেখ, বিয়ের দিনই আমাকে ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে আমি কখনও ওই বাড়ির অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে পারব না।"

''ওমা কেন?"

''আরে, একেবারে অসামাজিক পরিবার। জানিস আমি বিয়েতে অর্ণবের একটা বন্ধুকেও দেখিনি? পাড়ার লোক, আত্মীয়-স্বজন কারও বাড়িতেই ওদের কোন যাতায়াত ছিল না। বিয়ের পরে আমি ননদদেরও খুব কমই শ্বশুরবাড়িতে আসতে দেখেছি। আমাকেও ওরা মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে যেতে দিতে চাইত না। বাবার বাড়ি যাব বললেই বলত, তোমার বাবা তো বিয়েতে আমাদের পচা খাবার খাইয়েছে।''

''এ তো রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরের দেনাপাওনার মতো কেস রে!''

''না, তার চেয়েও করুণ।''

''কি করে?''

''দেনাপাওনাতে নিরুপমার বর বাইরে ছিল। সে নিরুপমার ওপর তার শ্বশুর-শাশুড়ির অত্যাচারের কথা জানত না। কিন্তু আমার বর তা জানত এবং সে তার বাড়িতে থেকে বা না থেকে পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমার ওপর অত্যাচার করত। হিটলারের রাজনীতির চাইতেও ভয়ংকর আমার শ্বশুরবাড়ির পারিবারিক নীতি।''

''তোকে মারধর করত বুঝি?''

''প্রথম প্রথম গালিগালাজ করত। পরে কথায় কথায় গায়ে হাত ওঠাতেও শুরু করেছিল।''

''কেমন গালিগালাজ করত?''

''বলত অশিক্ষিত পরিবারের অশিক্ষিত মেয়ে। আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কোন যোগ্যতাই ছিল না। শালা জিন্দেগিতে নিজের জন্য প্রাইভেট মাস্টারের মুখ দেখলাম না, তাও খোঁচা দিত বিয়ের আগে আমার প্রাইভেট মাস্টারের সঙ্গে প্রেম ছিল বলে।''

''তারপর?''

''লিখছিস তো সব?''

''হ্যাঁ হ্যাঁ, বল।''

''বিয়ের এক বছর পরে আমার অটোম্যাটিক অ্যাবরশন হয়েছিল। প্রাক্টিক্যালি তখনই প্রেগন্যান্সির কথা জানতে পেরেছিলাম। অর্ণব সেই প্রেগন্যান্সির সঙ্গে তার কল্পনার সেই প্রাইভেট মাস্টারকে জুড়ে দিল। বলল ওটা নাকি ওই মাস্টারেরই বাচ্চা ছিল।''

''যদি সত্যিই তাই হয়, বেশ অপমানকর।''

''এটা তো কিছুই না। আরও অনেক অপমান সহ্য করেছি। লেখ, আমার ছেলে অভিমানের জন্মের আগে ছোট দেওর জোর করে আমার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করতে চেয়েছিল। আমি কোনওরকমে নিজেকে বাঁচিয়ে শাশুড়িকে জানাই। শাশুড়ি অর্ণবকে জানান। তারপর দু'জনে মিলে আমাকে ধমকানি দেয় বাড়ি থেকে বের করে দেবে বলে।''

''তুই কি দোষ করলি?''

''বলে আমি নাকি ওদের ভাইদের একতা নষ্ট করতে চাইছি।''

''অর্ণবদা ভাইয়ের চরিত্র কেমন জানতেন না?''

''ঠিক জানত। শুধুমাত্র ওর বড়দা ভদ্র ছিলেন। উনি আমেরিকাতে থাকতেন।

তাঁর প্রথম বউয়ের সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল। কারণ আমি অনুমান করি কিন্তু নিশ্চিত জানি না। দ্বিতীয় বিয়ের পর উনি কিছুদিনের জন্য বউকে বাড়িতে ছেড়ে গিয়েছিলেন। গিয়েও শান্তিতে থাকতে পারছিলেন না। ছোট দেওরকে চিঠি লিখেছিলেন, বউদির সঙ্গে বেশি মেলামেশা করবি না। একদিন ঘরে ঝাঁট দিতে দিতে আমি চিঠিটা পেয়েছিলাম। খোলা অবস্থায়। না চাইলেও লাইনটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল।"

সোনালি আমায় জিজ্ঞেস করে, ''লিখছিস তো?"

''হ্যাঁ রে বাবা।"

''অভিমানের জন্মের সময় ওরা আমার বোনকে রাতে হসপিটালে থাকতে বলেছিল। বোন খুব ছোট বলে আমরা রাজি হইনি। উল্টে আমার মা-বাবা অর্ণবের সেই বড় বিধবা বোনকে থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। তাতে নাকি তাঁর অপমান হয়েছে। অপমানের জ্বালায় অর্ণব হসপিটালেই আমাকে মেরে পোস্ট-মর্টেমের জন্য তৈরি করে দেয় আর কি। সৌভাগ্যবশত কয়েকটি নার্স এসে তাকে বাধা দেয়। এসব দেখে আমার মা-বাবা আমাকে বাচ্চা নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে পাঠাতে সাহস পেলেন না।"

''কবে আবার সেখানে গেলি?"

''ওরা আমাকে আর ছেলেকে নেবেই না বলে দিয়েছিল। দু'মাস বাদে আমার দাদু আমাদের ছেড়ে আসতে গেলে ওরা বাড়ির দরজা খোলেনি। ফেরত আসতে হয়েছিল আমাদের। তারপর আমার জামাইবাবু ফোনে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে অনুরোধ করে শাশুড়িকে রাজি করিয়েছিলেন। পরিবর্তে আমার বাবাকে একটা এগ্রিমেন্ট পেপার সাইন করতে হয়েছিল। সেখানে লেখা ছিল যে আমার মা-বাবা বা কোন আত্মীয়স্বজন যেন ওদের বাড়িতে কখনও পা না রাখেন। আর ওরা যখন স্বেচ্ছায় আমাকে মা-বাবার বাড়িতে যেতে দিতে চাইবে তখনই আমি যেতে পারব। সেই এগ্রিমেন্টের কপি কিন্তু বাবা পাননি।"

কুড়ি পাতার ড্রাফট হয়েছিল সোনালির। সেখানে আরও অনেক কথা ছিল যেমন পুনেতে এসেও কিভাবে সোনালির হাজব্যান্ড সোনালিকে মারধর করেছেন, সোনালির মা-বাবার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এলে কিভাবে তাঁদের অপমান করেছেন, কিভাবে পুনের ফ্ল্যাটে সোনালির অজান্তে ছোট দেওর ঢুকে পড়েছে এবং ওর সঙ্গে পুনরায় অশোভন আচরণের চেষ্টা করেছে, কিভাবে তার বর ছেলে অভিমানকে মায়ের বিবাহপূর্বক কাল্পনিক প্রেমের গল্প শুনিয়েছেন ইত্যাদি।

সোনালির বিশ্রান্তওয়ারির বাড়ি থেকে প্রায় বারো কিলোমিটার দূরে পার্বতী হিলের কাছে একটা রামকৃষ্ণ মঠ আছে। সোনালির হাজব্যান্ড মাঝে মাঝে সপরিবারে সেখানে যেতেন। কখনও পরিবার যেতে না চাইলে উনি পরিবারকে জানিয়ে বা না জানিয়ে একা যেতেন, ধ্যান করে, বসে, গল্প করে কিছু সময় কাটিয়ে ঘরে ফিরতেন।

ছেলেকে মায়ের প্রেমের গল্প শোনানোর দিন পনেরো পরের এক রবিবারের কথা—দুপুরের খাবার খেয়ে সোনালির হাজব্যান্ড বাড়ি থেকে বের হন এবং রাত এগারোটা পর্যন্ত ফেরেন না। সোনালি ছেলেকে বলে বাবাকে ফোন করতে। ছেলে

ফোন করলে বাবা ধমকানি দেন, ''আমি কোথায় আছি তোমাদের জানার কি দরকার?''

ধমকানি খাওয়া ছেলেকে সোনালি বলে, ''বাবা হয়ত রামকৃষ্ণ মঠে গেছে। ফিরে আসবে।''

কিন্তু বাবা ফেরেন না। বাইরেই রাত কাটিয়ে দেন। সোনালি অনুমান করে তাহলে উনি কলকাতায় গিয়ে থাকবেন। না বলে বাড়িতে এবং মুম্বাইতে অফিস ট্যুরে যাওয়ার নজির উনি আগে রেখেওছেন। কিন্তু তখনকার সঙ্গে এখনকার পার্থক্য এটাই যে তখন ফোন করলে উনি তাঁর অবস্থান জানিয়েছেন এবং তারপর নিয়মিত পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। এবার উনি একেবারেই নিশ্চুপ হয়ে গেছেন। ধমকানির ভয় ভুলে ছেলে পরের কয়েকদিন বেশ কয়েকবার ফোন করেছিল। কখনও উনি ফোন উঠিয়েছেন, কখনও ওঠাননি। যখন উঠিয়েছেন তখন বলেছেন, ''আমার বাড়ি এসে কি হবে! তোমরা তো আমার কথা শোনো না।'' সোনালি বলেছে, ''হাতে টাকা নেই। সংসার চলছে না।'' উনি কড়াভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, ''আমি আর তোমাদের জন্য টাকা খরচ করতে পারব না।''

হাজব্যান্ডের মতিগতি মোটেও সুবিধের নয় বুঝে সোনালি তার মা-বাবাকে ফোন করে। তাঁরাও খুব চিন্তায় পড়ে যান মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। ক্ষীণ আশা নিয়ে হাজব্যান্ডের অপেক্ষা করতে করতে আরও পনেরো দিন বাদে সোনালি বিশ্রান্তওয়ারি পুলিশ স্টেশন থেকে ফোন পায়। পুলিশ জানায় সোনালির হাজব্যান্ড মিস্টার রাকেশের সঙ্গে সোনালির শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ লাগিয়ে এফ আই আর করেছেন। উনি ওখানেই বসে আছেন। সোনালিও ছেলে নিয়ে পুলিশ স্টেশনে যায়। পুলিশ সব শুনে হাজব্যান্ডকে বলে, ''পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করে কি লাভ? মিটমাট করে নিন, সুখে-শান্তিতে থাকুন।'' কিন্তু উনি তাতে রাজি হন না।

সোনালিকে বলি, ''তোর দেওর আমার মতো কুরূপা বউদি পেলে আর পেছনে পড়ত না। তোর রূপই তোর কাল হয়েছে।''

''আর বলিস না,'' ন্যাকামি মারা উত্তর দেয় সে।

''সন্দীপ সুন্দর মেয়েদের খুব পছন্দ করে। তোর সঙ্গে প্রস্তাব দেব নাকি?''

গম্ভীর হয়ে যায় সোনালি। বলে, ''আমি জানি আমার ছেলেমেয়ে ভবিষ্যতে আমাকে দেখবে না তবু বিয়ে আমি আর করব না। আমি চাইব না যে ছেলেমেয়েরা কখনও আমাকে এমন কথা বলার সুযোগ পাক যে মা নিজের স্বার্থের জন্য আমাদের অবহেলা করেছে।''

সন্দীপের সঙ্গেও আমি একই মজা করতেই সে বলে, ''না না, আমি শুধু তোমাকে চাই।'' হঠাৎ ফাজিল হয়ে যায় সন্দীপ, ''তুমি কি শেষে ঘটকালী করতে নেমে গেলে?''

''তুমি মাঝে মাঝে তোমার পছন্দ নিয়ে এমন দৃঢ়তা দেখিয়ে ফেল যে আমার আত্মবিশ্বাস লোপ পায়। সোনালি দেখতে সুন্দরী। ওর হাইট ভালো এবং বিশ্বস্তও। ও তোমাকে কখনও ঠকাবে না, সে নিশ্চয়তা আমি তোমাকে দিতে পারি।''

''তুমি কি গ্যারেন্টর হবে?'' আবার ফাজলামো।

''ইয়েস।''

বিয়ে করে, ছেলেমেয়েদের জন্ম দিয়ে, বরের কাছ থেকে ঝাড় খেয়ে অনেকবছর ধরে সুতপা, সোনালি, অনিন্দিতা, আমি সবাই সন্ন্যাসিনীর জীবনযাপন করছি। ত্যাগ নিয়ে বাচ্চা পালন করতে করতে ত্যাগ এবং সংযমের প্রতীক হয়ে গেছি আমরা। সোনালি বলে, ''দেখিস সংযমের জন্য আমাদের গিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম উঠে যাবে।'' অনিন্দিতার বক্তব্য অন্যরকম, ''আমার খুব সেক্স করতে ইচ্ছে করে। আমি মনের মতো একজনকে পেলে পাঁচ মিনিটেই তার সামনে জামাকাপড় খুলে ফেলতে পারব।''

''এত সাহসী?''

''নিশ্চয়! ছেলেরা পারলে আমরা কেন পারব না? লোকচর্চার ভয় আগে ছিল। এখন নেই। অনেক বছর তো দেখলাম। কেউ একবারও কি একটা মেডেল হাতে ধরিয়ে দিয়েছে? বলেছে কি এই নে অনিন্দিতা তোর সংযমের পুরস্কার?''

আমি চুপ।

''বল দিয়েছে কি?''

''আমি কি করে জানব কেউ তোর হাতে মেডেল ধরিয়ে দিয়েছে কি দেয়নি?''

''তোকে দিয়েছে?''

''না।''

''আমাকেও দেয়নি। তাহলে এরকম সন্ন্যাসিনী হয়ে জীবনযাপন করার কোন মানে হয় না।''

''তুই কি কারও সঙ্গে কিছু করেছিস?''

''জানি না।''

'তোর উপর কোন পুরুষ চড়ল কি চড়ল না তুই বুঝতে পারিস না?''

''হা হা হা,'' হাসে অনিন্দিতা। ''এখন বলব না।''

সুতপার বন্ধু লাট্টি আসানসোলেই থাকে। নাম শুনে বোঝা যায় না সে ছেলে না মেয়ে। আমি জেনেছি ছেলে। সে সুতপাকে আসানসোলে যাওয়ার জন্য ট্রেনের টিকিট করে দেয়, যাওয়া না হলে টিকিট ক্যান্সেল করে দেয়, আসানসোলে সুতপার মা-বাবার অল্পস্বল্প দেখাশোনা করে, মানে ওঁদের শরীর খারাপ হলে ওষুধ কিনে দেয়, বাজারহাট করে দেয়। লাট্টি সুতপাকে বলেছে, ''তোর নিচেরগুলো সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। গড়বড় হয়েছে কিছু।''

''কোন গড়বড় নেই। হুসু হচ্ছে ঠিকঠাক। আর কি চাই!''

''আর অন্যটা?''

''অন্যটা ঠিক আছে কিনা পরে যে আসবে সে দেখে নেবে। চালু থাকলে ভালো, না হলে ডাক্তারের কাছে সে-ই নিয়ে যাবে।''

পরে কে আসার আছে সুতপার জীবনে তা আমি অনিন্দিতার কাছে বেশ কয়েকবার জানতে চেয়েছিলাম। ওদের মধ্যে মাঝে মাঝে ফোনে কথাবার্তা হয় তাই। অনিন্দিতা

বলেছে সে জানে না। সুতপা যদি কিছু মনে করে এই ভয়ে সে জিজ্ঞেস করতে পারছে না। শেষে আমিই একদিন সুতপাকে জিজ্ঞেস করলাম। বলব না বলব না করে শেষে বলেই ফেলল হায়দেরাবাদে সমীরণ নামে তার এক বন্ধু থাকে। হোয়াটসআপের স্কুলমেটদের গ্রুপে কয়েকজন বহিরাগতের মধ্যে সমীরণ একজন। সেখানেই আলাপ। তুই করে কথা হয়। সমীরণের নাকি ডিভোর্সের কেস চলছে। সমীরণ সুতপাকে নিয়মিত মেসেজিং এবং মাঝে মাঝে ভিডিও কল করে। ভিডিও কলের পুরো সময়টাতে সুতপা একেবারে ভি আই পি মেজাজে থাকে—আর কারও কথা ভাবে না, কারও কোন এমারজেন্সি বোঝে না। যেদিন অনিন্দিতা হতাশায় ফোনে কাঁদছিল সে সুইসাইড করে কিনা ভেবে খুব উদ্‌বিগ্ন হয়ে সুতপাকে অন্ততপক্ষে পাঁচবার কল করেছিলাম। প্রত্যেকবারই সে তার নম্বর ব্যস্ত করে দিয়েছে। সুতপা মনীষার একটি কলও রিসিভ করে না। অধিকন্তু সমীরণের সঙ্গে লাইনে থেকেই সে ওকে গালি দেয়, ''এই মাগীর মাথায় কি বুদ্ধি কম আছে? দেখছে বারবার লাইন কাটছি তাও বিরক্ত করছে!'' গালি মনীষা শোনে না, সমীরণ শোনে। সমীরণের সঙ্গে কথা শেষ হলে সুতপা দেখে মনীষার আঠারোটা মিস কল। কল ব্যাক করে জিজ্ঞেস করে, ''কি হয়েছে বাবু?''

''রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছি দিদি।''

''হায় সর্বনাশ! কোথায় আছিস বল। আমি এক্ষণি আসছি।''

''দিদি তুমি ঘরেই এসো।''

''কেন রে?''

''আমি সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে এসেছি।''

''সুস্থ আছিস। তাহলে পরেই না হয় আসব।''

''না এসো। কলঙ্ক মুভি দেখতে যাব।''

সুতপা বলে সমীরণ নাকি তাকে সিঁদুর পড়ার পারমিশন দিয়েছে। সমীরণ জেনেছে বিয়ে না করে সুতপা কারও সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে যাবে না। কারও রক্ষিতা হয়ে থাকবে না। বিয়ে করব করব করে প্রেম ভালবাসার কথা পাড়লে তা আর তার সহ্য হবে না। অনেক দুনিয়াদারি দেখেছে সে। দেখে দেখে রীতিমত উত্যক্ত হয়ে আছে।

ওকে বলি, ''ভালো কথা তো। অন্ততপক্ষে এই লোকটি তোকে স্ত্রী-র মর্যাদা দিল তাহলে?''

''ধ্যুর, ছাড় তো! ওই যে বলেছি না, প্রেম না বাল ড্যাশের তাল?'' প্রবাদ বানানোর ক্রেডিট নিতে চায় সুতপা। কিন্তু এখন আর চোদার তাল বলে না। শব্দটা আমার কানে বাজে তাই। বদলে অন্য একটা কঠিন বাস্তবকে তুলে ধরে সে, ''আরে শালা, সেক্স তো পাঁচ মিনিটের খেলা। খেলা শেষ হলেই তুই পোঁদ ফিরিয়ে শুয়ে পড়বি, আমিও পোঁদ ফিরিয়ে শুয়ে পড়ব। দিনের বাকি সময়টা কি নিয়ে কাটাবি? সেক্স-এর এত আদিখ্যেতা কীসের? মনটা বোঝ!''

''এত রাগছিস কেন? বেচারা সত্যি সত্যিই তোকে ভালবাসে।''

''শুধু সিঁদুর পরার পারমিশন দিয়েছে। সিঁদুর তো পরায়নি! না আমার ডিভোর্স হয়েছে না ওর। আমাদের রেজেস্ট্রি ম্যারেজ হয়নি। হবে কিনা আদৌ তারও কোন

নিশ্চয়তা নেই...”

“তাহলে ওর সঙ্গে এত কথাই বা বলছিস কেন?”

“ওই ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে রাখছি আর কি! কার পরিবর্তে কতটা কি করা উচিত তার হিসেব আমার কাছে আছে।”

আমি রিলিকে সুতপার প্রবাদবাক্যটি আগেই শুনিয়েছিলাম। তবে ওই শব্দটা উচ্চারণ করতে পারিনি। বলেছি ফাকিং। অশ্লীল বাংলাগুলো ইংরেজিতে বললে শুধু সহনীয়ই মনে হয় না কখনও কখনও শ্রুতিমধুরও লাগে। মনে হয় ওগুলো গালিগালাজের স্ট্যান্ডার্ড বাড়িয়ে দিয়েছে। রিলি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, “ফাকিং-এর বাংলাটা কি?”

“বলতে পারব না।”

“সুতপা নিশ্চয় বাংলাতেই বলেছে?”

“হ্যাঁ।”

“তুমি তো এসব সত্যি ঘটনা নিয়ে বই লিখছ। সেখানে মেনশন করতে পারবে তো?”

“না মনে হচ্ছে রে।”

“না, লেখো। ফাকিং বললে প্রবাদটা ঠিক জমছে না।”

“বাংলাটা লিখলে খুব খারাপ হবে না?”

“খারাপ হবে কেন? যেটা যেমন সেটাকে তেমনভাবেই বর্ণনা করতে হয়। ফাকিংকে কিসিং বললে চলবে না এবং যেহেতু বাংলাতে লিখছ তাই সেখানে এত বেশি ইংলিশ শব্দ ব্যবহার করলেও চলবে না। অনেক পাঠক বুঝতেই পারবে না। তাছাড়া ওয়ার্ড ম্যাচিং-এর ব্যাপারটাও দেখতে হবে।” বাংলার বাইরে বাংলা নিয়ে পড়ার সুযোগ না পাওয়ায় রিলির কথাবার্তায় ইংরেজি শব্দ বেশি চলে আসে কিন্তু বাংলাকে সে খুব পছন্দ করে এবং আমার সংস্পর্শ থাকায় ভাষাকে সে অনেকটা দখলে নিয়েও নিয়েছে। তবু রিলি এখনও ফাকিং-এর বাংলা জানে না, কারণ আমার মুখে সে কখনও তা শোনেনি এবং সুতপা আমাকে প্রবাদটি নিচে পার্কিং-এ গিয়ে বলেছে। আমি রিলিকে বলি, “মানেটা অনেকটা হিন্দির মতো। বুঝে নাও। আর বলতে পারব না।”

সন্দীপ মাঝে মাঝে মহিলাদের চেহারা নিয়ে অশোভন মন্তব্য করে। একজন মহিলা হিসেবে আমি তখন নিজেকে তাদের জায়গায় দেখতে পাই এবং অপমানিত বোধ করি। শুধু মহিলা কেন, পুরুষদেরও চেহারা নিয়ে উপহাস আমার পছন্দ নয়। আমার মনে হয় যে ব্যাপারে আমাদের হাত নেই সেই ব্যাপার নিয়ে এমন নেতিবাচক চর্চা নিজেদেরই ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে। কারও শরীরের গঠনকে উপহাস করার অর্থ হল নিজের মানসিক প্রতিবন্ধকতাকে তুলে ধরা। শারীরিক বিকাশ নিজের হাতে নেই। আমরা যা করতে পারি তা হল আমাদের মানসিক পরিস্ফূরণ। সেটাই যদি না করলাম তাহলে আর বড় হলাম কোথায়!

সন্দীপ যদি বলে বিয়ের প্রশ্ন না এলে মহিলাদের শরীরের গঠন নিয়ে সে কোন

মাথাব্যথা রাখে না তাহলেও উত্তরে আমার কিছু বলার থাকবে—আমার মতো মহিলারও সন্দীপের মতো পুরুষকে বাতিল করার অনেক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু আমি যদি তা না করি তার মানে এই হয় না যে সন্দীপের চেহারা, অর্থনৈতিক অবস্থা, চাকরি, কোয়ালিফিকেশন ইত্যাদি আমার কাছে খুব গ্রহণযোগ্য। বাতিল না করার অর্থ এটাও হতে পারে আমি মেনে নিয়েছি। একটি শান্তিপূর্ণ সংসারের আশায়। যেমনভাবে মেনে নিয়ে তার বোনেরা সংসার করছে। তাদের এবং তাদের হাজব্যান্ডদেরও পরস্পরের সবকিছু নিশ্চয় খুব গ্রহণযোগ্য নয়। তবু তারা একসঙ্গে রয়েছে, তাদের সংসারে ভাঙন ধরেনি। আর এমনভাবে তুলনা করলে বলতে হবে মা-বাবার পরিবারের সব সদস্যদের মধ্যে একমাত্র সন্দীপই তার পরিবার বাঁচিয়ে রাখতে অক্ষম হয়েছে। অক্ষম হয়েছি আমিও। কিন্তু এই অক্ষমতার জন্য আমাকে দায়ী করা যায় না। রাজা আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্যতার জায়গাতে বারি মেরেছে। তাই তাকে আমি আর স্বামী বলে মানতে পারিনি। কিন্তু তাই বলে তার সঙ্গে আমি যোগাযোগ বন্ধ করিনি। তার থেকে রিলিকে আলাদাও করিনি। আজ যদি এই বয়সে এসে পরম শান্তির আশায় সন্দীপ এবং আমার মতো পুরুষ বা মহিলারা নতুন কোন জীবনসাথী খুঁজতে বসেছে তখন তারা চেহারা, শারীরিক সুখ নিয়ে এত ভাববে কেন? সন্দীপ আমাকে প্রায়ই বলে ওর মনে হয় ইটারনাল ব্লিস সে আমার কাছ থেকেই পেতে পারে। যদি তার এই মনে হওয়াটা ভেতরের অনুভব থেকে হয় তাহলে বলব সত্যিই তাই, চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে ইটারনাল ব্লিস হাজব্যান্ডকে উৎসর্গ করার ক্ষমতা আমি রাখি। কিন্তু সেই হাজব্যান্ড যদি সন্দীপের মতো লোক হয় তাহলে তার কতখানি গ্রহণ করতে পারবে সেটাই ভাবার বিষয়। সন্দীপের চাওয়াগুলো মাঝে মাঝে এতটাই বিপরীতধর্মী লাগে যে আমার মনে হয় সে ইটারনাল ব্লিসের মানেই জানে না, কি করে তাকে পেতে হয় জানে না, কি করে তাকে আজীবন ধরে রাখতে হয় জানে না। ইটারনাল কথাটার মধ্যে চিরস্থায়ী, শাশ্বত, অনাদি, অনন্ত ইত্যাদি অপার্থিব ধারণাগুলো লুকিয়ে আছে। সেই চিরস্থায়ী ভাবনা থেকে যে পরম সুখ আসে তাকেই বলে ইটারনাল ব্লিস। আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলনেই তা লাভ করা সম্ভব। আত্মা হল আত্মা। আত্মা কোন শরীর নয়। শরীরের মতো তার সৃষ্টি বা বিনাশ নেই। পার্থিব জগতের কোনকিছুই চিরস্থায়ী, শাশ্বত, অনাদি, অনন্ত হতে পারে না। মানুষের শরীরও সেই কোনকিছুর মধ্যে একটা। আমার মনে হয় সন্দীপের মহিলাদের বহিরাকৃতির প্রতি মোহ এবং শারীরিক সুখের চাহিদা তাকে তার চিরস্থায়ী পরম সুখের চাহিদার সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে সমান্তরালভাবে পা ফেলতে দিচ্ছে না। আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছি, আমি তাকে অনেক সময় দিয়েছি তার চাওয়া নিয়ে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করতে এবং আমাকে তা বোঝাতে কেননা আমি তাকে শুধু ভালোই বাসি না, অধিকন্তু তার বুদ্ধিমত্তাকে সম্মানও করি। আমি মনে করি বুদ্ধিমান হলেও এখানে সে ভুল করেছে, তবে চাইলেই সেই ভুলের সংশোধন সে করতে পারে।

আমার এত বড় বিশ্লেষণের খুব ছোট জবাব দেয় সন্দীপ, ''তুমি যা ভাবো।'' কিছুই স্পষ্ট করে বলে না।

আমি বলি, ''তার কাছেই হেরে যেতে ভালো লাগে যে হারিয়ে দিতে পারে।'' সেদিন সে আমার জামার গলা নামিয়ে যেভাবে যুক্তি দিয়ে আমাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল তাতে অসাড় হয়ে গিয়েছিল আমার মন, প্রতিবাদ করার ক্ষমতা লোপ পেয়েছিল তার। কিন্তু আজ আমি খুব শক্ত করে সন্দীপের মনের ভাঙা জায়গাগুলোকে ধরে ফেলেছি। বলছি, ''আজ মনে হচ্ছে তুমি আমাকে হারাতে পারবে না।'' মেসেজে আমার তুমি সম্বোধন এসে যায়।

আবার সে লেখে, ''তুমি যা ভাবো।''

''তুমি এত ভালো হয়েও সন্দীপ...জানি না কেন এমন হল।''

''আমিও সত্যিই জানি না। কিন্তু আমি একজন সুখী মানুষ।''

''তুমি তর্ক করো না। অ্যাফেকশনেটলি কথা বলো। ইউ...ইউ...ইউ আর আ ভেরি কুল ম্যান...ইউ...আই ডোন্ট নো হোয়াট ইউ আর। ইউ আর আ ম্যাড।''

সন্দীপকে কুল ম্যান আমার চেয়ে অনিন্দিতা বেশি মনে করে। বলে, মালটা তো একদমই রাগে না রে। ওর বউ ওকে কেন ছাড়ল তাহলে! সন্দীপ আমার কথা থেকে কুলটা ছেড়ে ম্যাডটাকে উঠিয়ে নেয়। বলে, ''ইয়েস, আই অ্যাম আ ম্যাড পার্সন।''

''ম্যাড পার্সনের ওপর নির্ভর করা যায় না।''

''ভেরি ট্রু।''

''তুমি কি এই কয়েকটা কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে? তুমি আসলে খুব চালাক?''

''আই অ্যাম আ পুওর ফেলো।''

চালাক প্লাস পুওর ফেলো।

রিলির জন্য সামনের মাসে একটা আনন্দের ধামাকা অপেক্ষা করছে। সাংহাই ভ্রমণ। আমার মনে হচ্ছে সন্দীপ সঙ্গে গেলে খুব মজা হত। কিন্তু এবার এত তাড়াতাড়ি তা সম্ভব নয়। আমাদের টিকিট হয়ে গেছে। পরের বার তো সম্ভব হতে পারে। সন্দীপকে বলি, ''হে পুওর ম্যান, তোমার পাসপোর্ট রেডি রাখো।''

সে বলে, ''আমার পাসপোর্ট নেই। আমার অফিস থেকেই বাইরে যাওয়ার অনেক সুযোগ আসে।''

''কিন্তু পাসপোর্ট তোমার নিজের জন্যই রেডি রাখো। তোমার আনঅফিশিয়াল ট্যুরের জন্য।''

''আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম কিন্তু তারা বলেছে তারা হ্যাপি পুওর ম্যানকে ইস্যু করবে না।''

আমি জানি সে এখন অফিসে। ওর বদমাশি দেখে ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। জিজ্ঞেস করি, ''কি করছ?''

''কিছু না।''

''ফোনে তোমাকে তুমি করে বলব।''

''সামনাসামনি?''

''আপনি।''

মেসেজেই আমাদের কথাবার্তা চলতে থাকে। দশ পনেরো মিনিটের বিরতি দিয়ে দিয়ে, আমি ল্যাপটপ নিয়ে লিখতে বসি। ব্রেন লেখা নিয়ে কিছু ভাবার মতো অবস্থায় নেই। ব্রেন হাতকে লেখার নির্দেশ দিতে পারছে না তাই হাত ল্যাপটপের কি বোর্ড থেকে ছুটি নিয়ে বসে আছে। নিজের কাজ করছে সে মোবাইলের কি প্যাডে।

বড় বিষণ্ণ লাগে। ২০১৯-এর লোকসভার নির্বাচনের আগে দেশের বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি বেশ উত্তাল হয়ে উঠেছে। বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেসকে অনেকটা পেছনে ফেলে পশ্চিমবঙ্গে এবার লড়াই মূলত তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে। বিভিন্ন সংস্থা নেমে পড়েছে জনমত সমীক্ষায়। কোন বেসরকারি টি ভি চ্যানেলও নাকি লোকসভা ভোটের সম্ভাব্য ফলাফল জানিয়ে দিয়েছে। সমীক্ষা হিসেবে বাংলায় বিয়াল্লিশটি আসনের মধ্যে বিয়াল্লিশটিরই লক্ষ্য রেখেছে তৃণমূল। বিজেপি রেখেছে তেইশটি আসনের টার্গেট। রাজ্যের দখল তৃণমূলের হাতে থাকবে নাকি বিজেপির হাতে যাবে তা নিয়ে চর্চা চলছে সর্বক্ষণ। কান না পাতলেও চারিদিক থেকে ভোটের আলোচনা কানে ঢুকে পড়ছে। এর মাঝখানে পুনের ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর আমায় বলে কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজের সামনে বিদ্যাসাগরের মূর্তিটিকে নাকি অমিত সাহার রোডশো-এর সময় আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সন্দীপ এসব খবর আমাকে দেয় না। সে নিশ্চয় জানে না আমি বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রী ছিলাম। আমি যখন ওকে বলি আমার কলেজ পুড়ে গেছে সে বলে, ''বাংলা শেষপর্যন্ত কুকুরের মুখে গিয়ে পড়বে। যতসব অশিক্ষিত লোক এখানে। অ্যাবসলিউট পাওয়ার করাপশন...''

সারাটা বিকেল সন্দীপের সঙ্গে টুকরো টুকরো কথা বলে মন আমার ভালো হল না। লেখা একটুও এগোল না, স্নান হল না, খাওয়া হল না। মনের বিষণ্ণতা উদাসীনতায় পরিবর্তিত হল। উদাসীনতা জাগিয়ে দিল অন্তরিন্দ্রিয়কে। সন্দীপকে আমার নিজের ঘরের মধ্যে পেতে ইচ্ছে করল। একেবারে পাশে। মন চাইল সে আমায় ভীষণ ভালবাসুক, আমার ভীষণ যত্ন করুক, ভীষণ খেয়াল রাখুক। কিন্তু যেহেতু তাকে পেলাম না, অবিলম্বে পাওয়ার কোন আশা দেখলাম না, বুঝলাম না অপেক্ষা কখন কিভাবে তার জন্য আমার ঘরের দরজা খুলে দেবে অথবা আমার জন্য তার ঘরের দরজা আশা নিভতে নিভতে শূন্যতে গিয়ে পৌঁছল। তৈরি হল নিরাশা। মনে হল এই নিরাশা নিয়েই আমাকে কাটিয়ে দিতে হবে বাকি জীবন। সুতরাং পৃথিবীর কারও কাছ থেকে আর চাওয়া পাওয়ার ইচ্ছে না রাখাই উচিত। ইচ্ছে না রাখলেই সুখে থাকব। এমন সুখে থাকার জন্যই তো আগে মনকে শক্ত করে বেঁধে নিয়েছিলাম। সেই সুখের জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে সন্দীপ আমাকে পরম সুখ দিয়ে পরম সুখ পাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। আমি সন্দীপকে লিখি, ''ঘৃণা করো আমাকে সন্দীপ, ঘৃণা করো। তাহলেই আমি খুশি হব।'' সে বলে, ''ঘৃণা অনেক সমস্যার তৈরি করে...।''

''আমি তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাব। নিঃশব্দে। তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই...।''

''নীরবতা মুখের কথার চেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী...''

''কিন্তু আমার মনে হচ্ছে নিঃশব্দে হারিয়ে গিয়েই আমি অনাদি সুখ পাব...''

''এভাবে মরীচিকার পেছনে ছুটে তুমি আসলে কোথাও পৌঁছতে পারবে না...''

''আমি এখন তর্ক করার মেজাজে নেই। তুমি শুধু আমাকে ঘৃণা করো। ব্যস, আর কিছুই চাই না...''

''ঠিক আছে...''

''গুড বয়।''

বোঝাপড়া হয়ে গেল আমাদের। তবু সন্দীপ থামল না। একটি ঘণ্টার জন্যও সে শুধুমাত্র ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ নিয়ে সন্তুষ্ট রইল না। নিঃশব্দে হারিয়ে যেতে থাকা আমার হাত টেনে ধরল সন্দীপ। লিখল, ''আমিও তোমার কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম কিন্তু সেখানে আর পড়া হয়নি।''

''কেননা তুমি নিজেকে পরে জিনিয়াস প্রমাণ করেছ। সেইজন্যই তো আমি বলেছিলাম যে আমি তোমার যোগ্য নই।''

''আই অ্যাম আ পুওর ফেলো।''

''কেন?...এগ্রীড...হা হা হা...আমি যেহেতু মেনে নিয়েছি আশা করি এর পরে তোমার আর কখনও এমন বিনয় দেখানোর দরকার পড়বে না।''

''ওকে বাবা।''

''আমার এখনও পর্যন্ত দুপুরের খাবার হয়নি।''

''নিজের যত্ন নাও।''

যত্ন...যত্ন...যত্ন। যত্ন, খেয়াল, ভালবাসা। আবার তৈরি হল আশা। আবার আমার সন্দীপের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করল। আবার জিজ্ঞেস করলাম ওকে, ''কি করছ?''

অনেক কথা বলে ভুলে যায় সন্দীপ। ঘণ্টাখানেক বাদে বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরে সে লিখল, ''তুমি কি করে জানলে যে আমি আই আই টি থেকে গ্রাজুয়েশন করেছি? আমার তো মনে পড়ছে না আমি তোমাকে বলেছি বলে।''

''তুমি তাই ভাবছ...ঠিকই ভাবছ...আমি অনুমান করেছি তাহলে। যাই হোক, আমার দাদার এক বন্ধু কানপুর আই আই টিতে পড়তে গিয়েছিল। শুনেছিলাম ওখানে ওকে খুব বাজেভাবে র‍্যাগিং করা হয়েছে—ব্লেড দিয়ে পিঠ চিরে ওর বিশাল বড় নামটি লেখা হয়েছে।''

''আই আই টিতে সাধারণত এই ধরনের র‍্যাগিং হয় না। এটা তাহলে কোন ব্যতিক্রম হবে।''

''ঠিক জানি না...শুনেছি...আমাদের বাড়ির কাছাকাছি ওর বাড়ি ছিল।''

''হতে পারে। তাহলে যারা র‍্যাগিং করেছে তাদের শাস্তিও নিশ্চয় হয়ে থাকবে।''

''ছাড়ো। আমাদের নিজেদের অনেক সমস্যা আছে।''

সেই রাতে ডিনারের পরে আমি কিছু অসংলগ্ন কথা বলেছি সন্দীপের সঙ্গে। বলেছি, ''কলকাতায় আমার একটা ফ্ল্যাট কেনার ইচ্ছে। বস্তুত আমি ফ্ল্যাটের টাকা জোগাড়

করতেই পুনেতে এসেছিলাম। এসে স্বেচ্ছায় শারীরিক অসুস্থতা টেনে ফেঁসে গেছি।" বলেছি, ''আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টের ইনবক্সে লোকজন বড় বিরক্ত করে, তোমাকে পাসওয়ার্ড দেব তুমি সামলাও।" তাতে সন্দীপ আপত্তি করেছে, ''তোমার অ্যাকাউন্ট তোমারই সামলানো উচিত।" বলেছি, ''এই মহিলাটি বড় সাদাসিধে, এ সেই মেয়েটিরই ক্লোন যাকে তোমার ভালো লেগেছিল।" সে বলেছে, ''আমি জানি।" আমি জানি সন্দীপ খুব ভোরে উঠে পড়ে, তারপর আমাকে গুড মর্নিং করার পালা সেরেই ভিডিও কল করার জন্য জোর করে, তবু জিজ্ঞেস করি সকালে কটায় ঘুম ভাঙ্গে ওর। বলি আমি কটায় উঠি। রাতে গুড নাইট লিখেও কল করতে বলি। কল করতে বলেও দ্বিধা হয়—হয়ত ওকে বিরক্ত করছি, হয়ত সে কোন কাজ ব্যস্ত আছে। তাই পরক্ষণেই বলি, কল করতে হবে না। তবু সে আমাকে কল করে। সেও বলে অসংলগ্ন কথা।

ভোর চারটে সাতান্নতে আমার মোবাইলে সন্দীপের গুড মর্নিং ঢুকে পড়ে।

লিখি, ''ভালো লাগছে না।"

''কেন?"

''কালকে কি সব মাথামুণ্ডু ছাড়া কথা বললাম।" পরিণত আমি সবসময় যুক্তি দিয়ে কথা বলতে অভ্যস্ত। আবেগ সব মানুষেরই আছে। আমারও আছে। কিন্তু আমার আবেগ একেবারে ভিত্তিহীন আবেগ নয়। মনের কোন কোণে কিংবা হৃদয়ের মাঝে জন্ম নেওয়ার পর তাকে যুক্তি দিয়ে ঘষে মেজে তবেই গন্তব্যস্থলের দিকে চালিত করা হয়। এত পরিণত হয়েও কখনও কখনও কেন জানি না এত অপরিণত হয়ে যাই। যখন অপরিণত হই তখন ছেলেমানুষের মতই কথা বলি। বেশি বেশি কথা বলি। সামঞ্জস্যহীন এবং অর্থহীন কথা। লোকের মুখে শুনি পরিণত মানুষদের মাঝে মাঝে ছেলেমানুষ হয়ে যাওয়ারও প্রয়োজন আছে। তাতে তাদের মন হাল্কা হয়, শরীর-স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং আয়ু বাড়ে। কিন্তু এমন মন হাল্কা করে আয়ু বাড়ানোর পরে আমি লজ্জা পাই। মনে হয় আমার ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়ে গেছে। সন্দীপ বলে, ''লজ্জার কিছু নেই, কাল রাতে দু'জন ড্রাঙ্কার্ড কথা বলেছে। ড্রাঙ্কার্ড জানে রাত পেরিয়ে সকাল হবে। শুরু হবে একটি নতুন দিন।"

''তাহলে আবার প্রথম থেকে শুরু করি। যেন আমাদের আগে কখনও পরিচয় হয়নি।"

সে বলে, ''আজকের পুনে থেকে কলকাতায় প্লেনের ভাড়া সাত হাজার। একদমই বেশি নয়।"

''সন্দীপ, আমি তোমার সামনে দাঁড়াতে দ্বিধা বোধ করব।"

''বসতে দ্বিধা হবে না তো?"

''এই জন্যই তো আমি বলি ইউ আর রিয়ালি ইমপসিবল। সম্ভবত আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতেই পারব না। সাহস হবে না।"

''ঠিক আছে। আজকাল সবকিছুই হোয়াটসআপে হয়ে যায়।"

''তুমি যাই-ই বলো, আমি আমার জীবনধারাতে খুব স্বচ্ছন্দ। একা...কোন বন্ধুবান্ধব ছাড়া...পাশে কাউকে না নিয়ে। ইউ আর আ ভেরি পাওয়ারফুল পার্সন। তুমি আমাকে

প্রায় চেঞ্জ করে দিয়েছ। কিন্তু সন্দীপ আমি এতটা আলাদা হয়ে বাঁচতে পারব না।"

"কল করো।"

"না।"

"কোন না নয়। করো কল। কলকাতায় এসো।" সে জানে আমার শরীরের অবস্থা, তবু কলকাতায় আসার জন্য ক্রমাগত পেছনে পড়ে। লাইপোসাকশনের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা কমপ্রেশন জ্যাকেট পরে থাকতে হয় আমাকে। দু'মাস পর্যন্ত দিনে এক ঘণ্টার বেশি ওটাকে খুলে রাখা ঠিক হবে না। সেই একঘণ্টা ম্যাসাজ, এক্সারসাইজ এবং স্নান করতে অতিবাহিত হয়ে যায়। দু'মাস পরে আমার পেটের অবস্থা বুঝে ডাক্তার বলবেন আর কতদিন পরতে হবে নাকি পরতে হবে না। ডাক্তার না পরতে বললেও রিলির মতে অন্ততপক্ষে আরও একমাস দিনের বেশিরভাগ সময় আমার কমপ্রেশন জ্যাকেট পরে থাকা বিধেয়। রিলির পরামর্শকে আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না কেননা এব্যাপারে ওর নিজের অভিজ্ঞতা আছে।

"নোপ। এখন কলকাতায় আসা যাবে না।"

"নোপ...না...হোপ?"

তোমার সঙ্গে দেখা করতে তো আমার ভীষণ ইচ্ছে করে সন্দীপ। কিন্তু আমার মন বলে আমি তোমার সামনে এলে তুমি আমায় ছাড়বে না। তোমার সম্মোহন ক্ষমতা আমাকে একবারে দুর্বল করে দেবে। কখনও ধীর স্থির ব্যক্তিত্ব দিয়ে, কখনও কাছে আসার ব্যাকুলতায় চঞ্চল ব্যক্তিত্ব দিয়ে আমার প্রতিবাদী দুর্বল মুখের সব গালিগালাজ সহ্য করবে, এমন এমন যুক্তি পেশ করবে আমার সামনে যে আমার পারসেপশন আমাকে লজ্জা দেবে। মনে হবে তুমিই ঠিক বলেছ। তোমার ভালবাসার মোহে, তোমার সঙ্গে সারাজীবন কাটাতে পারার আশায় ডুবে যাব আমি। একসঙ্গে ডুবলে তো ভালো, ডুবে বাঁচলেও ভালো, মরলেও ভালো কিন্তু ডুবে যদি আমি আবার তোমার থেকে অনেক দূরে গিয়ে স্রোতের মাঝখানে ভেসে উঠি তাহলে কি হবে! তবু কলকাতায় যেতে তো আমাকে হবেই। হেরে গেলে তো চলবে না।

সন্দীপ আমাকে সাহস দেয়, "চা-ওয়ালা প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেল...এই দেশে সবকিছুই সম্ভব...তুমিও পারবে।" সাহস ভাঙা এবং সাহস গড়া দুটোতেই সে ওস্তাদ।

মনে জোর টানি, "না না খুব সহজ। আমি একদমই উদ্‌বিগ্ন নই।"

থাম্বস আপ পাঠায়।

"আমার বই পাবলিশিং-এর জন্য কলকাতায় আসার প্রয়োজন।"

"এখনই এসো।"

সন্দীপ যেহেতু বোনের সামনে আমাকে এড়িয়ে চলে জানতে ইচ্ছে করে একইরকমের ব্যবহার আমি ওর সঙ্গে করলে ওর প্রতিক্রিয়া কি হয়। তাই ওকে বলি, "তুমি কিন্তু কাউকে বলবে না যে তোমার সঙ্গে আমার এত কথা হয়েছে।"

"প্রমিস।"

প্রমিস তো করবেই। তুমি তো তোমার বোনকেই আমার সম্পর্কে কিছু বলনি।

"ইন ফ্যাক্ট, কাউকে বলারই প্রয়োজন নেই যে তুমি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনো।"

"আমি জানি।"

জানো তো বটেই। কত সহজেই তুমি এই গোপনীয়তাগুলো রক্ষা করে চলতে পারো। আমি পারি না। পারবও না। আমি কারও সঙ্গে ততটুকু সম্পর্কই তৈরি করি যতটুকু সম্পর্ক সবার সামনে স্বীকার করতে পারি। অনিন্দিতা বিলাসপুরে বসে দিনরাত তোমার খবর নিচ্ছে, পুনেতে সোনালি তোমাকে সেলিব্রিটি বানিয়ে ফেলেছে, তাপসদাও দেখছি বেশ আগ্রহ রাখছেন আমাদের সম্পর্কের প্রগতি জানার ব্যাপারে, এমনকি সুতপাও তার প্রেম না বালের প্রবাদকে ছুটি দিয়ে ডাউট ডট কমে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করছে, "লোকটি ঠিকই আছে বল?" এছাড়াও—এছাড়াও আমার স্কুল কলেজের বন্ধু-বান্ধবীরাও জেনেছে তোমার কথা। আমি যাকে গ্রহণ করি, সর্বসমক্ষে স্বীকার করে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করি। সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখতে তৃতীয়পক্ষের সঙ্গে লড়াই করে জেতার ক্ষমতা রাখি।

''আমাদের মধ্যে যা যা হয়েছে সব ভুলে যাও তুমি।''

কি বুঝে জানি না সন্দীপ অতি সহজেই বলে, ''ঠিক আছে। রিবুটেড।''

তিন মিনিট বাদেই সে আমাকে আমারই একটা ফটো পাঠায়। জিজ্ঞেস করে, ''মনে হচ্ছে এটা কোন ছোট শহরে তোলা হয়েছে। কোথায়?''

''জয়সলমীরে। গত শীতে ওখানে ঘুরতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা এখনও কেন কথা বলছি সন্দীপ?''

''কেন না তুমি আমার ভিডিও কল রিসিভ করনি।'' সকাল সাতটা উনিশ এবং সাতটা সাতচল্লিশে কল করেছিল সে।

সে আমার কথা কাউকে বলছে না এই অভিমান মনে চেপে রেখে মেসেজ করি,

''আমাদের এখন থেমে যাওয়া উচিত সন্দীপ।''

''লেট মী সি উ।''

''আমি এখন নাইট গাউনে আছি।''

''চলবে।''

''এত পাগল! তাহলে পুনেতে এসো। আমার ছোট গাড়ি তোমার পছন্দ নয় জানলে আমি নতুন গাড়ি কিনব।''

''আমি অনায়াসে টোটোও চালাতে পারি।''

''সরি, আমি তোমার জন্য টোটো কিনতে পারব না। কিন্তু তুমি আমার গাড়ি চালাতে পারো। আমি তোমার পাশে বসব। সারা শহর ঘুরব।''

অনিন্দিতা আজকাল বেশি সময় হোয়াটসআপে থাকছে। আমাকে ট্র্যাক করছে মনে হচ্ছে। আমার যে বেশ কিছুদিন ধরে ঠিকমত ঘুম হচ্ছে না সে খবরও আছে ওর কাছে। জিজ্ঞেস করছে, ''তুই কি এখনও মালটার সঙ্গে অনলাইনে?''

''না না, ওর আমার কথাবার্তার স্ক্রিনশট নিয়ে তোকেই পাঠাচ্ছিলাম।'' সে স্ক্রিনশট পড়ে আর মন্তব্য করে। মেয়েদের চেহারাকে বিদ্রূপ করায় সন্দীপকে যা ঝেড়েছিলাম তার পরিপ্রেক্ষিতে অনিন্দিতা বলে, ''একটু বেশি রুক্ষ হয়ে গেল নাকি? দেখ ও কিন্তু আর কিছু বলল না।'' সেদিন সকালে যখন সন্দীপ আমাকে ভিডিওতে দেখবে বলে আর ঘুমোতে দিল না, আমি বলেছিলাম তোমাকে খুব ভয় করে এবং সে

উত্তরে লিখেছিল বলল ভয় পাওয়াই উচিত—তার স্ক্রিনশট পড়ে অনিন্দিতা বলেছে, কত রোমান্টিক দেখ। অনিন্দিতার সঙ্গে আমার ফোনেও রোজ কথা হয়। সে খুব উদ্‌বিগ্ন হয়ে বসে থাকে আমার কাছ থেকে আর কি হল জানতে। আমি ওকে বলেছিলাম, ''সবকিছুই তালগোল মিলিয়ে ঠিকই আছে কিন্তু আমাদের মধ্যে বিয়ের কথা বিশেষ এগোচ্ছে না। আমি অসুস্থ বলে কলকাতায় এখনই যেতে পারছি না। নইলে সামনাসামনি বসে ফাইনাল আলোচনা করে নিতাম।''

''আলোচনা করে বেশি লাভ হত না।''

''কেন?''

''আমি বলছি হত না।''

''আরে কেন সেটা বলবি তো!''

''মালটা ওর বউয়ের কাছ থেকে ছাড়া না পেলে তোকে বিয়ে কি করে করবে রে?''

''তাই যদি হয় তাহলে ওর আমার সঙ্গে সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে ডিভোর্সের ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ভাবা উচিত এবং যাতে করে তা তাড়াতাড়ি মিটে যায় তার চেষ্টা করা উচিত। আমি তো আছিই। আমার মতো আরও কয়েকজন মহিলাকেও সে শর্টলিস্টেড করে রাখলেও চলবে। আমার ওকে খুবই ভালো লাগতে শুরু করেছে। কিন্তু তেমন হলে সরে আসব। সরে আসতে হবে আমাকে।''

''না, ও আর কাউকে শর্টলিস্টেড করবে না।''

''কি করে জানলি?''

''দেখছি তো সে তোকে গভীর ভালবাসে। বলছে তোকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না, নানাভাবে তোর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছে, কিস করতে চাইছে, সাজপোশাক, শরীর দেখানো নিয়ে তোর জড়তা কম করতে চাইছে। ব্রেস্ট, নিপল নিয়ে আলোচনা করছে।''

''দেখ অনিন্দিতা, আমার গন্তব্যস্থল হল ম্যারেজ ইনসস্টিটিউশন। সন্দীপরেও তাই হওয়া উচিত। সেখানে পৌঁছনোর আগে আমি ওর সামনে বেশি সহজ হতে পারছি না এবং সেখানে কিভাবে কবে পৌঁছানো যায় সেসব আলোচনায় না গিয়ে শুধু ভালবাসাবাসির কথায় কখনও কখনও রেগে গিয়ে উল্টো প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ফেলছি।''

''মালটা বুদ্ধিমান। ও তোর মতো তৈরি নয়। এখনও ডিভোর্স হয়নি বলে আটকে আছে বেচারা। তোর মনে নেই সে তোর জন্য বাথরুম নতুন বানিয়ে দেবে বলেছে—এর মানে তো বিয়েই হয় তাই না? যারা বুদ্ধিমান তারা কি কিন্তু ভীষণ রোমান্টিক হয় রূপা, রোমান্স আটকে রাখতে পারে না। তারা সবকিছুই হান্ড্রেড পার্সেন্ট চায়। তোকে ওর মধ্যে এই স্পার্কটাকে জাগিয়ে রাখতে হবে।''

সন্দীপ শেষপর্যন্ত আমাকে ফোন করে জানতে চাইল, ''তোমার বিয়েতে মেয়ের কোন আপত্তি নেই তো?''

''এটা আমার পার্সোনাল ব্যাপার। মেয়ের আপত্তি থাকার কথা নয়।''

''তবু ওকে জিজ্ঞেস করো।''

করলাম রিলিকে জিজ্ঞেস। রিলি বলে, ''ওকে বলো আমরা অনেক অ্যাডভান্সড।''

কথাটি আমি হুবহু সন্দীপকে মেসেজ করি। সঙ্গে আরও কিছু কথা জুড়ে দিই, ''আমাদের জীবন অনেক আলাদা। আমরা কারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করি না এবং খুব সংযত জীবন যাপন করি।''

আমি এত বছর বাইরে থেকেও, রিলি জন্ম থেকে বাইরে থেকেও আধুনিকতার কোন ছোঁয়াই যেন লাগেনি আমাদের গায়ে। আমাদের চা, বিড়ি, সিগারেট, মদের নেশা নেই। ক্লাব, পার্টিতে যাওয়ার নেশা নেই। প্রেমের নেশা নেই। আমাদের জীবনে শুধু কিছু প্রয়োজন আছে। আমাদের প্রত্যেকের জন্য একজন পুরুষ অথবা একজন মহিলার। এবং সেটা বুঝেই রিলি তার ট্রেডমিল থেকে নেমে গিয়ে গায়ের ঘাম টাওয়েলে মুছতে মুছতে চোখ বড় বড় করে কৃত্রিম গাম্ভীর্য নিয়ে আমার সঙ্গে মজা করে, ''মাম্মা আমি এখনও পর্যন্ত একজনকেও জোটাতে পারলাম না আর তুমি কিনা বেশ...বড় নিউজ হয়ে গেলে!''

সন্দীপ বলে, ''তোমার মেয়েকে বলো আমি একজন বুড়ো লোক।''

রিলি জানায়, ''চলবে।''

সন্দীপ বলে, ''আমার একবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে।''

রিলি মতামত দেয়, ''তাহলে তো এখনই একজন লাইফ পার্টনারের প্রয়োজন।''

সন্দীপ বলে, ''আমার ভাবনাচিন্তাও পুরনো।''

মোটেও তা নয়। পুনেতে থেকেও, অভিভাবকহীন মহিলা হয়েও তোমার চেয়ে আমি বেশি রক্ষণশীল। বলি, ''হ্যাঁ, কলকাতায় লোকেরা অনেক আলাদা।''

''আমি কলকাতার নই। তবু আলাদা।''

''আমার মেয়েই জোর করে আমার প্লাস্টিক সার্জারি করিয়েছে। সে বলে চেহারার যত্ন নাও এবং জীবনটাকে উপভোগ করো।''

''সেও প্লাস্টিক সার্জারি করিয়েছে?''

''হ্যাঁ।''

''প্লাস্টিক বডি।''

''কাইন্ড অফ।''

''আমি কেমন করে বুঝলাম বলোতো?''

সন্দীপের এই প্রশ্নে আমি লজ্জাই পেলাম। রিলি ইনস্টাগ্র্যাম করে। সে তার চেস্ট, ওয়েস্ট এবং হিপ সাইজ নিয়ে খুব সচেতন। তার ইনস্টাগ্র্যামের ছবির অনেকগুলোই অনেক খোলামেলা পোশাকে। পুরোপুরি পেশাদার সে। সন্দীপ কি দেখে বুঝেছে তার বিশ্লেষণ শোনার মতো মানসিক জোর আমার নেই। হয়ত খুব মার্জিত ভাষাতেই আমাকে বোঝাবে তবু। আমি বলি, ''সেও শুধু আমার মতো লাইপোসাকশনই করিয়েছে। রিলি জন্ম থেকেই সুন্দর।''

''হ্যাঁ, সে সুন্দর।''

''কিন্তু একটা কথা...''

''কি?...কি?...বলো আমাকে।''

''আমি যাকে বিয়ে করব তার সঙ্গে রিলি খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা নাও বলতে পারে কেনকি সে জানে না সে তার সঙ্গে বাবার মতো করে মিশতে পারবে কিনা।''

''ওকে এমন অনুভূতি দেওয়া খুব মুশকিল...বিশেষত এত দূরে থেকে। আমি যতদূর জানি সে কোন ছেলেকে বিশ্বাস করতে পারে না।''

''রিলি অনেক আগেই আমাকে অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। আমারও ওকে বলা আছে সে যদি তার হাজব্যান্ডকে নিয়ে সুখী না হয় তাহলে আমার কাছে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে একবার ধোঁকা খাওয়ার পরে কারও ভালমানুষির ওপর সে নির্ভর করতে পারছে না। ওর বন্ধুদের মধ্যে থেকেও কারও প্রস্তাবই সে গ্রহণ করছে না।''

''ওর সঠিক কাউকে পাওয়া দরকার না হলে একাই ঠিক আছে।''

মনে হয় সন্দীপ আমার মেয়ের সমস্যা বুঝে সঠিক সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করছে। এটা খুবই জরুরি। আমাদের বিয়ে হলে আমি নিশ্চয় চাইব আমার মেয়ের সামনে সে বাবার মতো ভাবনা-চিন্তা পেশ করুক। আমি তাকে রিলির আরও কথা বলতে থাকি, ''রিলি কখনও কখনও খুব ছেলেমানুষের মতো ব্যবহার করে...খুব স্বার্থপর লাগে...আমি ওর ফ্লাইটের টিকিটের টাকা ধারে দিয়েছি কিন্তু আমার মনে হয় রিলি সেই টাকাটা আমাকে ফেরত দেবে না...।''

আমাকে এখন সন্দীপের সঙ্গে কথা বন্ধ করা দরকার। একটু লোহেগাঁও এয়ার ফোর্স স্টেশনে যাব ভাবছি। সেটা জেনে সন্দীপ শুরু করে, ''সেখান থেকে ফ্লাইট ধরে চলে এসো কলকাতায়। তুমি সাংহাইতে গেলে আমি তোমাকে খুব মিস করব কেননা পাসপোর্ট নেই বলে আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারছি না।'' সে বলে আমিও নাকি রিলির মতো ছেলেমানুষি করি।

''তা করি সময়বিশেষে। আমি বেশিদিন বড় পরিবারে থাকিনি। রিলি তো কখনই থাকেনি। পরিবার-পরিজন থেকে আলাদা হয়ে এতদূরে থেকে আমরা স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের তৈরি করেছি। আমাদের সঙ্গে এখানে তুমি জীবনের এক অন্য স্বাদ পাবে—প্রশস্ত রাস্তাঘাট, চলাফেরার জন্য অপরিমিত জায়গা—একই সূর্য একই চাঁদ—তবু মনে হবে এখানে সূর্য অনেক বেশি দীপ্তিমান এবং চাঁদ কলঙ্কহীন, স্বচ্ছ ও নির্মল।''

''আর কি পাব? অ্যান্ড...?'' নিজের ফর্মে আবার চলে যেতে শুরু করে সন্দীপ।

''অ্যান্ড মানে?''

''অ্যান্ড মানে অ্যান্ড।''

''অ্যান্ড লটস অফ লাভ পাবে।''

''হাওয়াতে ভালবাসা...।''

নিজের মনকে বলি, *বলে তো দাও রূপা। আসুক আগে। এমনও তো হতে পারে তোমার এখানে এসে তোমার আতিথেয়তা পেয়ে, তোমার জীবনধারা দেখে সেসব কথা মন থেকে সরিয়ে দিল সে। তার নিজেরই মনে হল বিয়ের আগে এটা ঠিক নয়।* ''তোমার জন্য অ্যান্ড স্টাফ থাকবে সন্দীপ...!'' বলেই আমার ভয় করে। প্রসঙ্গ পাল্টে দিই। অন্য কথা হতে থাকে তবু ভয় আমাকে ছাড়ে না। ওকে সেই একই কথা বলি, ''আমি বোধ হয় তোমার উপযুক্ত নই।''

''তুমি উপযুক্ত কিনা তোমার মেয়ের সঙ্গে আলোচনা করে আমাকে জানাও।''

''আমি দেখতে ভালো না, আমার মধ্যে কোন সাধারণ জ্ঞান নেই, আমার আই কিউ কম, আমার টাকা নেই...কিছুই নেই আমার।''

''তার মানে সবকিছু প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। হার্ট...ফিলিংস...সবকিছু। হা হা হা।''

''হতেই পারে। তুমি তো কলকাতার মেয়ে খুঁজছিলে তাই না? ওদের মধ্যে সব কিছুই আছে যেগুলো আমার মধ্যে নেই। ওদের কাছে তুমি তোমার ভালবাসার আধুনিক সংস্করণ পেতে পারো।''

''হ্যাঁ, শুধু হিংসাপরায়ণতা...।''

সন্দীপের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার লোহেগাঁও-এ যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল হল। কিন্তু দিনের পরের সময়টাও খুব খারাপ কাটল। সন্দীপ বলল, বেঙ্গলি ম্যাট্রিমোনির মতো কোন একটা সাইট থেকে তার আরেকটি মহিলার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। মহিলার মেয়ের বয়স আঠোরো কি উনিশ। টিভিতে সিরিয়াল করে। মাকেও ফটোতে দেখতে ভালোই লেগেছিল। সন্দীপ খুশিতেই ছিল, সুশ্রী মায়ের সঙ্গে টি ভি সিরিয়াল করা মেয়েটিকে ফ্রীতে পাওয়া যাবে। বিনা ইনভেস্টমেন্টে নিজের দাম অনেক বাড়ানো যাবে কিন্তু সামনাসামনি মহিলাকে দেখে আবার হতাশা। মা-মেয়ের সামনেই সন্দীপ তার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ফেলেছিল। সেটা দেখে মায়ের চেয়ে মন বেশি ছোট হয়েছিল মেয়ের। সন্দীপ মেয়েটির কষ্ট লাঘব করার জন্য তাকে একটু আদর করে দিয়েছিল কিন্তু মাকে কদাপি আদর করার কথা সে একদমই ভাবতে পারেনি।

বারবার একইরকম ঘটনা সন্দীপের সঙ্গে ঘটছে। আমি বুঝতে পারছি জীবনসঙ্গী বাছার ব্যাপারে মহিলাদের রূপ নিয়ে সন্দীপের নাক উঁচু আছে। আমার নিজের ওপর ভরসা কমে যাচ্ছে। ভরসা যত কমছে সন্দীপের ওপর রাগ তত বাড়ছে। আমাকে না দেখেই, আমার চেহারাকে পছন্দ হবে কি হবে না তা না জেনেই সে আমার আবেগকে অতি দ্রুত তার হাতের মুঠোয় নিয়ে ফেলেছে। এমতবস্থায় তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলে বড় বেদনাদায়ক হবে আমার অবস্থা। সন্দীপ একদিন আমায় বলেছিল, ''ভাবছি তোমার সঙ্গে কথাবার্তা কম করে দেব।''

''কেন?''

''তুমি যদি হঠাৎ করে আমাকে ছেড়ে দাও তাহলে তো চোখের জলে বালিশ ভিজে যাবে।''

ওর মতো এত ভারি গলার এত বুদ্ধিমান লোক যে এতটা আবেগপ্রবণ হতে পারে একদমই অবিশ্বাস্য। জিজ্ঞেস করেছিলাম, ''তুমি কি সত্যিই কাঁদো?''

''না...এত সহজে কাঁদি না...তবু...''

''আমি কাউকে ছাড়ি না সন্দীপ।''

কি জানি নিজের কাঁদার কথাটা সেদিন হয়ত শুধু বলার জন্যই সে বলেছে। সন্দীপের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলে চোখের জলে বলিশ তো ভিজবে আমার।

এখনও পর্যন্ত টিভিতে সিরিয়াল করা একটিই মেয়ে এবং তার মায়ের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমি সন্দীপকে মেয়েটির নাম জিজ্ঞেস করি। সে বলতে পারে না।

জিজ্ঞেস করি, ''মহিলাটি ফটো থেকে কি এতটাই আলাদা ছিল?''

''হ্যাঁ।''

''এতটাই কুৎসিত?''

''হ্যাঁ।''

''কেমন দেখতে ছিল একটু বলবে?''

''তুমি কলকাতায় কখনও রাস্তা তৈরির কাজ দেখেছ...যেখানে পাথর বিছিয়ে দিয়ে তার উপর কালো পিচ ঢালা হয়...যেখান দিয়ে হাঁটতে গেলে পা আটকে যায়...?''

''হ্যাঁ দেখেছি। তো।''

''দেখেছ সেখানে রাস্তার ধারে ড্রাম রাখা থাকে যার মধ্যে পিচগুলো গরম করা হয়...?''

''হ্যাঁ, দেখেছি তো।''

''সেই ড্রামগুলো যেমন বেঁটে, কালো, গোল...যার মাথা, বুক, পেট, কোমর আলাদা করে বোঝা যায় না...সেরকম।''

সন্দীপের কথা শুনে আমার মাথার মধ্যেকার কালো পিচও গরমে গলে গিয়েছে। বৃষ্টির জলের মতো পড়তে শুরু করেছে সেই ঘন পিচ তার গায়ে। কি ভাবে সে নিজেকে! শৈবাল ঘোড়াই-এর ওপর ঝাঁপ দেওয়ার কথায় আমি ওকে হাল্কা মেজাজে হলেও বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে আমি একজন স্বয়ংসম্পূর্ণা মহিলা, আমি ছেলেদের মাইনের হিসেব রাখি না, তাদের টাকায় খাওয়ার আশায় বসে থাকি না, নিজের আজীবনের উপার্জনের ব্যবস্থা আমি করে নিয়েছি, যথেষ্ট ব্যাংক ব্যালান্সও আছে। সুতরাং আমার কারও ওপর ওইভাবে ঝাঁপ দেওয়ার কোন প্রয়োজন হবে না এবং সন্দীপ তা পড়ে লিখেছিল, ভেরি ট্রু। আমি তা জানি ডিয়ার। কিন্তু এখন গরম পিচ সন্দীপকে ভালমত বুঝিয়ে দিচ্ছে যে আমি আর হাল্কা মেজাজে নেই। আমি ওকে বলি, ''দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি তোমাকে বিয়ে করছি না।''

খুব স্বাভাবিকভাবে নিল সে আমার কথা। পাঠালো থাম্বস আপ।

''আমি যাকে বিয়ে করব তার অনেক কিছুই আমাকেও বিচার করতে হবে—মুখশ্রী, চেহারা, গায়ের রঙ, ব্যাংক ব্যালান্স। দেখতে হবে তার কোন মানসিক প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা, তার লাইফ স্টাইল কেমন। তাকে বিয়ে করে আমিও আমার পরিচয় খারাপ করতে পারি না, মানসিক শান্তি বিনষ্ট করতে পারি না, জীবনধারার মান নিচে নামাতে পারি না। হাজব্যান্ডের সঙ্গে গতানুগতিক জীবনযাপন মানে নরকবাস। আমাদের বাড়ির কেউই এমন জীবনের স্বপ্ন দেখেনি।''

সে লেখে, ''মানছি। তোমাকে বুঝেশুনে এগোতে হবে।''

''তুমি তো আমার অতীত জানো না। *আমি তোমাকে জানতে বলেছিলাম*। যদি বলি আমিও এর আগে দু'তিনবার ঘর বাঁধার চেষ্টা করেছি কিন্তু শেষপর্যন্ত তাদের কাউকেই আমার উপযুক্ত বলে মনে হয়নি?''

''ভেরি ডিফিকাল্ট...যে কারও সঙ্গে ঘর বাঁধা যায় না।''

সন্দীপ আমাকে তীর মেরেছে। সোজাসুজি না মারলেও আমি আহত হয়েছি।

তীর সে মহিলাটিতে মারতে চেয়েছিল কিন্তু সেটা বাঁকা থাকায় আমার গা ঘেঁষে গেছে আমার ত্বক ছিলে দিয়ে। যন্ত্রণায় আমি আ হা আ হা করছি আর সন্দীপ তাতে মলম না লাগিয়ে শুধু মুখে বলে যাচ্ছে জ্বলবেই তো। তার ওপর রাগের মাত্রা আমার বেড়েই চলেছে। আমি তাকে বোঝানোর জন্য মরিয়া হয়ে পড়েছি যে ওইভাবে তীর ছোড়া ওর উচিত হয়নি। কারণ আমি সেই অবলা নারী নই যাকে মেরে হাসতে হাসতে তার ব্যথা থেকে মজা উঠিয়ে নেওয়া যায়। বলি, ''আমি তোমাকে বিয়ে করলে আমার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নষ্ট হবে।''

''ভেরি ট্রু...''

''আমার মতো মহিলারও তোমার চলাফেরা বসা শোওয়ার ধরন, স্মার্টনেস, বডি অডার (শরীরের গন্ধ), তুমি কথা বলার সময় কেমন লাগো দেখতে, ঘুমনোর সময় কেমন লাগো, ঘুম থেকে ওঠার সময় কেমন লাগো, হাই তোলার সময় কেমন লাগো, তোমার অন্যান্য এটিকোয়েটস বা আদবকায়দা কেমন—সবকিছুই দেখা উচিত ছিল। কিন্তু আমি এসব দেখিনি কারণ আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি।'' *আমি তোমাকে ভালবেসেছি তাই এসব আমার কাছে অর্থহীন।*

আমার এত বড় লিস্ট থেকে সন্দীপ একটি কথাই উঠিয়ে নেয়। লেখে, ''তুমি জানো কি যে বডি অডার জানাটা খুবই জরুরি?''

মনে পড়ে আমার ঘরে পারফিউমের গ্যালারি আছে জেনে সে একদিন আমাকে বলেছিল ওর ন্যাচারাল বডি অডার পছন্দ।

''নিশ্চয়!''

সে লেখে, 'আমি এসব জানি...''

আমি লিখি, ''...তোমার সব কিছুই আমার বিচার করা উচিত ছিল বিশেষত আমি যখন নিজেকে কেতাদুরস্তভাবে তৈরি করেছি।''

সে লেখে, ''ভেরি ট্রু...ভেরি ট্রু...''

''আমি একটি শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে এবং নিজেও যথেষ্ট শিক্ষিত, যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। আমার মনে হয় না আমার চেহারাতে আভিজাত্যের অভাব রয়েছে। আমি ড্রাইভিং জানি, চার চারটে ভাষার ওপর যথেষ্ট দখল আছে, আমি তোমাদের সেই তথাকথিত উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন লোকজনের সঙ্গে কথা বলাতে সাবলীলতা রাখি। এমনকি কোনও সমস্যা নিয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুক্তিযুক্ত আলোচনা করে তার সমাধান করারও ক্ষমতা আমার আছে।''

সন্দীপ বুঝতে পারে আমাকে ওর দেওয়া ব্যথার আর্তনাদ ধীরে ধীরে প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। সে লেখে, ''এই পুওর ম্যানকে আঘাত করা এত সহজ নয়...''

''আমি একাই একশো। আমি চাইলে ছেলেদের ব্যবহার করে ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু আমার সংস্কার আলাদা। আমার সংস্কার আমাকে আমার আত্মসম্মান নিয়ে সর্বদা সচেতন রাখে। তাই ভিডিও কলের সময় নিজেকে বেশি উন্মুক্ত করতে পছন্দ করি না। এক কথায় আমাকে কোন দিক দিয়েই ছোট করে দেখা যায় না।''

থাম্বস আপ পাঠায় সে।

ওর নির্বিবাদে সবকিছু মেনে নেওয়ার ধৈর্য আমাকে আবার ওর প্রতি দুর্বল করে দেয়, ''ভালো থেকো। ভালবাসি তোমায়।''

আবার থাম্বস আপ।

''কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব না এবং এটাই আমার শেষ সিদ্ধান্ত।'' *শুধু বলার জন্য বললাম সন্দীপ। দেখতে চাই তোমাকে। একবার, একশো বার, হাজার বার, দশ হাজার বার, এক লক্ষ বার।* নড়ে গেছে আমার মন। হ্যাঁ-না'র মাঝখানে দুলছে ভীষণভাবে।

আবার থাম্বস আপ। থাম্বস আপের বিরতি নেই। বোঝায় আমার সব কথাই তার ঠিক লাগছে। কিন্তু আমি জানি ঠিক লাগছে না অথবা সাময়িকভাবে ঠিক লাগছে। কিছুক্ষণ পরেই সে আবার আমাকে কলকাতায় টানবে। আবার ওর প্রতি আমার বিশ্বাস নড়ে যাবে। মনে হবে শারীরিকভাবে কাছ আসার জন্যই সে আমাকে মন দিয়ে ভালবাসার কথা ঘোষণা করছে।

লিখি, ''তোমার ব্যবহার বড় অস্পষ্ট সন্দীপ।'' *এতটুকু অপেক্ষা করার ধৈর্য তোমার নেই। তাহলে আমার কাছ থেকে না পেলে তুমি কি...।*

''পুওর অ্যান্ড কনফিউসড ফেলো।''

''মজা করছ?''

''আমি মজা করছি না...সত্যি বলছি....''

আমি নিজেকে নিয়ে এভাবে কখনও ভাবিনি। আজ সন্দীপ আমায় ভাবিয়েছে। না চেয়েও এই অনুভব সে আমায় দিয়েছে যে আমি অতুলনীয়া। আমার জীবনসঙ্গীর ব্যক্তিত্ব আমার কাছে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। সন্দীপ বলে সবার ক্ষেত্রেই তাই। *যদি তাই হয় সেই সবার মধ্যে কি তুমিও আসো না সন্দীপ? যদি তাই হয় তাহলে মহিলাদের রূপের ওপর তুমি এত প্রাধান্য কেন দিচ্ছ? ব্যক্তিত্ব শুধু রূপ নিয়ে তো হয় না! ব্যক্তিত্ব মানুষটির সবকিছু নিয়ে হয়। আমার পছন্দের মানুষটির ছাঁচে তুমি ঠিক বসতে বসতে বসছ না। কেবলমাত্র দুটো জায়গাতে আটকে যাচ্ছ—এক নম্বর হল রূপের বিচার এবং দুই নম্বর হল রূপের বিচারে পাশ হয়েছে কি হয়নি তা না জেনেই তাকে এত কাছে পাওয়ার ইচ্ছে। খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি চাই এই দুটো বাধা তুমি কাটিয়ে ওঠো। কাটিয়ে উঠে শরীর মনে আমার হয়ে যাও। এক হয়ে গিয়ে আমার যত্ন নাও। তোমাকে যত্ন করতে করতে আমারও সময় কেটে যাক। একাকীত্ব অনুভব করার মুহূর্তগুলো যেন আর মাথা চাড়া দিয়ে না উঠতে পারে। তাই তো আমি তোমাকে এত সহ্য করছি। আর যদি তা না হয় তাহলে আমি তোমাকে বিয়ে না করে দূর থেকেই তোমার খেয়াল রাখব। তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি।*

আমি ওকে বলি, ''জীবনে অন্য অনেক কিছু অর্জন করার আছে এবং তা অর্জন করার জন্যই বেঁচে থাকার প্রয়োজন আছে। কোনওরকম বুদ্ধিদীপ্ত আলোকসম্পাতের দিকে না গিয়ে একটা দুই বেডরুমের ফ্ল্যাটে হাজব্যান্ডের সঙ্গে বছরের পর বছর এক বিছানায় রাত কাটানো শুধু এই ভেবে যে তুমি পুরুষ আমি নারী—না না সম্ভব নয়। লোকে বলে লেখক-লেখিকাদের অনেক প্রেমিক-প্রেমিকা থাকে। তাদের মতে লেখক-লেখিকা শব্দগুলোর মধ্যেই তাদের চরিত্রের এক শব্দের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লুকিয়ে

আছে—দুশ্চরিত্র বা দুশ্চরিত্রা। কাজেই তাঁরা একশো জনের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হলেও তা একেবারে অভাবনীয় হবে না।" মন বলে তবু আমি তো এমন নই কিন্তু আমি তা সন্দীপকে শোনাই না কারণ মুহূর্তের জন্য হলেও ওকে দিয়ে ভাবাতে চাই যে আমিও এমনই একজন হতে পারি এবং ওর স্ত্রী হয়ে আমি পরপুরুষের সঙ্গে এমন সম্পর্ক স্থাপন করলে অথবা স্থাপন করার ইচ্ছে রেখেছি জানলে ওর মানসিক অবস্থা কি হবে।

সন্দীপ বলে, ''অন্যদেরও এমন অভিজ্ঞতার জন্য সুযোগ পাওয়ার অধিকার থাকা উচিত।"

বাব্বা! তুমি তো প্রতিযোগিতার মাঠে নেমে পড়ছ সন্দীপ! ''কিন্তু লেখকদের এমন সম্পর্ক সাধারণের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।"

''সত্যি কথা, কেননা লেখকরা তাঁদের অভিজ্ঞতা দিয়ে গল্পের চরিত্র রচনা করেন এবং পাঠকরা সেইসব চরিত্রের সঙ্গে নিজেদের মিল খুঁজে বেড়ায়। তারাও জংলী হতে পছন্দ করে। অধিকার অধিকারই হয়, তা সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হোক বা না হোক।"

''যদি তাই হয় তুমি তোমার অধিকার চর্চা করো সন্দীপ। কে তোমায় না করেছে? কিন্তু তা করে তোমার সুখী বিবাহিত জীবনের স্বপ্ন সফল হবে না। তুমি যেভাবে নিজেকে সবার সঙ্গে মিশিয়ে তোমার অধিকার দাবি করছ তাতে আমার মনে হয় তুমি সত্যিই একটা জংলী লোক।"

''হ্যাঁ, আমি একজন পুওর ওয়াইল্ড ম্যান।"

''তুমি নিশ্চয় হট চ্যাট করো...আমার মনে হয় আমি প্রমাণ করতে পারব।"

''প্রমাণ করার দরকার নেই...এটা সত্যি," বলেই সে লেখে, ''করতাম যখন আমার বয়স কম ছিল।"

''না, মনে হয় এখনও করো।"

''হতে পারে...ঠিক জানি না..."

সারাটা দিন খুব খারাপ কাটে। মনে পড়ে সেই রাত্রির কথা যখন সে ফ্রকের জন্য খুব জোরাজুরি করেছিল এবং তার মনের ইচ্ছে জানতে চাওয়ায় সে আমাকে কল্পনায় জড়িয়ে ধরে চুমু পর্যন্ত এগিয়েছিল এবং তারপর আরও এগোতে চাইছিল। কিন্তু আমি বাধা টেনে দিয়েছিলাম।

ওকে বলি, ''নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ সন্দীপ। তোমার গায়ের রঙ ফর্সা নয়। তোমার মাথায় টাক পড়ছে, তোমার গাল-কপাল-চোখ-ঠোঁট-দাঁত সবকিছুতেই বয়সের ছাপ এসেছে। আর যদি তোমার আই আই টির কথাই ধরি—আজ থেকে তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে তুমি পাশ করেছ। তখনকার সিলেবাস নিশ্চয় তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ ছিল। তুমি রেলে চাকরি করো, নতুন সিলেবাসের সঙ্গে নিজেকে সংযোজিত করার সুযোগও কম পেয়েছ। সেই হিসেবে এখনকার ছেলেরা তোমার চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে। এসব মাপকাঠি দিয়ে হিসেব করলে দেখবে তোমার নিজের যোগ্যতাও বিশেষ কিছু নয়। তবুও আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি চেহারার যেসব বিবরণ দিয়ে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছ তাতে মহিলা হিসেবে আমারও

আত্মসম্মানে লেগেছে।"

এত বারি মেরে মেরে আমি ওকে বোঝানোর চেষ্টা করছি তবু সে বুঝছে না। আমি দেখেছি আমাদের কথাবার্তা যখনই শারীরিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে চলে তখন আমি যতই সন্দীপের সংযম আশা করি ততই সে সেখান থেকে তার মতো করে রসকস উঠিয়ে নিয়ে আনন্দ পেতে বেপরোয়া হয়ে পড়ে। সে পরপর মেসেজ করতে থাকে,

—তোমাকে দেখতে দাও...

—আমি তোমার ইমোশনকে দেখতে চাই...

—প্লীজ ভিডিও কল করো...

—তুমি নিশ্চয় এখন নির্বস্ত্র নও...

—আমি তোমাকে দেখতে চাই...

—করো ভিডিও কল..."

ভিডিও কল নয়, ভয়েস কলে কথা বললাম। ''তুমি শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে মেতে আছ। ধরো, তোমার বউ খুব অসুস্থ...তুমি বেশ কিছুদিন তার কাছে আসতে পারছ না..."

''কি অসুস্থতা?" জিজ্ঞেস করল সে।

কি অসুস্থতা? কি বলি! ''ধরো তার সার্জারিই হয়েছে।" আমার নিজের সার্জারি হয়েছে বলে ওটাই মাথায় আসে। ''দু'মাস তার কাছে আসতে তোমার বাধা আছে। তাহলে কি করবে?"

কি করবে তুমি জিজ্ঞেস করে আমি বলতে চাইলাম তাহলে তোমাকে তো তোমার এই দুর্বার ইচ্ছেকে নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে। কিন্তু সন্দীপ আমার প্রশ্ন শুনে হঠাৎ বড় জংলী হয়ে উঠল। হেসে জিজ্ঞেস করল, ''কোথায় সার্জারি হয়েছে?"

''যেখানেই হোক।"

''না, আমার জানা দরকার কোথায়।"

''কেন?"

''হাত বোলাতে পারব তো? কারণ পেনিট্রেশনের চাইতে হাত বোলাতে পারাটা বেশি প্রয়োজন।" তার মুখ থেকে এক নিষ্ঠুর হাসির শব্দ আমার কান বিদীর্ণ করে।

খুব কেঁদেছিলাম সেই রাতে। *কেন তুমি এমন করলে? আমি ভেবেছিলাম এবার নিজেকে খুব খারাপভাবে তোমার সামনে উপস্থাপন করব—এত খারাপ যে তুমি আমার সঙ্গে এসব কথা বলারই রুচি হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু তুমি আমার অনুমানকে পেছনে ফেলে দিলে। দু'গুণ রুচি নিয়ে এগিয়ে এলে আমার সঙ্গে মোকাবিলা করতে। আমি যখন বললাম, আমার তিনটে বিয়ে তুমি জিজ্ঞেস করলে তিনটে বিয়ে থেকে অন্ততপক্ষে তিনটি বাচ্চা হওয়া উচিত ছিল, মাত্র একটা বাচ্চা কেন?*

তাদের সঙ্গে কি তোমার কোন ঘষাঘষি হয়নি? এসব কথা বলার সময় তোমার একবারও মনে হল না কি তোমার একটি মেয়ে আছে? আমার ঘরেও মেয়ে আছে। আমাকে এভাবে বলছ জানলে আমার মেয়ে কষ্ট পাবে। তোমার মেয়েকে অন্য কোন পুরুষ এভাবে বলছে জানলে তুমিও কষ্ট পাবে। তুমি যদি তাতে কষ্ট পাও তাহলে জানব তোমার স্ত্রী তোমার মেয়েকে তোমার থেকে আলাদা করে বড় অন্যায় করেছেন। অর্থাৎ আমার মনে হয় না তুমি কষ্ট পাবে এবং সেক্ষেত্রে তোমার মতো জংলী বাবার থেকে মেয়েকে আলাদা করায় তোমার স্ত্রীর শাস্তি হওয়া উচিত। সুতরাং যাও বুক ফুলিয়ে—তোমার স্ত্রীর শাস্তির ব্যবস্থা করো তো দেখি কেমন পারো! তোমরা তো আর শুধরোবে না। আজ তোমাদের মতো পুরুষদের জন্যই তোমার মেয়ের ভাগ্যেও দুর্দশাই আছে। সে লিখেছিল, ''সত্যিই আমি আমাদের মেয়েদের নিয়ে চিন্তায় আছি।"

আমার মেয়েকে নিয়ে তোমায় চিন্তা করতে হবে না। সে দুনিয়া অনেক দেখেছে, অনেক কঠিন করে নিয়েছে মন। হয়ত সে ঠিকই নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলতে পারবে। পুরুষসঙ্গের আশা ছেড়ে সে নিজেই নিজের জীবনকে সাজিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করে নিতে পারবে। তুমি তোমার মেয়ের কথা ভাবো।"

''হ্যাঁ, এটা আমরাই সমস্যা...আমি আমার মেয়ের জন্য সত্যিই চিন্তিত...তুমি খুব সেনসিটিভ।"

''সেনসিটিভ তো হওয়াই উচিত।"

''কিন্তু এই দুনিয়াটা বড্ড কর্কশ।"

তুমি তা জানো। জেনেও কেন আমার কাছে কেন এত কর্কশ হলে? একটু নরম করে কথা বলে কেন আমার মন ভরিয়ে দিলে না সন্দীপ? তখনও আমি কাঁদতাম কিন্তু সেই কান্নাটা হত সুখের কান্না। ''তুমি এভাবে কোন মহিলার সম্মানে ঘা দিলে সে তোমাকে তোমার ভুল বোঝানোর জন্য তোমার মেয়েকে নিয়ে অনেক কিছুই বলে দিতে পারে। তখন তোমার খারাপ লাগবে।"

''ভেরি ট্রু...তোমাকে আঘাত করার ইচ্ছে আমার ছিল না। সরি।"

''তোমার জীবনে যা প্রাপ্য তা তুমি পাবেই। তুমি চাইলে এই পাওয়াটা সময় মেনে অনেক ভালভাবে, অনেক কোমলতার সঙ্গে হতে পারে।"

সন্দীপের ভাবনার নাগাল পাওয়া দুষ্কর। কেননা ভিডিও কলে আমাকে দেখার ইচ্ছে তার তখন প্রবল। প্রবল জানার ইচ্ছে আমার সেই অ্যান্ড স্টাফটা কি।

কয়েকদিন আগের ঘটনা। ফেসবুকে শোভা দে নামে এক প্রখ্যাত লেখিকার উক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখেছিলাম। শোভা দে বলেছিলেন, ''মাংস তো মাংসই হয়, গরুর হোক আর ছাগলের অথবা অন্য কোন প্রাণীর...। তাহলে হিন্দুরা জানোয়ারের প্রতি আলাদা আলাদা ব্যবহার করে কেন? নাটক করে কেন এই বলে যে ছাগল কাটো, কিন্তু গোরু কেটো না। এটা কি তাদের মূর্খতা নয়?" প্রতিবাদক প্রতিবাদ করেছিলেন, ''পুরুষ তো পুরুষই হয়...ভাই হোক বা স্বামী, বা পিতা বা পুত্র। তাহলে আপনি চারজনের সঙ্গে আলাদা আলাদা ব্যবহার কেন করেন? সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য বা যৌনসুখ পাওয়ার জন্য শুধু স্বামীকে কেন ব্যবহার করেন?

ভাই, পিতা আর পুত্রের সঙ্গেও একই ব্যবহার করা যেতে পারত! এটা কি আপনার মূর্খতা বা নাটক নয়?"

তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম এত সুন্দর একটা উদাহরণ দেখে। কথাটা আমি অনিন্দিতাকে বলেছিলাম। অনিন্দিতা বলেছিল, এই উদাহরণটা লিঙ্গ উল্টে দেখ। 'শোভা দে'র জায়গায় ওঁর স্বামীকে বসা। আর বল মহিলা তা মহিলাই হয়...বোন হোক বা স্ত্রী বা কন্যা। তাহলে আপনি সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য বা যৌনসুখ পাওয়ার জন্য শুধু স্ত্রীকে কেন ব্যবহার করেন? বোন, মাতা আর কন্যার সঙ্গেও তো একই ব্যবহার করা যেতে পারত!

একইরকম উদাহরণ কিন্তু এবার আমার মন 'শোভা দে'র দিকে ঘুরে যায়।

অনিন্দিতা বলে, ''কেমন লাগল?"

''দারুণ।"

''কি বুঝলি?"

''বুঝলাম 'শোভা দে'কে এইভাবে কথার চড়-চাপট মারা যায় না।"

''কেন?"

''পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদী ডায়ালগ ছোঁড়ার জন্য ছেলেদের মুখের 'হা'টা যতটা বড় হয় পর্দার পেছনে সেই উল্লিখিত যৌনসুখ মেটাতে 'হা'টা ততটাই বড় হয়। তখন তারা মা, বোন, কন্যা চেনে না। বলব না সবার কিন্তু অনেকেরই।"

''শুধু মা, বোন, কন্যা নয়...কাকি, মাসি, পিসি, জেঠি এমনকি দিদিমাও। নিজের হোক আর পরের। বউদি তো লাইনে সবার আগে থাকেন।"

''আর বান্ধবী?"

''বান্ধবী এবং বাগদত্তারা লাইনে থাকে না। তাদের ঘরে ঢুকিয়ে রাখা হয়। সুতরাং শোভা দে ঠিকই বলেছেন, মাংস তো মাংসই হয়..."

অনেক তর্কবিতর্কের মাঝখানেও সন্দীপের প্রতি আমার ভালবাসা নড়বড় করতে করতে টিকে থাকে। সন্দীপের 'হা'টা এখন থেকে সুদূর ভবিষ্যতে আমাদের দু'জনারই মৃত্যু পর্যন্ত একমাত্র আমি ছাড়া আর কারও দিকে বিস্তৃত হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করতে চাই না। তাই অনিন্দিতার সঙ্গে সহমত হয়েও অমতের পতাকা উড়িয়ে দিই। বলি, মেয়েরাই বা কি কম যায়!

''কটা মেয়ের উদাহরণ দিবি?"

''মা, বোন, কন্যা, মাসি, পিসি, বান্ধবী, বউদিরাই তো সেইসব মেয়ে..."

''নিশ্চয় মেয়ে। তারা মেয়ে না হলে ছেলেদের নিয়ে এমন প্রসঙ্গই আসত না। তারা স্বেচ্ছায় এসব করে না।"

''যমী করতে চেয়েছিল..."

''যমী! কোন যমী?"

''আরে যমের বোন যমী। উগ্র যৌবনের নেশায় সে যমকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। বলেছিল তার ভাই যদি তাকে সম্ভোগ না করে তাহলে সে মৃত্যুবরণ করবে...জানিস না?"

''জানি। যমী বিয়ে করতে চেয়েছিল—শুধু সহবাস নয়। এটাও জানি যে যম

তাকে বুঝিয়ে বলেছে আমরা একই মাতাপিতার সন্তান, একই রক্ত প্রবাহিত হয়ে চলেছে আমাদের দেহে, আমাদের সহাবস্থানে বিকলাঙ্গের জন্ম হবে, মূক-বধিরের জন্ম হবে, অসুস্থ উন্মাদ সন্তানের জন্ম হবে। তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছ তাই এই মুহূর্তেই অন্য যে কোন পুরুষকে স্বামী রূপে বরণ করে নাও। তাতে সে নিরতও হয়েছে। কিন্তু এই কামুক পুরুষদের ওপর শত তত্ত্বজ্ঞান বর্ষণ করেও তো কোন লাভ হয় না।"

সন্দীপের অ্যান্ড স্টাফের প্রতি তুমুল আকর্ষণও আমার প্রতিবাদী ঝড়ের মধ্যেও সারারাত জেগে রইল। সকাল চারটেতে মোবাইল ডেটা অন করে দেখি সে অনলাইন আছে। যদিও সে গুড মর্নিং জানালো অনেক পরে—চারটে সাতচল্লিশে। জিজ্ঞেস করলাম, ''কেন দ্বিধা করছিলে?"

''না না।"

''করছিলে দ্বিধা।"

''বোঝার চেষ্টা করছিলাম তুমি একজন সত্যিকারের মানুষ নাকি রোবট...আমি যার সঙ্গে কথা বলছি তার মধ্যে রক্তমাংসে গড়া শরীরের আবেগ আছে নাকি তার সবই যান্ত্রিক।"

''জানি না। তবে সে যে-ই হোক না কেন তার মধ্যে একটি সত্য আছে..."

''দুনিয়াটা কে বেশি দেখেছে—তুমি না আমি?"

''আমি।"

''তুমি কি নিশ্চিত জানো? আমার তো মনে হয় আমি।"

''তুমি শুধু তোমার নিজের স্বার্থে দুনিয়া দেখেছ। আমি দেখেছি আমাদের স্বার্থে।" *সঙ্গে মেয়ে নিয়ে। মেয়েকে বড় করার দায়িত্ব নিয়ে।*

''হতে পারে...বলা মুশকিল.."

''আমার তা মনে হয় না।"

''কেন? আমি বলতে চেয়েছি সময়বিশেষ অন্যের ফিলিংসকে নিয়ন্ত্রণ করা সত্যিই খুব কঠিন হয়ে পড়ে..."

''আমি পারি। আমি জানি তুমি আমাকে অনেক ভালবাস।"

''জানি না। তাই জিজ্ঞেস করছি আমি কার সঙ্গে কথা বলছি...তোমার অভিজ্ঞতা তোমাকে দিয়ে কথা বলায়, তোমাকে দিয়ে কাজ করায় রূপা..."

একের পর এক মেসেজ আসতে থাকায় আমার কোন মেসেজের উত্তর কোনটা বুঝি না। বলি, ''ঠিক আছে, তুমি আমাকে ভালবাস না।"

''কি করে জানলে?"

''তুমি জানি না বললে, তার মানে বোধ হয় সেটাই হয়।"

''আমি কনফিউসড।"

''কনফিউসড লোকেরা আগে বাড়তে পারে না, সুতরাং আমি এটাকে না-ই ভাবব। যদি আমার কথা বলো—ফিলিংস আমার আছে। কিন্তু সেটা অনেকের চেয়ে অনেক আলাদা।"

একটু বিরতি টেনে লিখি, ''তোমার নামটা আগে কলকাতা সন্দীপ বলে সেভ

করেছিলাম। এখন কলকাতা এক্স এক্স এক্স বলে সেভ করেছি।"

''তোমার মোবাইলটা সবার থেকে দূরে রেখো।"

''কেন?"

''কেননা যখনই আমি কল করব তখনই এক্স এক্স এক্স তোমার মোবাইল স্ক্রীনে ভেসে উঠবে..."

''এক্স-এর মানে হল অপরিচিত ব্যক্তি।"

''কিন্তু এক্স এক্স এক্স মানে হল অতি অপরিচিত।"

''ঠিক তাই।"

''অতি অপরিচিত মানে হল অতি জংলী।" আবার নিজের চাওয়ার দিকে এগোতে শুরু করে সে। এত ঝড়ঝাপটার পরেও। বললাম, ''দেখতে ইচ্ছে করছে..."

সন্দীপ আমার অসম্পূর্ণ কথার মানে ধরতে পারে না। লেখে, ''আমারও।"

''...দেখতে ইচ্ছে করছে তোমার কাছের মহিলাদের ওপর তুমি কতটা জংলী হতে পারো।"

''সবার ওপর জংলী হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। তুমি কখন বিশ্রাম নেবে?"

''বিশ্রাম নেওয়া আর হবে না।" *তুমিই আমাকে বিশ্রাম নিতে দিচ্ছ না।* ''জীবনটা বড় কঠিন। এখন লিখতে বসব।"

''তুমি জানো কিনা জানি না আমার বিদ্বেষপূর্ণ প্রতিযোগিতা ভালো লাগে না। বস্তুত আমার কোনওরকম প্রতিযোগিতাই ভালো লাগে না। এসব ব্যাপারে আমি খুব অলস।"

আমি তোমার কথা এবং কাজের মধ্যে কোন মিল খুঁজে পাচ্ছি না সন্দীপ। ''যদি তাই-ই হয় তোমাকে সম্মান করব। অন্যকে সম্মান দিতে ভালো লাগে আমার। আমি আমার ভাবনাচিন্তাকে তোমার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র।"

''জানি।"

''আমি এটা বুঝেছি যে তুমি শারীরিক সম্পর্ক ছাড়া বাঁচতে পারবে না।"

''খুব সত্যি কথা...কিন্তু..."

সন্দীপের এই কিন্তুটা আমার জানার খুব দরকার ছিল। কিন্তু ওর কাছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমার আরেকটা মেসেজ পৌঁছে যাওয়ায় সে তার উত্তর দিল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ''তুমি ভালবাসার আর্ট জানো?"

''জানি। ভালবাসার আর্ট নিয়ে তোমার কি ধারণা?"

''গভীর ভালবাসা পেতে অন্যের ওপর জানোয়ারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার কোন প্রয়োজন হয় না। হাল্কা স্পর্শ দিয়েও মেয়েদের শরীর, মনকে জাগিয়ে দেওয়া যায়।"

''ঠিক বলেছ...সেন্সুয়াল...না সেন্সুয়ালটা সঠিক শব্দ নয়...তুমি হয়ত আমাকে শব্দটা খুঁজে পেতে সাহায্য করতে পারবে...বলতে চাইছি সফট টাচ...অ্যাফেকশনেট টাচ এবং ফিলিংস...কিন্তু এই পুওর লোকটি সেই ভালবাসা কোথায় পাবে?"

সেই ভালবাসাই তো আমি তোমাকে দিতে চাই। আজীবন। কিন্তু সেই ভালবাসা শুরু করার জন্য যে এক শুভক্ষণের দরকার তুমি সেটাই বুঝতে চাইছ না। ''জানো, আমি কোন নির্জন দ্বীপে প্রকৃতি দ্বারা বড় হওয়ার মতো বড় হয়েছি। সম্পর্কের

জটিলতা আমার মাথায় ঢোকে না। তুমি এখানে এলে বুঝতে পারবে।"

''আমাদের দেখা হলে বুঝতে পারব..."

''যে কোথাও দেখা হলে বুঝতে পারবে না। বোঝার জন্য তোমাকে এখানে আসতে হবে।"

''ধীরে ধীরে জানব। কোন নতুন লেখায় হাত দিয়েছ?"

''দিয়েছি কিন্তু তোমাকে নিয়ে নয়।"

''তবে?"

''এখন বলব না। আমি আমাদের জটিল সম্পর্কটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না সন্দীপ।"

''আমাকে নিয়ে কবে লিখবে?"

লিখব লিখব। আমাদের পরিচয়ের প্রথমদিকের দিনগুলো বড় মধুর ছিল। সেগুলো এভাবে আলাদা না হয়ে গেলে লেখাটা আমার পক্ষে অনেক সহজ হত। ''আমাদের সেই শুরুর কথাগুলো কোথায় গেল সন্দীপ?"

''গন উইথ দ্য উইন্ড।"

''কি?"

''গন উইথ দ্য উইন্ড আসলে একটি ১৯৩৯-এর আমেরিকান এপিক হিস্টরিক্যাল রোমান্স মুভি।"

আমার মাথায় ঘুরছিল সিরিয়ালের সেই মেয়েটি যার মাকে সন্দীপ দেখতে খারাপ বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। জানতে চাই, মেয়েটির নাম কি পল্লবী? সে গন উইথ দ্য উইন্ড-এ ডুবে থাকায় বোঝে না আমার প্রশ্ন। বলে, ''নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। ওটা একটা ইংলিশ মুভি ছিল..."

হোয়াটসআপের ডিপি বারবার পরিবর্তন করার নেশাতে এক একটা ফটো অন্ততপক্ষে দশবার করে ব্যবহৃত হয়েছে। নতুন ফটো তুলতেও ইচ্ছে করছে না। এদিকে নিজের ওই একই মুখ দেখে দেখে নিজেরই বিরক্তি লাগছে। হোয়াটসআপটা যেহেতু আমার সেখানে আমি এমুহূর্তে অন্য কারও ডিপিও লাগাতে পারি না। মেয়ের লাগিয়েছিলাম, অনিন্দিতা পছন্দ করেনি। আমার এখনও পর্যন্ত এমন কোন প্রেমিকও তৈরি হয়নি যার সঙ্গে সম্পর্ক নিশ্চিতরূপে কখনও বিফলতার দিকে যাবে না বলে বিশ্বাস হয়েছে। হলে তার ফটো সেখানে আপলোড করতাম। বৈচিত্র্য পেতে অ্যালবাম ঘেঁটে আমারই দুটো পুরনো ফটো পেয়েছিলাম। একই শাড়ি পরা, একটিতে দাঁড়িয়ে আছি, অন্যটিতে বসে। বিয়ের পরপরই গোরখপুরে একটি বাগানে রাজাই উঠিয়ে দিয়েছিল। প্রথমে বসে থাকা ফটোটিকে আপলোড করেছিলাম। ঘণ্টাখানেক বাদে আবার দাঁড়িয়ে থাকা ফটোকে।

ভিডিও কলে রিলির রুমের আড়াই বাই ছয় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সন্দীপকে আমি জিজ্ঞেস করি তার উপরের ফ্ল্যাটে যে মহিলাটি থাকেন উনি দেখতে কেমন। সন্দীপ বলে, ''তোমাকে বললেই তুমি আবার রেগে যাবে।"

''বলোই না।"

''না।''

''আমি কিছু অনুমান করেছি। বলব?''

''বলো।''

''তুমি কলকাতায় কখনও রাস্তা তৈরির কাজ দেখেছ...যেখানে পাথর বিছিয়ে দিয়ে তার উপর কালো পিচ ঢালা হয়...?''

''যেখান দিয়ে হাঁটতে গেলে পা আটকে যায়...'' উপমা ব্যাখ্যা করতে আমায় সাহায্য করে সন্দীপ।

''ঠিক তাই। সেখানে রাস্তার ধারে ড্রাম রাখা থাকে যার মধ্যে পিচগুলো গরম করা হয়...?''

''হ্যাঁ দেখেছি তো...''

''সেই ড্রামগুলো যেমন বেঁটে, কালো, গোল...মাথা, বুক, পেট, কোমর আলাদা করে বোঝা যায় না...সেরকম।''

''একদম ঠিক।''

''তোমার ব্যাখ্যা অনুসারে তোমার উপরের তলার বন্ধুর বউ এবং বিয়ের জন্য দেখা সিরিয়ালে অভিনয় করা মেয়েটির মায়ের চেহারার মধ্যে তুমুল সাদৃশ্য আছে।''

সে বলে, ''কিন্তু পল্লবী তো বসে ছিল। তাকে কে দাঁড়াতে বলেছে?''

''কি বলছ?''

''আরে, তোমার ডিপি।''

''সন্দীপ, তুমি আমাকে মেরে ফেলার জন্য জন্ম নিয়েছ।''

''আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না কে কাকে মারছে।''

''মানসিক অত্যাচার করছ।''

''মী টু...''

''মানে?''

''মানে, তুমিও আমাকে মারছ।''

ডিপিতে আমি পল্লবীর বয়স মাত্র তেইশ বছর। সন্দীপ বলে সেই আমি পল্লবী নাকি এখনকার থেকে অনেক আলাদা ছিলাম। হওয়াই স্বাভাবিক, অন্ততপক্ষে চেহারায়। সেই তেইশ বছরের কাঠামোর ওপর আরও পঁচিশটি বছরের প্রলেপ পড়েছে। সন্দীপের মতে মানুষের বয়সটা শুধুমাত্র একটা নম্বর। চাইলেই মানুষ বার্ধক্যকে এড়িয়ে গিয়ে যৌবনের হাত ধরে চলতে পারে। সে বলে অনেক মানুষই মনেপ্রাণে একেবারে তাজা থাকে। আমরা তাদের দলে ভিড়ে গেলে ক্ষতি কি! ক্ষতি তো কিছুই নেই, বরং লাভ আছে। কিন্তু তাকে সম্ভব করতে হলে আমাদের কিছু বছর মহাকাশে কাটিয়ে আসতে হত। পৃথিবীতে পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত করা বৃদ্ধ মুখে বাচ্চার খিলখিল হাসি শোভা দেয় না। যে বয়েসে যেটা মানায়। বয়সের সঙ্গে আচার-আচরণের সামঞ্জস্যহীন সমবেতকরণ ব্যক্তিত্বকে হাস্যকর করবে। একমত হয় না সন্দীপ। ''নিশ্চয় তা নয়।''

''ইংরেজিতে ব্যক্তিত্বকে পার্সন্যালিটি বলে। আমার মনে হয় পার্সন্যালিটিকে পার্সন্যাবিলিটি বললে বেশি ভালো হয়। পার্সন্যাবিলিটি হল পার্সন প্লাস অ্যাবিলিটি।

মানুষের বয়স এবং ক্ষমতা ব্যস্তানুপাতিক। বয়স যখন কম থাকে তখন মানুষের ক্ষমতা বেশি থাকে। বয়স বাড়লে ক্ষমতা কমে। গড়পড়তা দুটোর যোগফল তাহলে সেই একই হল। মানুষটি সেই একই রইল। কাজেই আমার মনে হয় না তেইশ বছরের পল্লবী এবং উনপঞ্চাশ বছরের পল্লবীর মধ্যে এমন কোন পরিবর্তন ঘটেছে যা তাদেরকে দুটো সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ বানিয়ে দেবে।"

পরেছিলাম একটা পিংক রঙের টপ এবং কালো জিনসের প্যান্ট। অনেকক্ষণ আমাদের কথা হয়েছিল। অনেকক্ষণ তার মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়েছিলাম। তারপর আয়নার সামনে থেকে বিদায় নেওয়ার সময় এলে সে অনুরোধ করেছিল, ''প্লীজ যেও না। চশমাটা পরতে দাও। তোমাকে ভালো করে দেখতে দাও।" চশমা পরে মাথাটা পেছনের দিকে ঠেলে দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিল সে আমায়। বলেছিল, ''বাহ্, তোমাকে তো দেখতে সুন্দর লাগছে।" জানতে চেয়েছিল, ''সত্যিই ভালবাস আমায়?"

''কি জানি।"

''বলো।"

''তোমাকে ভালবাসি বলতে দ্বিধা হয়। হয়ত ভাববে আমি তোমাকে বিছানায় কল্পনা করছি, তাই।" *আমি জানি তেমন ভাবলেই তুমি খুশি হবে তবু...*

''তোমার ভালবাসার সংজ্ঞা কি?"

''যদি বোঝো—"

''বলোই না..."

''ভালোবাসা মানে হাতের উপর হাত ফেলে রেখে বসে থাকা নয়।
পাশাপাশি এমনভাবে হাঁটা নয়
যে শরীরে শরীর ছুঁয়ে যেতেই হবে।
ভালোবাসা মানে বন্ধ ঘরে আলিঙ্গন করে পড়ে থাকা নয়।"

''তাহলে?"

''ভালোবাসা মানে মনে উপলব্ধি দেওয়া—
আমি তোমাকে পছন্দ করি, সম্মান দিই তোমার ব্যক্তিত্বকে।
আমার প্রতি তোমার অনুরাগকে। কিংবা উল্টোটা।"

''আর?"

''ভালোবাসা হল পরিজ্ঞাত হওয়া—
স্থান কাল পাত্র নির্বিশেষে ছুটে গিয়ে দাঁড়ানো
ভালোবাসার মানুষটির কাছে।
হয়ত সে একা, হয়ত সে সমস্যায় জর্জরিত।
হয়ত তেমন কিছুই নয়, শুধু সে চায় তোমাকে পাশে
একসঙ্গে লাঞ্চ কিংবা ডিনার করবে বলে।

''আর?"

''ভালোবাসা মানে শরীরে ভালো লাগার কৃত্রিম ছাল পরিয়ে
শরীর ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা নয়।"

''না-বাচক কথা শুনতে চাইছি না। হ্যাঁ-বাচক কিছু বলো..."

''ভালোবাসা মানে মনের মধ্যে ঢুকে যাওয়া,
ঢুকে গিয়ে রঙিন করে তোলা মনকে, সুস্থ সবল রাখা।
'তুমি-আমি'র সংমিশ্রণে এক শক্ত খোলস তৈরি করে
এক নিরাপদ বাসস্থান উপহার দেওয়া।"

''একটু সোজা করে বলো...আমাকে তুমি কিভাবে ভালবাসবে?"

''তোমার সব সমস্যাগুলোকে আমার নিজের সমস্যা ভেবে সমাধানের চেষ্টা করব। তোমাকে কেউ অপমান করলে তাকে পাল্টা অপমানের গুলিতে বিদ্ধ করব। তোমার গায়ে কেউ হাত ওঠালে তাকে পিটিয়ে হাড়গুলো গুঁড়িয়ে দেব...।"

''কয়েকদিন আগে কেন বললে না? তোমার কাছে চলে আসতাম।"

আবার একটি সকাল হয়। আবার গুড মর্নিং সেরে সন্দীপ জিজ্ঞেস করে, ''কিছু লিখেছ?"

''কি নিয়ে লিখব বলো?"

''যা ইচ্ছে।"

''হ্যাঁ।"

''হেট স্টোরি না লাভ স্টোরি?"

তার উত্তর না দিয়ে আমি বলি, ''তোমার কাছ থেকে গুড মর্নিং পেতে আমার খুব ভালো লাগে।"

''তাই? তোমাকে এখন দেখতে কেমন লাগছে?"

''খুব খারাপ।" সে আবার আমাকে ভিডিও কল করতে বলবে আশংকা করে আগেভাগেই জানিয়ে দিই, ''আমি এখন আরও ঘুমোতে চাই।"

''কার বাহুতে?"

''আমার উপন্যাসের নায়কের..."

''সে নিশ্চয় খুব অভিজাত। আমি হলাম প্রলেটারিয়েট।"

আর ঘুম হবে না। ভেবে ঠিক করি লং ড্রাইভে যাব। মজা করে বলি, ''এসো আমার সঙ্গে।"

''তোমার সঙ্গে আমাকে মানাবে না। আমি যে সর্বহারা...।"

সন্দীপ মাঝে মাঝে কিছু মেসেজ পাঠিয়ে আবার ডিলিট করে। আমি পড়লে রেগে যাব সেই ভয়ে। সেইসব মেসেজে বেশি ভালবাসার কথা থাকে, বেশি কাছে আসার কথা থাকে, জড়িয়ে ধরার কথা থাকে, চুমু খাওয়ার কথা থাকে। সেইসব মেসেজে আরও কিছু ইঙ্গিত থাকে। সেইসব মেসেজের অনেকগুলোই আমি ডিলিট হওয়ার আগেই পড়ে ফেলি। সেদিনও নিজেকে সর্বহারা ঘোষণা করেও সন্দীপের মধ্যে চুমু, স্পর্শকে সঙ্গে নিয়ে আরও অনেককিছু পাওয়ার ইচ্ছে জেগে উঠল। তার ইঙ্গিত ঢেলে দিল সে মেসেজে। দিয়েই তাকে মুছে ফেলল মোবাইলের পর্দা থেকে। কিন্তু আমার চোখ আগেই মেসেজ পড়ে নিয়ে মাথায় তার সারমর্ম পৌঁছে দিয়েছে। ওকে লিখলাম, ''আমাকে পেতে হলে সংস্কৃত তোমাকে হতেই হবে। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই।"

সে উত্তর দেয়, ''দরিদ্র আমি। আমার মধ্যে কোন আকাঙ্ক্ষা বেঁচে নেই...সব নষ্ট হয়ে গেছে।''

''সব আকাঙ্ক্ষা বোলো না। বলো মার্জিত কোন আকাঙ্ক্ষা বেঁচে নেই।''

''তুমি বলতে চাইছ আমি খারাপ লোক তাই আমার মধ্যে শুধু খারাপ বাসনাই আছে, তাই তো? বিশ্বাস করো ভালো খারাপ কোন বাসনাই নেই।''

''সত্যি?''

''হ্যাঁ, বাসনা শুধু শরীরকে উত্তেজিত করে, ঘাম ঝরায়।''

''তাহলে কি করবে?''

''জীবনের বাকি কয়েকটা বছর এইভাবেই বাঁচতে হবে...''

সে ভিডিও কল করে তার ঘরের খোলা জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বলে, মাঝে মাঝে ভাবি এইখান দিয়ে যদি কেউ ঢুকে পড়ে। এমন ভাবে হাত নড়িয়ে বলে যে আমার মনে হয় সে আমাকেই ডাকছে। ডেকে বলছে, ''রূপা, এক্ষণি চলে এসো। এসে ভালবাস আমায়। গভীরভাবে ভালবাস। ঠিকানা ধরে চলে আসতে পারবে তো আমার কাছে? বলছি শোনো, লর্ডস মোড় থেকে আনোয়ার শাহ্-এর দিকে যেতে মাত্র একটি স্টপ। নেমে রাস্তা ক্রস করে দেখবে একটা বুড়োকালীর মন্দির আছে। তার পাশের গলি দিয়ে সোজা চলে আসবে...তারপর বাঁদিকে বেঁকবে...তারপর ডানদিকে...একদম শেষের বাড়িটির দোতলায়। দেখবে লেটার বক্সে ঠিকানা লেখা আছে ৬-এর ই। রূপা, তোমার ভালবাসার বড় পিয়াসী আমি।'' সন্দীপের এই ডাক আমার বিশ্বাসকে টেনে নেয় তার হাতের মুঠোয়। বোঝায় প্রত্যেক মানুষ আসলে দুটি মানুষের যোগফল। একটি ভালো, আরেকটি খারাপ। বোঝায় প্রত্যেক ভালো কিছুকে পেতে হলে আগে খারাপকে অতিক্রম করতে হয়। তার এই ডাক আমার শক্ত মনকে বারি মেরে টুকরো টুকরো করে দেয়, অনেক অন্যরকম করে দেয় আমাদের আজকের এই মুখোমুখি হওয়াটাকে। আমি আমার ভাবনা থেকে দূরে সরে যাই। সে আমার কাছ থেকে তার মধ্যেকার সেই খারাপ মানুষের খারাপ চাওয়া হাসিল করতে থাকে। কথায় কথায় সে আমার শরীরকে ভালবাসে। কথা দিয়ে স্পর্শ করে আমার মাথা, কপাল, ঠোঁট, গলা, বুক, পেট সব। সন্দীপের কথার স্পর্শে তৈরি হয় এক শুকনো স্রোতের অন্ধকার সমুদ্র। সেই সমুদ্রে আমি ডুবি। কখনও মনে হয়—না, এ কোন সমুদ্র নয়, এ হল এক অন্ধকার সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গে আমি হাঁটছি। হেঁটে চলেছি অবশ পা নিয়ে—ওপাড়ে পৌঁছে ভালো মানুষটির সঙ্গে দেখা হবে বলে, তাকে সারাজীবনের জন্য একান্ত করে পাব বলে। সন্দীপের মুষ্টিবদ্ধ আমার বিশ্বাস। আমি ভেসে চলি অথবা ভাসা ভাসা পায়ে এগিয়ে চলি এক অজানা ভাগ্যের দিশা অনুসরণ করে। তোমাকে ভালবাসি সন্দীপ। সত্যিই অনেক ভালবাসি। কোন জটিলতা বুঝি না, মতবিরোধ বুঝি না, শুধু ভালবাসা বুঝি। শুধু ভালবাসা।

মাত্র কয়েকমাস আগে সুপ্রিম কোর্ট ৪৯৭ নম্বর ধারা বাতিল করে দেওয়ার সপক্ষে অনেকে বিভিন্ন সংবাদপত্রে অনেক লেখালেখি করছিল। আমিও সংবাদ নজর নামে কলকাতার একটা বাংলা সংবাদপত্রে কড়া ভাষায় একটা লম্বাচওড়া বক্তৃতা পাঠিয়েছিলাম। বিপক্ষে। বেশ কয়েকদিন আমার কাছ থেকে কোন লেখা না পেয়ে

এডিটর আমার ওই লেখাটি দিয়েই তার পত্রিকার পাতা ভরতে বাধ্য হয়েছিলেন কিন্তু লেখা শেষে বন্ধনীর মধ্যে ছোট করে উল্লেখ করে দিয়েছিলেন, 'লেখিকার নিজস্ব বক্তব্য'। যাই হোক, আমার মনে হয়েছিল সেখানে আমি পরকীয়ার পরিভাষা তুলে ধরে আমাদের চূড়ান্ত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষদের শারীরিক সুখের স্বার্থকে এক কুৎসিত স্বার্থ বলে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছি। জোর দিয়ে বলতে পেরেছি বিয়ের আগে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্মতিসূচক শারীরিক সম্পর্ক করার স্বাধীনতা থাকুক, বিবাহবিচ্ছেদের পরেও থাকুক কিন্তু বিবাহবন্ধনে থাকাকালীন এমন স্বাধীনতা পাওয়া উচিত নয়। আমার বিবাহবিচ্ছেদ হলেও সন্দীপের তো হয়নি। যতদিন পর্যন্ত আদালতের অনুমতিক্রমে সে তার অনাকাঙ্ক্ষিত বিবাহের জাল থেকে বেরিয়ে আসতে না পেরেছে ততদিন পর্যন্ত সে আমার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। তাহলে তার আগে এভাবে কথায় কথায় হলেওবা কাছে আসাটা পরকীয়াই তো হল! কি করে আমি তাকে সমর্থন করলাম! কি করে? হ্যাঁ, জানি কি করে—ভালবাসার কাছে ঝুঁকে গিয়ে—এমন ভালবাসা যা মানুষকে এভাবে সব বিলিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে যেতে প্ররোচিত করে। একেই কি সন্দীপের ভাষায় সেই পরম ভালবাসা বলে?

ফোনে ফোনে আমার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে সন্দীপের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হল। দেখলাম আগের মতো নিজেকে আর দরিদ্র মনে করছে না সে। খুশি খুশি ভাব। কিন্তু আমার চারদিকে কোথাও কোন খুশির হাওয়া নেই। কোন আলো নেই। আমার মনে হচ্ছে আমি সেই কালো সমুদ্রের মধ্যেই রয়ে গেছি অথবা সেই কালো সুড়ঙ্গে। সেখান থেকে না বেরোতে পারছি না ভালো মানুষটির দেখা পাচ্ছি। আমার বড় রাগ হচ্ছে সন্দীপের ওপর। ওকে বলছি, ''আমরা আসলে কি করছি জানো? আমরা আসলে ভালবাসার অভিনয় করছি ইংরেজিতে যাকে ফ্লার্ট করা বলে। ফ্লার্টকে আমি ঘৃণা করি।''

''সন্দীপ বলে, ''না, না।''

সে আমার কথাকে ভালো করে শুনলই না, অথবা শুনেও বিশেষ গুরুত্ব দিল না। প্রয়োজনই মনে করল না গুরুত্ব দেওয়ার। ভাবি পুরুষ জাতটা এমনই বেইমান। এমনই মতলবি। স্বার্থসিদ্ধির পরে এক মুহূর্তের জন্যও আবেগকে বাঁচিয়ে রাখে না। নয়তো আবেগ ছাড়াই সবকিছু করে। সন্দীপ একদিন আমায় বলেছিল, ''তুমি আমাকে নিয়ে অকারণ ভয় পাচ্ছ। তাহলে শোনো যে মহিলার প্রতি আমার কোন আবেগ নেই সে যদি আমার সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েও থাকে আমার ভেতরে সেক্সের কোন ইচ্ছেই জাগবে না।'' প্রয়োজন ছিল না তবু জিজ্ঞেস করেছিলাম, ''আর যদি আবেগ থাকে তাহলে?'' ফোনের এপার থেকেও বুঝতে পেরেছিলাম সে বেশ কয়েকবার হাঁ-বাচক ভঙ্গীতে মাথা নড়িয়েছিল, ''তাহলে সমস্যা আছে।'' সুতপাকে বলেছিলাম সে কথা। শুনে সে বলছিল, ''ছাড় তো! পুরুষ জাত হল শালা কুত্তার জাত। মেয়ে দেখলেই হল, ওদের আবেগ তৈরি হতে এক সেকেন্ডও সময় লাগে না।''

সন্দীপের না না শুনে কৃত্রিম কঠিনতা দেখিয়ে বলি, ''আমিও এনজয় করছি।''

''রূপা আমাকে বোনের বাড়িতে যেতে হবে।''

''যাও,'' হতাশাভরা অনুমতি আমার।

''দশটায় যাব।''

''তুমি আমাকে অনেক কিছুই শেখাচ্ছো সন্দীপ।''

''জাহাজে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আরব সাগরে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখার জন্য অপেক্ষা করছি।'' জীবনের সফরকে জাহাজের সফরের সঙ্গে তুলনা করে সন্দীপ বলে, ''পথ চলে সবসময় যে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতেই হবে তার কোন মানে নেই।''

তাই কি? ''ঠিক বলেছ।''

''আমি এমন এক কালকের স্বপ্ন দেখি যখন পার্থিব সবকিছুকেই অর্থহীন মনে হবে। আকাঙ্ক্ষা থাকবে শুধুমাত্র একটি জিনিসেরই—শাশ্বত সুখের...শাশ্বত সুখ।''

সন্দীপের কথা শুনে আমি সত্যিই খুব বিভ্রান্ত হই। চমৎকৃতও। এই মানুষটি এত জরবাদী, এত দেহাত্মবাদী আবার একইসঙ্গে অশরীরী অবিনশ্বর পরমাত্মার পরমস্থিতিতে বিলীন হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় পরিবৃত।

বলি, ''তুমি পাবে শাশ্বত সুখ।''

''কখন পাব? কোথায় পাব? কিভাবে পাব?''

''তোমার ঈশ্বর জানেন। কিন্তু আমার মন বলে তুমি নিশ্চয় পাবে।''

''এই পৃথিবীতে চমৎকার তো কিছু হয় না।''

''হতেও পারে।''

''তুমি যখন বলছ, হয়ত অসম্ভব নয়...''

সন্দীপের সঙ্গে পরিচয়ের আগেই তাপসদার সঙ্গে সোনালিকে নিয়ে আমার একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। আমি সোনালিকে অ্যাডভোকেটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে ড্রাফ্‌ট লিখে দিয়ে কলকাতায় চলে গিয়েছিলাম। সেকথা শুনে তাপসদাও তাঁর হাত ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। এখানকার একজন বয়জ্যেষ্ঠ বাঙালি মহিলাও পরপর কয়েকদিন সোনালির সঙ্গে কোর্টে গেছেন শুনেছি। যেন সাহায্যের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। মহিলা বলেছেন, ''আমি তোমাকে আমার অ্যাডভোকেট দেব। চিন্তা করো না, সে খুব কম টাকায় কাজ করবে এবং অল্পদিনের মধ্যেই কোর্টের রায় বের করে দেবে।'' সোনালি আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, ''কি করি? উনিও আমাকে অনেক সাহায্য করছেন।'' আমি বলেছিলাম, ''তাঁর অ্যাডভোকেটের কাছেই যা। নানাজনের নানামতের মাঝখানে আমি আমার মত টিকিয়ে রাখতে পারব না। কিছু করতে পারব না তোর জন্য।'' তাপসদা শুধু সোনালি কেন, সোনালির মা-বাবার সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। তাঁরা কলকাতায় আছেন নাকি ব্যাঙ্গালোরে ছেলের কাছে গেছেন, কবে গেছেন, কবে ফিরছেন, ফেরার পথে পুনেতে আসছেন কি আসছেন না সব খবর পকেটস্থ করে উনি দিনে কম্পানি এবং রাতে হোটেল চালাচ্ছেন। উনি সোনালির বাবাকে মৃদু ধমকেছেনও, ''কি করেছেন আপনি! মেয়েকে শুধু আকার আয়তনে বড় করে বি এ পাশ করিয়ে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন! বেঁচে আছেন তাই দশ হাজার করে পাঠাতে পারছেন। একবার ভেবে দেখেছেন এখনই যদি আপনি অফ্‌ হয়ে যান তাহলে আপনার মেয়ের কি হবে?''

সোনালির বাবা শান্ত প্রকৃতির মানুষ। বিনা প্রতিবাদে নিজের ভুল মেনে বলেছেন, ''এখন আপনিই ওর সহায়। অনেক কিছুই তো করছেন ওর জন্য।''

''আমি আর কি করতে পারছি! দু'মাসে পঞ্চাশ প্লেট ভেজেটেবল চপের অর্ডার আর দেড়শো প্লেট দইবড়ার অর্ডার পেয়ে কি ব্যাংকের ই এম আই ভরা যায়?''

সোনালিকে সাহায্য করা নিয়ে তাপসদার বাড়িতে অশান্তি এবং বাঙালি মহলে জল্পনা কল্পনা শুরু হয়েছিল কিন্তু তাপসদা তা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাননি—এক্সপেরিয়েন্স-এর জায়গাটাকে খালি রেখে সোনালির বিশাল একটা বায়োডেটা তৈরি করে উনি কল্যাণী নগরে পিনাকল গ্রুপের হেড অফিসে তাকে ইন্টারভিউ দিতে নিয়ে গেছেন। ইন্টারভিউতে সোনালি ভীষণই খারাপ করেছে। গৃহবধূর আসল চেহারা নিয়ে মুখ বন্ধ করে বসে থেকেছে। রান্নার রেসিপি এবং রান্নার বাইরে মোবাইলে হোয়াটঅ্যাপ ও ফেসবুকের ডিপি চেঞ্জ করা, বার্থডে'র ফটো পোস্ট করা, মেসেজ করা, মন্তব্য করা ছাড়া কিছু জানে না সে। জি মেল, এম এস ওয়ার্ড, অফিস, এক্সেল তার জ্ঞান-পরিধির বাইরে। সে কম্পিউটার অন করতেই জানে না। তবু চাকরিটা হয়ে গেছে। ইন্টারভিউ-এ পয়েন্ট উঠিয়ে দিয়েছে সোনালির চোখের জল এবং তাপসদার সঙ্গে কম্পানির মালিকের পরিচিতি।

সোনালির চাকরি পাওয়ার খবরটা অনেক পরে তাপসদা আমায় ফোন করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ''তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরি আলোচনা আছে। সোনালিকে নিয়েই। আমরা আসলে তোমার বাড়িতে এসে সামনাসামনিই কথা বলব ভাবছিলাম।''

সোনালি ভালো ড্রয়িং পেন্টিং করে, তাই সে ড্রয়িং স্কুল খুলে বসতেই পারে। সোনালি ভালো রান্না করে, তাই সে ক্যাটারিং-এর ব্যবসা করে বিশাল আয়ের স্বপ্ন দেখতেই পারে। সোনালি দেখতে সুন্দর, তাই ধনী কাউকে বিয়ে করে রাতারাতি অনেক টাকার মালকিনও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু পঞ্চাশ বছর বয়সে উপরোক্ত উপায়ে সোনালির মতো গৃহবধূ যে মেয়ের দায়িত্ব সামলে কম্পানিতে চৌদ্দ হাজার টাকা মাইনের চাকরি হাসিল করা তো দূরের কথা চাকরি করার কথাই ভাবতে পারে তা আমার কল্পনার অতীত। তাপসদাকে জিজ্ঞেস করি, ''বিয়ের কথা বুঝি?''

''হ্যাঁ, আমি ওকে বিয়ে করছি। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। শুধু মালাটা কি করে বদল করব তাই ভাবছি,'' বেশ গম্ভীর তাঁর গলা। গলায় অসন্তোষ।

''মালা বদল করার আবার আলাদা আলাদা পদ্ধতি আছে নাকি!''

''তুমি না, এমন এমন সব কথা বল...মাথাটা গরম হয়ে যায়।''

''কেন? আপনিই তো এক রাতে আমার ঘরে ডিনার করতে এসে বলেছিলেন, সোনালিকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন।''

''সেটাও মাথা গরম হয়েছিল বলেই বলেছিলাম।''

সেদিন তাপসদার মাথা আমি জ্বলন্ত চুল্লীতে বসাইনি। সেদিন তাঁর মাথা গরম হয়েছিল জনগণের 'কাজ নেই তো খই ভাজ' পর্বের সমালোচনায়।

তাপসদা বলেন, ''শোনো। সোনালিকে আমি একটা চাকরি করিয়ে দিয়েছি। এটা এখনও পর্যন্ত আর কাউকেই বলা হয়নি। ইন্টারভিউটা অনেকদিন আগেই হয়েছে,

মে মাসের দুই তারিখে জয়েনিং-এর ডেট পেয়েছে। কিন্তু তার আগে তোমার সঙ্গে কথা বলার ছিল...”

“জয়েন তো পাক্কা করছে তাই না?”

“হ্যাঁ।”

অভিমান হল এতদিন আমাকে জানায়নি বলে। “তাহলে আলোচনার আর কি প্রয়োজন? সুংসবাদ পেলাম এটাই যথেষ্ট!”

ফোন কেটে দেন তাপসদা। মেসেজ করেন, “তুমি এত হিংসেপরায়ণ জানা ছিল না।”

“হিংসেপরায়ণ কেন হব? শুধু বলেছি আলোচনার কি আর বেঁচে আছে? সিদ্ধান্ত তো হয়েই গেছে...”

“না, কম্পিউটার অপারেট করতে শেখা বা অন্য অনুরূপ ব্যাপারে তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে।”

“সে সাহায্য আমি করে দেব।”

আমার ভালো খারাপ মুডের ধকল সামলে তাপসদা বেশ কয়েকদিন আমাকে একরকম ভুলে গিয়েই তাঁর কম্পানি এবং হোটেল চালিয়ে গেলেন। তারপর, সন্দীপের সঙ্গে পরিচয়ের বেশ কয়েকদিন পর উনি অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়ে আমায় ফোন করলেন। সন্দীপকে নিয়ে একের পর এক অনেক প্রশ্ন করে গেলেন। আমি ধরা পড়ে যাওয়া চোরের মতো উত্তর দিলাম। আমাদের প্রশ্ন উত্তরের পর্বটা ছিল এরকম—

তোমার নতুন বন্ধুর নাম কি?

সন্দীপ।

আমি পুরো নাম জানতে চাইছি।

সন্দীপ রায়।

কি করে?

চাকরি।

কোথায় চাকরি করে জানতে চাইছি।

রেলে।

কোন রেলে জানতে চাইছি।

সাউথ ইস্টার্ন।

কোয়ালিফিকেশন কি?

বি টেক।

কোথায় থেকে বি টেক করেছে জানতে চাইছি।

দিল্লি আই আই টি থেকে।

কোথায় থাকে?

কলকাতায়।

কালকাতার কোথায় জানতে চাইছি।

আনোয়ার শাহ্ রোডে।

বয়স কত?

চুয়ান্ন বছর।

কয় ভাই বোন?

দুই ভাই তিন বোন।

বোনেরা কি করে?

যতদূর জানি কেউ চাকরি করে না। ঠিক বলতে পারব না।

বোনেরা সব বিবাহিতা?

হয়ত। ঠিক বলতে পারব না।

কোথায় থাকে সব?

যতদূর জানি একজন দিল্লিতে থাকে এবং বাকি দু'জন কলকাতায়।

বাকি দু'জন কলকাতার কোথায় থাকে?

যতদূর জানি একজন গড়িয়াতে থাকে এবং আরেকজন কাছাকাছি কোথাও। ঠিক বলতে পারব না।

কি যতদূর জানি আর ঠিক বলতে পারব না করছ। পাকা খবর নাওনি?

না। যা বলেছে শুনেছি।

পাকা শুনেছ তো?

হ্যাঁ, কিন্তু গিয়ে চোখে দেখে খবর পাকা কিনা যাচাই করে দেখা হয়নি।

''ঠিক আছে, করো করো, চুটিয়ে প্রেম করো,'' অভিভাবকের পদ থেকে সরে এসে তাপসদা এবার বন্ধু হয়ে যান।

''চুটিয়ে প্রেম করছি না । প্রেম প্রেম ভাব করছি।''

''মানে বুঝলাম না।''

''মানে শুধু এনজয় করছি।''

সন্দীপকে তাপসদার কথা বললে সে আমাদের সমস্ত কথোপকথন থেকে তার স্বভাবসিদ্ধ দোষে শুধুমাত্র একটি শব্দই বেছে নেয়—এনজয়। জিজ্ঞেস করে, ''কি এনজয় করছ?''

আমি জানি সে আমার মুখ থেকে সেক্স নিয়ে শুনতে চাইছে। জেনেও মুখ বন্ধ রাখি। আমি তো আসলে তা এনজয় করছি না। শুধু বলার জন্য বলেছি। বলেও মরমে মরছি এর পরেও শেষপর্যন্ত সন্দীপের মধ্যেকার সেই ভালো মানুষটির দেখা পাব কিনা এই সংশয়ে।

সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করে, ''কি এনজয় করছ?''

''কিছু না।''

''বলো আমাকে।''

''কল করো, বলছি।''

সন্দীপ আমাকে বলে, ''তোমার মতিগতির কোন ঠিক নেই।''

''কেন তোমার এমন মনে হল?''

''কখনও হ্যাঁ বল কখনও না। কখনও বলো জানো কখনও বলো জানো না। তুমি কি সত্যিই জানো না?''

''কি?''

''ওই এনজয়মেন্টের ব্যাপারটা?''

''আমার মনে হচ্ছে না আমি এনজয় করছি।''

''খুব ছেলেমানুষ তুমি। আমার মনে হয় তোমার মেয়ে তোমার থেকে বেশি পরিণত।''

''এই!'' মিথ্যে মিথ্যে ধমকাই ওকে। ''তোমার জানা দরকার যে প্রেসিডেন্ট আমার সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করেন। শুধু প্রেসিডেন্টই কেন, প্রেসিডেন্টের মতো আরও অনেকে আছে। অনেকেই তাদের সমস্যা নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে আসে। তারা বিশ্বাস করে যে আমার কাছ থেকেই উপযুক্ত পরামর্শ তারা পেতে পারবে। তোমার সঙ্গে আমার সব হ্যাঁ না তোমারই ননসেন্স ফিলিংসের জন্য হচ্ছে।''

''তোমার মেয়ে তোমার কাছ থেকে কি শিখেছে?''

''সেও আমার মতো সম্পর্ক ভাঙা গড়ার খেলাকে ঘৃণা করতে শিখেছে।''

''আর?''

''সৎপথে চলতে শিখেছে।''

''আর?''

''আর কি বলব? আর কিছু না।''

''বলো...''

''তার প্রেমিকের নামও সন্দীপ ছিল। সে বলছে সব সন্দীপগুলোই নালায়ক বেরোল।

''নালায়ক মানে?''

''জানো না? নালায়ক মানে অযোগ্য।''

সন্দীপ রিলির সন্দীপের ইংরেজি বানান আলাদা করে দিল। বলল, ''দুটো সন্দীপ আসলে এক নয়। তোমার মেয়ের প্রেমিকের নামের উচ্চারণটা দীর্ঘ ই টেনে হবে।''

বলি, ''প্রথমদিকে আমি অনেক সিরিয়াস ছিলাম।''

''কি নিয়ে?''

''তোমাকে নিয়ে।''

''আমার ননসেন্স ফিলিংস নিয়ে?''

''কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তোমাকে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।''

''এছাড়া কি আমার জন্য অন্য কোন বিকল্প আছে?''

''নিশ্চয় নেই।''

সারারাত তারার দিকে তাকিয়ে থেকে ভোর হতেই সন্দীপের দৃষ্টি পৃথিবীতে আমার দিকে ফিরে আসে। লেখে, ''গুড মর্নিং। হাউ ইজ লাইফ?''

মন আমার আবার সন্দীপের প্রতি ভালবাসায় ভরে আসে। ''ভালবাসি।''

''লাই ইউ ডিপলি।''

''সত্যি?''

''সত্যি। তুমিও কি আমাকে সত্যিই ভালবাস?''

''সত্যি। অনেক।''

''আর?''

''আর কি সন্দীপ? তোমার এই আর-এর মানেটাই আমি বুঝি না।''

''ভিডিও কল করো। বুঝিয়ে দিচ্ছি।''

ভিডিও কলে সন্দীপ আবার আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। কপালে চুমু খেল, নাকে চুমু খেল। সে তার ঠোঁট দিয়ে আমার ঠোঁট ভিজিয়ে দিল, গলা ভিজিয়ে দিল। হাত দিয়ে স্পর্শ করল আমার বুক। তারপর আরও কাছে এসে লম্বালম্বিভাবে শুয়ে পড়ল আমার উপর। আমার শরীরের প্রত্যেকটা অংশের সঙ্গে নিজের শরীরের প্রত্যেকটা অংশ মিলিয়ে দিল। কোথাও এতটুকু ফাঁক রাখল না। আমি আবার ওর পার্থিব চাহিদার কাছে হেরে গেলাম। হেরে গিয়ে আরও অনেকটা হাঁটলাম অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে। তবু সেই ভালো সন্দীপের সঙ্গে আমার দূরত্ব বিন্দুমাত্র কম হয়েছে বলে মনে হল না। হতাশায় মন ভরে গেল আমার। ভাঙা ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, ''কি সুখ পেলে?''

''তুমি কি পরম সুখের কথা বলতে চাইছ? আমি জানতাম একমাত্র তুমিই আমাকে সেটা দিতে পারবে। তাই সবসময় তোমার কাছেই আমি তা চাইতে থাকি।''

কোন সুখ বলতে চাইছি আমি জানি না সন্দীপ। শুধু জানতে চাইছি কি সুখ পেলে। তুমি কি আমার কাছ থেকে এই সুখই আশা করো? এই সুখই চাও? এই সুখই কি তোমার সেই পরম সুখ? ''তোমার আগের অভিজ্ঞতা হয়ত তোমাকে সব মেয়েদের একই মাপকাঠিতে বিচার করতে শিখিয়েছে। কিন্তু এটা ঠিক নয়।''

''সত্যি বলেছ...অভিজ্ঞতা খুব খারাপ জিনিস।''

''আমি জানি আমি কেমন। আমি কখনও কাউকে প্রতারণা করি না।''

''এটা খুব ঠিক কথা যে সবাই একরকম নয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমার অভিজ্ঞতা আমাকে বলেছে যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসার রঙ ফিকে হয়ে যায়।''

''আমার ভালবাসার রঙ ফিকে হয় না সন্দীপ। তাই আমার মনে হয় বন্ধন কতটা মজবুত থাকবে তা একমাত্র আমার সঙ্গীর ওপরই নির্ভর করবে।''

''আমাদের কিভাবে এগোনো উচিত?''

''সময় আমাদের পথ দেখাবে। এখন আমি একটা কথাই বলতে চাই। এর পরেও যদি তুমি সুখী না হও তাহলে পরমানন্দ তোমার কাছে এক শ্রুতিকথা হয়েই থেকে যাবে। আমার আর করার কিছুই থাকবে না। একসঙ্গে থাকার ব্যাপারে এই মুহূর্তে তোমার কি কোন পরিকল্পনা আছে?''

''না, সময় কি বলে দেখতে দাও।'' আমারই জবাব ফিরে আসে আমার কাছে।

এমন অন্তরঙ্গ মুহূর্তে আমার সন্দীপের মন পড়তে ভীষণ ইচ্ছে করে। বলি, ''আমাদের তো এখনও দেখা হল না।''

''কোথায় কখন কিভাবে আমাদের দেখা হবে?''

''আমরা একে অন্যের চেহারাকে পছন্দ নাও করতে পারি,'' নিজের কথার রেশ টেনে চলি আমি।

''ভিডিওতে পরস্পরের যেরকম চেহারা দেখেছি তা নিশ্চয় আসল চেহারা থেকে খুব একটা অন্যরকম হবে না।''

মোটা মেয়ে সন্দীপের একদম পছন্দ নয়। সন্দীপের নেওয়া এই পরীক্ষায় খুব

সম্ভব আমি উত্তীর্ণ হয়ে যাব। আমার চিন্তা ছিল আমার উচ্চতা নিয়ে।

সন্দীপ বলে, ''তুমি আমার সমান সমান হলে আমাদের মাথা ঠোকাঠুকি খেত। বরং ভালো হয়েছে—আমার বুকের কাছে থাকবে। আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরে হাঁটব।'' 'জড়িয়ে ধরে হাঁটব' বলার সময় বাঁ হাতটাকে সে অর্ধবৃত্তাকারে সামনে ঘুরিয়ে দেয় এবং আমি সেই অর্ধবৃত্তাকার ছোট্ট পরিধির মধ্যে নিজেকে অনুভব করি। এমন ভালবাসার স্বাদ পেয়েও দুষ্টুমির ইচ্ছে মোটেও কম হয় না। বলি, ''তোমার আমার...বিশেষত তোমার সন্দীপ তোমার! তোমার বাস্তব চেহারা যদি অনেকটা আলাদা হয়?''

''যদি অনেকটা আলাদা হয়েও থাকে তাহলে কি তাকে অনুভূতি দিয়ে অতিক্রম করা যাবে না?''

''তুমি এতক্ষণে উপযুক্ত জায়গায় এসে ধরা পড়ে গেলে সন্দীপ। আধ্যাত্মিক প্রেম শুধুমাত্র মনের অনুভূতিকে কেন্দ্র করে বিরাজ করে। এতদিন আধ্যাত্মিক প্রেমের ধ্বজা ধরে তুমি আসলে শারীরিক ভালবাসাকে খুঁজে বেরিয়েছ। কোনও না কোনভাবে আদায় করেছ তা আমার কাছে থেকে। সেই স্বাদে টইটুম্বুর হয়ে আমার কথায় এখন স্বাদ হারানোর ভয়ও তুমি পেয়েছ। সাক্ষাতে আমার যদি তোমাকে পছন্দ না হয় তাহলে কি হবে! আমি জানি সেই কারণেই তুমি এখন মনের ভালবাসা দিয়ে আমাকে দুর্বল করে দিতে চাইছ। মন দুর্বল হলে তোমার চেহারা যতই কুৎসিত হোক না কেন আমাদের শারীরিক সম্পর্কের জন্য তা কোন বাধার সৃষ্টি করবে না। আশা করি তোমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর তুমি পেয়ে গেছ।''

''তাহলে আর অপেক্ষা কেন?''

''ঠিক বুঝলাম না।''

''তাহলে তো আমরা এগোতে পারি।''

''কিসের জন্য এগোবো?''

''ফোন করো, বলছি।''

দুপুর দুটো বারোতে শৈবাল ঘোড়াই পরপর তিনটে মেসেজ করেছে—

''প্লীজ ৯০৫১২৮৮১৪৯-এ কল না হলে মেসেজ করুন।''

''আপনি আমার পলতার বাড়িতে আসুন।''

''আপনাকে এখনই বিয়ে করতে চাই।''

লাঞ্চের সময় বিয়ের খিদে পেয়েছে তাকে। ফোনে ঝাড়ব ভেবে কল করতে বলি। কল করে না। আধ ঘণ্টা পরে একটা মেসেজ স্টিকার পাঠায়—

মেধাবীরা পারলে উত্তর দাও,
দুই দুয়ে চার
চার চারে আঠারো

পাঁচ পাঁচে আটাশ
ছয় ছয়ে চল্লিশ
আট আটে কত?
উইশ ইউ গুড লাক...শৈবাল ঘোড়াই, কলকাতা।
আবার বলি, ''কল করুন।''

এবারও সে কল করে না। ঘণ্টা তিনেক বাদে ঝুলন্ত আপেলে প্রায় সব পাতা ঢেকে যাওয়া একটা গাছের ফটো পাঠায়।

পরদিন শৈবাল ঘোড়াই আগের দিনের তিনটে মেসেজ আবার পাঠায়। তারপর একটা গোলাপ ফুল পাঠায়। লেখে, ''শুধু তোমারই জন্য।'' তারপরের কয়েকদিনও নিয়মিত তার গুড মর্নিং গুড নাইট জাতীয় মেসেজ পাই। ওকে আবার কল করতে বলি কিন্তু তা না করে সে তার ফটো পাঠায়। লেখে, তোমার কি দেহের খিদে নেই? আই হ্যাভ ট্রিমেন্ডাস সেক্সুয়াল থার্স্ট। আমি তোমার কাছ থেকে এক্সট্রিম সেক্স চাই। তুমি কি দেবে? প্লীজ উত্তর দাও।''

স্কুল ইনস্পেক্টরের রুচি এবং সাহস দেখে আমার মাথা জ্বলে যায়। লিখি, ''আপনার অফিসের ঠিকানা তো আমি জানি। আপনার বিরুদ্ধে একটা কমপ্লেন লঞ্চ করতে হবে মনে হচ্ছে।''

লোকটি ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, আরও সাহস দেখিয়ে ফেলে, ''আটচল্লিশ বছরের একজন মহিলা লাইফ পার্টনার চাইছে...কিসের জন্য?''

আমার এবং আমার মতো মহিলা যার মা-বাবা নেই, কোন ভাইবোন নেই, দেওর-ভাসুর-জা নেই তার একজন জীবনসঙ্গীর দরকার। বয়স আটচল্লিশ হয়েছে বলে একটু রয়ে সয়ে দরকার হয়। পঞ্চান্ন হলে অবিলম্বে দরকার হত। অনিন্দিতাকে ফোন করি। নমুনার কথাবার্তাগুলো শোনাই ওকে। অনিন্দিতা বলে ''করিস না বিয়ে।''

''লোকজনের ছিরি দেখে ইচ্ছে তো করে না। কিন্তু ভাবছি আমার বায়োপসির রিপোর্টটা তাহলে কাকে আনতে পাঠাবো।''

''রূপা!'' আতঙ্কিত গলা অনিন্দিতার।

''কি হয়েছে? চিৎকার করছিস কেন?''

''তুই বায়োপসির টেস্ট করতে দিয়েছিস, আমাকে বসিলনি তো!''

''কে বলেছে দিয়েছি? তবে ভবিষ্যতে তো দিতে হবে।''

''বাজে কথা বলছিস। তোর ওই রিপোর্টের দরকার পড়বে না কখনও দেখে নিস।''

''কি করে জানলি?''

''ভগবান তোকেই কি শুধু সবকিছু ফ্রীতে দেবেন? আরে বাবা তাঁর তো অন্য সন্তানও আছে।''

''যদি তাই হয় তাহলে ঘুমের বড়ি খেতে চাইছিলি কেন? পটাশিয়াম সায়ানাইড-এর জন্যই বা এত কাতর হওয়ার কি ছিল?''

''তা ঠিক। উনি শুধু আমার প্রতি অনেক পক্ষপাতিত্ব করে ফেলেছেন।''

তা ঠিক বলেই হঠাৎ ভারি হয়ে আসে অনিন্দিতার গলা।

''আচ্ছা, বায়োপসির কথা ছাড়। যদি হার্ট অ্যাটাক হয়? কয়েকদিন আগেই এমনই কিছু একটা হতে হতে বেঁচে গেছি।''

''ভেতর থেকে ঘর লক করিস না। রিলি ইন্টারলক লাগিয়ে ডিউটি যাবে।''

''রিলি যদি বিদেশে চলে যায়?''

''যেতে দিস না ওকে বিদেশে।''

''তা হয় না অনিন্দিতা। তাছাড়া কলকাতাতেও আমি একা থাকি। সেখানে শুধু ইন্টারলক লাগিয়ে রাখলেও কোন লাভ হবে না। চাবি তো আমারই কাছে থাকবে।''

''আমারও তোর মতো অবস্থা হচ্ছে। কিন্তু আমি না ডিভোর্স দিতে পারব না নতুন কোন সঙ্গীর কথা ভাবতে পারব।''

আমার মতো মহিলার জীবনসাথীর প্রয়োজনটি কোথায় তা শৈবাল ঘোড়াই-এর মতো বিকৃত মস্তিষ্কের লোককে বোঝানোর ইচ্ছে আমার নেই।

ঘোড়াইকে লিখি, ''আমি কেন বিয়ে করতে চাইছি তা নিয়ে আপনার মূল্যবান মতামতটি নাহয় পুলিশ স্টেশনে গিয়েই আপনি রাখবেন।''

''আপনি আমাকে ব্ল্যাকমেল করছেন?''

''আপনার সব মেসেজই পুলিশকে দেখানো হবে। এটাকে ব্ল্যাকমেল বলে নাকি হোয়াইটমেল সেটা আপনিই ভালো বুঝবেন।''

''ওকে। গড ব্লেস ইউ।''

''চাকরি তে যাবেই। হতে পারে সংবাদপত্রে মহিলাদের অশ্লীল মেসেজ করার জন্য নিজের একটা বড় ছবিও দেখতে পেলেন।'' পরের দু'মিনিটের মধ্যে হোয়াটসআপে লোকটির ডিপিটি গায়েব হয়ে গেল।

আপদ তাড়িয়ে সকাল সকাল ট্রেডমিলে চড়ে বসেছি। ওয়াকিং সেরে আমাকে তৈরি হতে হবে। বপদেওঘাট যাব বন্ধুদের সঙ্গে। জায়গাটা আমি মাত্র কয়েকমাস আগে রিলির মাধ্যমেই চিনেছি। রাজা এসেছিল। আমরা তিনজন গিয়েছিলাম। আমাদের বাড়ি থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরে বপদেওঘাটে একটি ছোট পাহাড় আছে এবং ছোট মন্দির আছে। আর কিছু নেই। তবু ভালো লাগে। পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে নিচের রাস্তায় চলমান রঙবেরঙের গাড়িগুলো বড় আকর্ষণীয়। সূর্যাস্তের দৃশ্যও মনোমুগ্ধকর। সেসব দৃশ্য আমার মোবাইলের ক্যামেরায় ধরা ছিল, আজ ট্রেডমিলে হাঁটতে হাঁটতে সন্দীপকে পাঠিয়ে দিয়েছি। সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছে, ''একা যাচ্ছ। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না?''

''চলে এসো এখানে।''

''ইশ্, গত পনেরোদিন আমার কোন কাজ ছিল না...''

''জানো সোনালি জিজ্ঞেস করছিল, তোর হিরোর খবর কি?''

''তুমি কি বললে? হিরোটা জিরো হয়ে গেছে?''

একটা গানের লিঙ্ক পাঠায় সন্দীপ—আমার স্বপ্ন তুমি ওগো চিরদিনের সাথী। ট্রেডমিলে হাঁটতে হাঁটতেই চালিয়ে দিই গান। ভালো লাগায় ভরে যায় মন। তারপর

আরেকটি গানের লিঙ্ক পাই—তারে আমি চোখে দেখিনি তার অনেক গল্প শুনেছি, গল্প শুনে তারে আমি অল্প অল্প ভালবেসেছি। সন্দীপকে জিজ্ঞেস করি, ''তুমি আমাকে অল্প অল্প ভালবেসেছ?''

''না না। এতটাও অল্প নয়। একটু বেশি।'' মাঝে মঝে এভাবেই সে আমার মনে সংশয়ের ঝড় তোলে আর তখন আমি নানা কথার পাকে ঘুরতে থাকি।

''বলি, ''সোনালি দেখতে সুন্দর। ও আমার চেয়ে অনেক লম্বাও।''

''আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই রূপা। শুধু তোমার সঙ্গে।''

''আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব...শুধুই দেখা...কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই।''

''এখনই উড়ে চলে এসো। আমাদের এই সম্পর্কটা তাহলে উদ্দেশ্যহীন সম্পর্ক হবে।''

'' উদ্দেশ্যহীন সম্পর্ক নয়। আমাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক হওয়ারই নেই সন্দীপ। শুধুই দেখা হবে।''

''এখনই উড়ে চলে এসো। উদ্দেশ্যহীন দেখা হবে।''

''ঠিক তাই।''

''অ্যান্ড?''

''একসঙ্গে ডিনার অথবা লাঞ্চ করব।''

''ঠিক আছে...এখনই উড়ে চলে এসো। তোমার সঙ্গে কতটা দূরত্ব রেখে চলতে হবে আমাকে?''

''কয়েকটা দিন সময় দাও। বলব।''

''ঠিক আছে কল করো।''

''আরেকটা জিনিস হতে পারে। এয়ারপোর্টে তুমি আমাকে রিসিভ করতে আসবে বলেছিলে। যদি তাই হয় তাহলে আমরা গাড়িতে বসে ঠিক করব যে আমাদের আরও দেখা করার প্রয়োজন আছে কিনা।''

এবার সন্দীপ লেখে, ''সকালে তুমি পরম সুখের কথা বলেছিলে। বিকেলে উদ্দেশ্যহীন দেখা'র কথা বলছ। রাতে বলবে আমি তোমাকে ঘৃণা করি।'' মোহের আবেশ থেকে বেরিয়ে আসে সে, ''হয়ত এভাবেই আমাদের এগোনো উচিত। ঠিক আছে, উড়ে চলে এসো। আজ রাতেই আমরা একসঙ্গে ডিনার করব।''

''অবশ্য তুমি অসুস্থ হলে আমাকে পাশে আশা করতে পারো।'' এমন কথা আমি সন্দীপকে আগেও অনেকবার বলেছি। যতবার বলেছি ততবার সে উঁ আ করেছে, বুকে হাত রেখে বলেছে, ''আমার এখানে খুব ব্যথা করছে।'' কিন্তু আজকে সে বলছে, ''তা কি করে সম্ভব? তুমি তো অনেক দূরে আছ।'' জিজ্ঞেস করে, ''আমাদের উদ্দেশ্যহীন সাক্ষাতে আমাকে তোমার সঙ্গে কিভাবে মিশতে হবে?''

''একটু ভুল বলেছি। সাক্ষাৎ একদম উদ্দেশ্যহীন হবে না। আমরা ভাবব কত ঘন ঘন আমরা দেখা করতে পারি। কিভাবে আমি তোমার অসময়ে পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারি।''

''ধন্যবাদ। আমি তোমাকে ভালবাসি বলতে পারব না। বলার অনুমতি তুমি আমাকে দাওনি।''

তা কেন হবে? ভালবাসার মতো ভালবাসা কেন ভালো লাগবে না! কিন্তু দুনিয়া যা দেখছি তাতে আমার একটি গানের দুটি লাইন মনে পড়ছে। প্রথমটি হল, এমন একটি মানুষ খুঁজে পেলাম না যার মন আছে এবং দ্বিতীয়টি, ভালো বাসা অনেক পেলাম ভালবাসা পেলাম না। অনিন্দিতা বলে যে ভালো বাসা ওকে ভালবাসা দিতে পারেনি সেই ভালো বাসা সে চায় না। এখন বিলাসপুরে পড়ে আছে শুধুমাত্র মেয়ের জন্য, মেয়ে দাঁড়িয়ে গেলে যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে বেরিয়ে চলে যাবে। গানের উল্লেখিত বেদনাদায়ক লাইনটি আমি উল্টোভাবে গাই—ভালবাসা অনেক পেলাম ভালো বাসা পেলাম না। আমি উল্টোভাবে দুটোকে দাবি করি—ভালবাসা দিয়ে ভালো বাসা তৈরি করতে চাই। ভালো বাসা মানে অট্টালিকা নয়। ভালো বাসা মানে হল প্রেম-প্রীতি ভরা বাসস্থান। কাঁচা অথবা আধপাকা হলেও চলবে। সন্দীপের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা যত না এগিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি এগিয়েছে ক্ষণস্থায়ী শারীরিক ভালবাসার কথা। এত দূরে থেকেও। কলকাতায় এলে ওর সঙ্গে আমার আর কি কি হবে তার আন্দাজ লাগাতে চাইছি না। ভয় করছে। আমার মন বলছে আমি যে ভালবাসা চাইছি সেই ভালবাসা কারও কাছ থেকে পাওয়ার যোগ্যতা আমি রাখি না। যদিও সন্দীপই বলেছে এটা হতে পারে না। ঈশ্বর নিশ্চয় আমার জন্য কাউকে আগে থেকেই বানিয়ে রেখেছেন। আমাকে শুধু তাকে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কিভাবে করব তাকে গ্রহণ? আমার মতো করে? নাকি তাদের মতো করে? আমার মতো করে গ্রহণ করার সুযোগ তো কেউ আমাকে দিতে চাইছে না। শুধু তাদের মতো করে গ্রহণ করার জন্য চাপ দিচ্ছে। বড্ড যন্ত্রণাদায়ক হয়ে পড়ছে এমন ভালবাসার উপহার। সন্দীপ বলে ওরও নাকি ভয় করে। ওর ভয় আমার ভয়কে আরও বাড়িয়ে দেয়। সে বলে তার কাছে কাউকে দেওয়ার মতো কিছু নেই। ওর কথা শুনে ওর সঙ্গে ভালো বাসার যে অস্পষ্ট ছবি আমি এঁকেছিলাম তা আরও ঝাপসা হয়ে যায়। তাই বলে ওকে দিয়ে রাখা আমার এ মন আমি ফিরিয়েও নিতে পারি না। আমি আমার প্রতিশ্রুতি থেকে কখনই সরে আসতে পারব না। কিন্তু ওর কাছ থেকে সেই ভালবাসার আশাও আমি আর করব না। তাহলে নিশ্চয় কলকাতায় সাক্ষাতে আমি ওর থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতে পারব।

আমার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রাখার ইচ্ছে দেখে সে আবার বলে, ''উড়ে চলে এসো।'' জিজ্ঞেস করে, ''এসে কি করবে?''

''কি করব মানে?''

''অ্যান্ড...অ্যান্ড... কি হবে তারপর?''

না চাওয়ার পরেও সন্দীপের 'এবং' এসেই যায়, সে আমাকে বুঝিয়ে দেয় ভাগ্যের ঝুলি শূন্য রাখতে সে মোটেও পছন্দ করে না।

'বলি, ''সন্দীপ, আমার সুস্থ হতে আরও সময় লাগবে।''

''ঠিক আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে এসো। আমরা যদি কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই মাঝে মাঝে দেখা করতে পারি তাহলেও চলবে।'' আমি জানি চলবে না। একদিন চলবে একটু মুশকিল করে। দু'দিন চলবে অনেক মুশকিল করে। তিনদিনের দিন আর চলবেই না। সেদিন উদ্দেশ্য তৈরি হবে। হবেই হবে। সে জানতে চায়,

আমরা কি জুনের ছয় তারিখে দেখা করতে পারি?"

"এত ইচ্ছে করছে? নিজেকে সংযত করো সন্দীপ।"

"ঠিক আছে করলাম।"

"কি করছ এখন?"

"তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।" অনেকক্ষণ আগেই সে আমাকে ফোন করতে বলেছিল।

পরদিন সকালে সন্দীপ 'গুড মর্নিং' জানিয়ে শান্ত হয়ে যায়। দুপুরে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তুমি কি ব্যস্ত আছে?" সে লিখেছিল 'হ্যাঁ, একটা মিটিং-এ আছি' এবং আমি লিখেছিলাম 'কে' অর্থাৎ 'ওকে'। কিন্তু সন্দীপ 'কে'কে 'কিস'এর রূপ দিয়েছে। সে তার চাকরি নিয়ে সমস্যায় আছে বলেছে। তাকে এখনও পর্যন্ত কোন পোস্ট দেওয়া হয়নি। বেশ কয়েকদিন অফিসে যাচ্ছে, ডিউটি আওয়ারের পুরোটা সেখানে কাটিয়ে ঘরে ফিরছে, তারপর অফিসে কি হল না হল তা নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাইছে। ওর অফিসের সমস্যা আমি খানিকটা বুঝেছি। সে বলে দু'তিনজন কলীগ তার কলকাতায় ফিরে আসাটাকে পছন্দ করছে না, তাই তার ট্রান্সফারের ফাইলটাই গায়েব করে দেওয়া হয়েছে, ডুপ্লিকেট ফাইল বানাতে হয়েছে, সেই ফাইল নিয়ে সে কার কাছে গেছে, উনি ফাইল কোথায় ফরওয়ার্ড করতে বলেছেন সেইসব। অফিসের সময়টাতে আমি ওকে ফোন করে বিরক্ত করতে চাই না। কিন্তু সে-ই মাঝে মাঝে আমার খবর চেয়ে এস এম এস করে। অফিস থেকে ফিরেও মেসেজ করে। কলও করে।

আমি কলকাতায় যাওয়ার জন্য একটু একটু করে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছি। সাংহাইতে যাওয়ার আগে আমার কয়েকদিনের জন্য হলেও একবার কলকাতায় যাওয়া প্রয়োজন। প্রস্তুতিতে রিলিও সামিল হয়েছে। সে আমাকে তার অনেকানেক বর্জিত জামাকাপড়ের উত্তরাধিকার বানিয়ে দিচ্ছে। সময়ে অসময়ে, অফিস যাওয়ার আগে, অফিস থেকে ফিরে তার ঘরের হ্যাঙ্গার থেকে পটাপট টপ, প্যান্ট, শাড়ি, ব্লাউজ, ফ্রক, কোট, ব্লেজার নামিয়ে বলছে ট্রায়াল করো। ট্রায়ালের পরে আমি সেসব জিনিসের বারোটা বাজিয়ে ছাড়ছি। যেমন টপকে ফ্যাশনেবল ব্লাউজ বানাচ্ছি, ব্লাউজকে টপ। প্যান্টকে বারমুডা বানাচ্ছি, শাড়িকে র‍্যাপার রাউন্ড। সেসব নিয়ে শপিং মলে ছুটছি তাদের কাউন্টারপার্ট খুঁজতে। রিলির মতামতকে আমি মোটেও গুরুত্ব দিচ্ছি না তবুও রিলি কখনও কখনও আমাকে মলে যেতে সঙ্গ দিচ্ছে। একটা ব্লাউজে পরিণত টপের জন্য সাদা শাড়ি কিনে নিয়ে এসেছিলাম। তা দেখে রিলি বলে আমি নাকি আমার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। "মাম্মা, তুমি বুঝতে পারলে না তোমার শাড়ির সাদা রঙ আমার টপের সাদা রঙ থেকে কত আলাদা? চলো, আমি আসছি তোমার সঙ্গে। শাড়ি এক্সচেঞ্জ করব।"

দোকানে শাড়ি এক্সচেঞ্জ হল না। রঙ পাওয়া গেল না। টাকা ফেরত পেলাম। টাকা হাতে আমরা অন্য শোরুমে যাব বলে নিচে নেমেছি এমন সময় সন্দীপ আমাকে শৈবাল ঘোড়াই নিয়ে উত্যক্ত করে। বলে, "ওকে বিয়ে করে নাও, লোকটি পয়সাওয়ালা, অনেক সাহসী।"

''আমি ওকে ব্লক করে দিয়েছি সন্দীপ।''

''কল করো। আমাকে বাইরে যেতে হবে।''

''আমি শপিং-এ বেড়িয়েছি।''

''ঠিক আছে...''

''কালকে।''

''কালকে কি?''

''কাল কল করব।''

''আমার ফিরতে একটু রাত হবে...ধরো এগারোটা...''

''বললাম তো, তাহলে কাল কথা হবে।''

''চলবে।''

''তোমার সঙ্গে কি আর কথা বলব সন্দীপ? তুমি চুমু এবং একসঙ্গে ঘুমনো ছাড়া কিছু বোঝ না। তোমাকে আমি যেভাবে চেয়েছিলাম সেভাবে পেলাম না তাহলে।''

''মনে হচ্ছে তোমার মেজাজ ঠিক নেই।''

''মেজাজ খুবই ঠিক আছে।''

''কখন তোমাকে আমি এমন কথা বলেছি?''

তুমি জানো না বুঝি? সবসময়ই বলছ সন্দীপ? সবসময়ই তো বুঝিয়ে চলেছ।

রাতে সে দশটার দিকেই ঘরে ফিরে যায়। ফোন করে আমায়। জানতে পারি অফিসের একটা পার্টি ছিল। আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য ছটফট করতে করতে পার্টি শেষ হওয়ার আগেই বেরিয়ে এসেছে সেখান থেকে। শুনে খুশি হই আবার হইও না। আমার অতীত নিয়ে সন্দীপের কোন আগ্রহ নেই। বর্তমান নিয়ে, প্রতিদিনের সমস্যা নিয়ে কোন আগ্রহ নেই। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও কোন আগ্রহ নেই তার। সে কখনও জিজ্ঞেস করে না আমি কি পেতে চাই তার কাছ থেকে, কি চাই না। আমি সত্যিই বুঝি না সন্দীপের সঙ্গে আমার সম্পর্কের ভবিষ্যৎ কি।

সকাল চারটে পঁয়ত্রিশে সে আমাকে গুড মর্নিং জানায়। একঘণ্টার মধ্যে আমার দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে জিজ্ঞেস করে, ''তুমি কি আমার সঙ্গে সুখী নও? বলো। হাউ ইজ লাইফ?''

কি বলব ওকে? কি বোঝাবো! কতবার বলব! কতবার বোঝাবো!

অফিস যাওয়ার সময় সে বলে, ''রাস্তায় ক্যাবের জন্য অপেক্ষা করছি।''

জানতে চাই, ''ক্যাবে করে যাও?''

''হ্যাঁ। আমার কোন পোস্ট নেই, তাই গাড়িও নেই।''

''ওহ্!''

''এই গরমে এভাবে অফিস যাওয়াটা একটু কষ্টকর।''

''বুঝতে পারছি। আমার তোমার জন্য কষ্ট হচ্ছে।''

''শীতকাল হলে অটো, ট্যাক্সি করে অফিস যেতে আমার কোন অসুবিধে হত না। কি করি, এখানে খুব পলিটিক্স চলছে। ওরা চাইলে আমাকে একটা গাড়ি দিতেই পারত। তা না করে আরও সমস্যার সৃষ্টি করছে যাতে করে আমি কলকাতার বাইরে পোস্টিং নিয়ে চলে যাই।''

''তোমার একটা সেলফি নিয়ে পাঠাও তো,'' জীবনে প্রথমবার আমি কোন পুরুষের ফটো চাইলাম। পাঠালো সে। বললাম, ''তুমি আমাকে অল্প অল্প ভালবেসেছ? কিন্তু ভলবাসা একশো শতাংশ না হলে তার কাছে যে যেতে আমার দ্বিধা থাকে সন্দীপ।''

''আমাকে আরও ৭২০ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।''

''তোমার সেই আমার স্বপ্ন তুমি ওগো চিরদিনের সাথী গানটা কিন্তু বেশ।''

''আমার ভালো লেগেছে তাই ভাবলাম তোমারও ভালো লাগবে।''

''এসব আমারই কথা।''

''মানে?''

''মনে হচ্ছে গানটির কথাগুলো আমিই লিখেছি। আরেকটা ফটো পাঠাও প্লীজ। তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।''

''আর আমার বুঝি দেখতে ইচ্ছে করে না?''

''ওহো সন্দীপ, আরেকটা ফটো পাঠাও। সবথেকে কুৎসিত। তোমার যে কোন চেহারা আমার ভালবাসা দিয়ে সুন্দর হয়ে উঠবে।'' পাঠায় সে ফটো। বলি, ''লাভ ইউ।''

''হান্ড্রেড পার্সেন্ট?''

''আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিশুদ্ধতায় বিশ্বাস করি।''

অফিসে পৌঁছে সে লেখে, ''আজ অফিসও বেশ গরম। আমাকে অতি সতর্কতার সঙ্গে খেলা খেলতে হবে। এসে প্রথমেই খুব বাজেভাবে ধাক্কা খেয়েছি। এখন অবস্থা একটু ভালোর দিকে।''

''বুঝতে পারলাম না।''

''বাজেভাবে ধাক্কা খেয়েছি মানে আমি যার সঙ্গে আমার সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েছিলাম উনিও আমার সঙ্গে খুব রুক্ষভাবে কথা বলেছেন। পরে অবশ্য উনি নিজেই আমাকে ডাকলেন। বললেন টেনশন না নিতে।''

''তুমি এখন অফিসে মন দাও। আমাকে খুব জরুরি কারণ ছাড়া মেসেজ করতে হবে না।''

''ঠিক আছে। কিন্তু রূপা...''

''বলো।''

''তুমি কত প্রপোজাল পাচ্ছ। আমাকে কেউ পছন্দ করছে না।'' ভারত ম্যাট্রিমোনি থেকে আমার কাছে আসা প্রপোজালগুলোর মধ্যে থেকে কয়েকটি আমি সন্দীপকে ফরওয়ার্ড করেছিলাম। তাদের কাউকে সে সুদর্শন বলেছে, কাউকে পয়সাওয়ালা বলেছে, কাউকে রোমান্টিক। বলে এখন আমাকে জিজ্ঞস করছে, ''কি করি আমি?''

''আমার কাছে চলে এসো।''

''আগে বলতে। এখন তো শৈবাল ঘোড়াই মাঝখানে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু তুমি তার সঙ্গে কি করে থাকবে? সে তো ঘড়ঘড় করে নাক ডাকবে।''

''ওই লোকটিকে নিয়ে মজা করো না প্লীজ। তুমি নাক ডাকো না?''

''যদি বলি হ্যাঁ?''

''খুব খারাপ।''

''আগে ডাকতাম। কিন্তু একটা হোমিওপ্যাথ ওষুধ নিয়েছিলাম। আশ্চর্যজনক ভাবে ঠিক হয়ে গেছি।''

''কিন্তু আমি একথা জানতেই বা চাইছি কেন! তুমি নাক ডাকলে বা না ডাকলে আমার কি এসে যায়!''

''তুমি ঘুমোতে পারবে না।''

দুষ্টুমি করি, ''কিন্তু সন্দীপ আমি তো তোমার ঘরে ঘুমোতে যাচ্ছি না, তাই না?''

''যেখানেই ঘুমোও। তুমি ওই আওয়াজটা বন্ধ করতে পারবে না। তুমি কি আসছ?

''কোথায়? তোমার ঘরে?''

''কলকাতায়।''

''এই মুহূর্তে নয়। তুমি তো জানো আমি অসুস্থ। কিন্তু কলকাতায় এসে আমি দশ মিনিটের জন্য তোমার ফ্ল্যাটটা দেখতে আসতে পারি। নিশ্চিত বলতে পারছি না। বিয়ের পরে এখনও পর্যন্ত আমি কোন একা-পুরুষের ঘরে প্রবেশ করিনি।''

''আমার ঘরে এসো বা না এসো কলকাতায় এসো। কল করো আমাকে।''

''একটু পরে।''

''কেন? এখন কেন নয়?''

''আমি এখন রিলির কাস্টডিতে আছি...''

রিলির সন্দীপের সঙ্গে রিলির সম্পর্ক কেটে যাওয়ার পর থেকে সঞ্জয় নামে রিলির একটি ক্লাসমেট রিলির পেছনে খুব ঘুরঘুর করছে। ছেলেটি বিনম্র, সুদর্শন এবং আমার অতি পরিচিত। পুনেতেই একটি কম্পানিতে চাকরি করে। ছেলেটির নাকি কোস্ট গার্ড হওয়ার খুব ইচ্ছে। তার জন্য দুটো লিখিত পরীক্ষায় পাশ করেছে। এখন বাকি রয়েছে ভাইভা। সেটা ক্লিয়ার (পাশ) করতে পারলে সে চেন্নাইতে চলে যাবে। আমি অনেকবারই রিলিকে জিজ্ঞেস করেছি, ''সঞ্জয় তোমাকে কিছু বলেনি?''

''কি বলবে?''

''প্রেমের প্রস্তাব দেয়নি?''

''বলেছে, আই লাইক ইউ।''

আমি রিলির একক অভিভাবক। ওর বাবা শুধু মাসে রিলিকে দু'শো ডলার পাঠানোর এবং ফোন করে ওর খোঁজ নেওয়ার দায়িত্ব পালন করে। বাকি সব দায়িত্ব আমার। রিলির স্বার্থের ওপরে আমার কোন স্বার্থ নেই। প্রাধান্য পেতে পারে না আমার স্বার্থ। ওর বাবা বাইরের মেয়েদের নিয়ে রসরঙ্গ করে বেড়ানোর সময় নিজের মেয়ের কথা ভাবেনি। ভাবেনি যে ঘরের লোককে এভাবে পেলে রিলির ছেলেদের ওপর থেকে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যেতে পারে, অসুরক্ষিত হয়ে যেতে পারে ওর ভবিষ্যৎ। কিন্তু আমি তো সেভাবে চলতে পারি না। রিলির সুরক্ষার ব্যাপারে আমি বড়ই চিন্তিত। জানতে চেয়েছি, ''সে বিয়ের কথা কিছু বলেছে নাকি আই লাইক ইউ বলে চুপ হয়ে গেছে?''

''তার মানেই তাই হয় মাম্মা।''

''তোমার কোন আপত্তি আছে?''

''আমি এখনই বিয়ে করব না।''

''প্রেম তো করতে পারো।''

অস্থির হয়ে আপত্তি করেছে রিলি, ''মাম্মা, যার-তার সঙ্গে প্রেম হয় না। আর আমি ওকে বিয়ের কথা ভাবতেই পারছি না।''

'কেন?''

''আমার ওর প্রতি কোন ফিলিংস নেই।''

''ফিলিংস ধীরে ধীরে তৈরি হয়ে যেতেও তো পারে।''

''না, আমার এমন হয় না।''

মাঝে মাঝে রিলি সঞ্জয়ের সঙ্গে হ্যাং আউট করে। যাওয়ার সময় অথবা তৈরি হতে হতে আমাকে বলে, ''ইশ্, ছেলেটা ভালোই ছিল। আমার মনে হয় খুব জেন্টল, কুল। আমাকে অনেক বোঝে সে। আমার সঙ্গে অনেক অ্যাডজাস্ট করে। আমি রাগ দেখালেও সে রাগে না। কিন্তু ওই যে বললাম...ফিলিংসই নেই।''

একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, ''ছেলেটিকে এত ভদ্র, বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েও তোমার পছন্দ হল না। তোমার আসলে কেমন ছেলে পছন্দ?''

হাতের তর্জনীকে দাঁড় করিয়ে আধো আধো গলায় রিলি বলেছিল, ''দেখো, রিলায়েবল তো হতে হবেই। তার ওপর তাকে আমার মতো অ্যানিমে, মাঙ্গা পছন্দ করতে হবে। ওর মধ্যে সেন্স অফ হিউমার থাকতে হবে। ওকে ভালো টেক্সিং জানতে হবে। অর্থাৎ...অর্থাৎ...,'' হেসেছিল রিলি। ঘরের ছয় বাই ছয় আয়নাটির মধ্যে রিলির চেহারার প্রতিচ্ছবিতে ওর কঠিন বাংলা বলতে পারার অহংকার ফুটে উঠেছিল। মিষ্টি মিষ্টি সেই অহংকার। অহংকারের শাব্দিক প্রকাশ করেও ফেলেছিল সে, ''অর্থাৎ বললাম শুনেছ?''

''হ্যাঁ, শুনেছি,'' আমিও হেসেছিলাম। এই হাসি কোন পরম আনন্দ থেকে ছিল না। কারণ রিলিকে আমি নির্ভরযোগ্য কারও সঙ্গে কল্পনাই করতে পারি না। রিলি একা। একদম একা। আমি কখনো কাছে আছি তো কখনো নেই। তাছাড়া দুনিয়াতে আমি আজ আছি তো কাল নেই। সেই কালকের পরে এই পার্থিব জগতে আমার অন্য শহরে থাকাটাকেও অনুভব করতে পারবে না সে। তখন কি হবে!

অঙ্গ দুলিয়ে রিলি বলেছিল, ''টেক্সটিংকে ভালো তখনই মানব যখন দেখব তাতে ইন্টেলিজেন্সের ছাপ আছে...সেক্স ফেক্স তো কয়েকদিন পরেই খতম হয়ে যাবে। তারপর তো এসব নিয়েই থাকব...''

তাই তো! সুতপার ব্যাখ্যা এবং রিলির ব্যাখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। একশো শতাংশ। ব্যাখ্যা একই, শুধু প্রকাশের ধরন আলাদা। দু'জনেরই বক্তব্য—বিয়ের কিছুদিন পরে যখন শারীরিক সম্পর্ক এক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়, শিহরণ কমে যায় শরীরের, তখন স্বামী-স্ত্রী-সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পরস্পরকে ভালো লাগার অন্য প্লাটফর্মগুলোর সাহায্য নিয়েই চলতে হয়, পারলে আরও মজবুত করতে হয় সেগুলোকে।

''সন্দীপ খুব সুন্দর টেক্সটিং করত। ওর মতো আর কাউকেই পাচ্ছি না,'' আফসোসের ভঙ্গীতে মুখ দিয়ে হাল্কা করে চুকচুক আওয়াজ বের করেছিল সে।

চলছিল এমনই।

আজ একটু আগেই সন্ধ্যাবেলায় রিলি বেশ উত্তেজনা নিয়ে ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বলল, ''মাম্মা একটা সুখবর আছে। মনে হচ্ছে এবার আমি আমার পছন্দের কাউকে পেয়েছি।''

জিজ্ঞেস করে জানলাম ছেলেটি আমাদের বাড়িই কাছাকাছিই অর্থাৎ এক কিলোমিটারের মধ্যেই বিশ্রান্ত সোসাইটি নামে একটা হাউজিং কমপ্লেক্সে থাকে। নাম ঋষভ। সেও বি টেক করেছে, সেও রিলির কম্পানিতেই চাকরি করে। অন্য ফেজ-এ। কিন্তু অফিসে সে খুব কমই যায়। বেশি ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে। এরই মাঝখানে ক্যাবে যাতায়াতের সময় কোন একদিন দু'জনের পরিচয় এবং ফোন নম্বর দেওয়া নেওয়া হয়েছে। আমি ব্যস্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে। দিন দু'য়েক আগে কলকাতার মালিনী নামে একটা পত্রিকায় একটা গল্প পাঠিয়েছিলাম। এডিটর মায়া সিদ্ধান্ত সেখানে কিছু সংশোধন চেয়ে ফোন করেছেন। বলেছেন আজই পাঠাতে, আজই ওটাকে ডিটিপিতে দেবেন। আমার ব্যস্ততাকে একদমই পাত্তা দেয় না রিলি। ''শুনছ কি? একটু পরেই ও আমাদের বাড়ি আসবে। ঘর ভীষণ এলোমেলো, গোছাতে হবে সব।''

''তো গোছাও না। কে মানা করেছে!''

''তোমার হেল্প চাই।''

''আমাকে একটু সময় দিতে হবে রিলি।''

শুরু হয়ে গেল ধুমধাড়াক্কা। ওর ঘর থেকে একগাদা শীন, লেনো পেরস, এইচ অ্যান্ড এম, জারা, বিবা, স্টক বাই লাভ-এর খালি বাক্স ছিটকে বেরিয়ে পড়ল ড্রয়িং রুমে, দশ বারোটি প্যান্ট-টপ-ফ্রক বেরোল, তিন জোড়া জুতো বেরোল, তিন-চার দিন আগের খাওয়ার থালা-বাটিও বেরোল। এছাড়া ছোটখাটো ক্লিপ, সেফটিপিন, লিপস্টিক, কমপ্যাক্ট ইত্যাদি তো আছেই। ''মাম্মা এসো প্লীজ...।'' শুনি তার উচ্চকণ্ঠের ডাক। পরক্ষেণেই ড্রয়িং রুমে আবার তার আবির্ভাব। আমার কোন অজুহাত, কোন মিনতি খাটে না। হাতে ভয়ংকর টান খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে ওর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ি। ''দেখেছ অবস্থা? আমি একা পারছি না।'' মনে হয় যেন আধুনিক যুগের জামাই-ষষ্ঠীর প্রস্তুতি চলছে। জামাইকে এখনও দেখা হয়নি। প্রথমবার দেখব। রিলি বলে, জামাইকে আমার পছন্দ নাও হতে পারে। গায়ের রঙ শ্যামলা, চেহারা স্থূল, দেখতে সাধারণ।

অবাক হলাম, ''তুমি তাকে কেন পছন্দ করলে? তোমার সন্দীপের সামনে ঋষভ তো কোনমতেই দাঁড়াতে পারবে না।''

''তুমি কি ভুলে গেছ যে সন্দীপ একটা ধোঁকাবাজ? ওটা কি ওর আসল চেহারা ছিল?''

''কেমন ছিল সে দেখতে?''

''সেও অনেকটা এইরকমই ছিল।''

আমার মনে হল রিলির সন্দীপ ওই মডেলটির চেহারা দেখিয়ে রিলিকে যতই ধোঁকা দিক না কেন রিলির পছন্দের টেক্সটিং-এর জোরে বাইসেপসহীন, সিক্স-প্যাকহীন মেদবহুল অবয়ব নিয়ে তার হৃদয়ের কোণে এখনও নিজের জায়গা বানিয়ে রেখেছে।

আর নিজের অজান্তেই অনুরূপ চেহারা নিয়ে বিশ্রান্ত সোসাইটির এই ছেলেটি চলেছে সেই জায়গাটি দখল করতে। জিজ্ঞেস করি, ''সেই জন্যই বুঝি তুমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইছ?''

''না।''

''তবে।''

''ছেলেটি খুব ব্রিলিয়ান্ট। সে অটোমেশন রিলেটেড একটা প্রোগ্রাম ক্রিয়েট করেছে। অফিস ইউজ করছে সেই প্রোগ্রাম। সেইজন্যই তো ওয়ার্ক ফ্রম হোম করার পারমিশন পেয়েছে। এমনি এমনি নাকি!'' 'এমনি এমনি নাকি' কথাটা আসলে অসম্পূর্ণ। আমি বুঝি। সম্পূর্ণ করলে এরকম হত—এমনি এমনি ওকে বাড়িতে ডেকেছি নাকি! ''তাছাড়া ও ভালো টেক্সটিংও করে। এই দেখো।'' টেক্সটিং দেখানোর পাল্লায় পড়ে ঘর গোছানো কিছু সময়ের জন্য স্থগিত থাকে।

সে আমাকে লিখেছে, ''আমি তোমাকে যে কারণে টেক্সট করেছিলাম তা হল...তুমি কি স্ট্যান্ডআপ কমেডি পছন্দ করো?''

আমি লিখেছি ''খুব বেশি নয়।''

সে লিখেছে, ''নেভার মাইন্ড...''

আমি লিখেছি, ''আমি শুধু ওটাকু নিয়ে পড়ে থাকি...যারা অ্যানিমে ও মাঙ্গাতে আছে।''

সে—''আমি অ্যানিমে ফলো করি কিন্তু তাই বলে আমাকে ওটাকু বলা যাবে না।''

আমি—''আমার একটা বন্ধু ছিল। আমি তার সঙ্গে তোমার কিছু মিল খুঁজে পাচ্ছি।''

সে—''হঠাৎ করে হয়ে গেছে। আমি ভাবছিলাম বিশ্ব কল্যাণ রাঠের শো দেখতে যাব কিন্তু কাউকে সঙ্গে পেলাম না। আমার অফিস কলীগরা ভীষণ অলস এবং আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ফেলা এখন ইউনাইটেড স্টেটস-এ আছে। আমার মাকে সঙ্গে নিতেও কোন আপত্তি ছিল না কিন্তু মা বেশি রাতে বাইরে বেরোতে ভয় পান।''

আমি—''তোমার সঙ্গে আমার মিল আছে। আমারও বেস্ট ফ্রেন্ড ব্যাঙ্গালোরে আছে। আমার কলীগদেরও একই অবস্থা। কাউকে বন্ধু বলে মনে হয় না। আমার মম্ সবে কলকাতা থেকে ফিরেছেন। উনি এখন আমায় কিছু গল্প শোনাচ্ছেন।''

সে—''আমাকে স্ট্রেঞ্জার ভেবো না। যে কোন সময় তুমি আমার সঙ্গে চ্যাট করতে পারো।''

আমার চোখ একবার রিলির মোবাইলের দিকে, একবার আমার মেবাইলের দিকে। রিলির হাতে মোবাইল। আমার হাতে মোবাইল। আমার হাতের মোবাইলে মাঝে মাঝে টুং টাং আওয়াজ হচ্ছে। সন্দীপের মেসেজ ঢুকছে তাতে। সন্দীপ লিখেছে, ''কল করো না...''

''কল করো না...''

''কল করো না...''

''আজ তোমাকে দেখিনি...''

রিলি চিৎকার করে, ''এখন তোমার মোবাইল সুইচ অফ করো মাম্মা।'' পরক্ষণেই আবার নরম হয়ে যায় সে। আহ্লাদের স্বর ভেসে বের হয় ওর গলা থেকে, ''ভালো কিনা বলো?''

''খুব ভালো।''

''আরও শোনো...''

''একটু দাঁড়াও প্লীজ। শুধু বলে দিই পরে কথা বলছি।''

সন্দীপকে লিখি, ''মেয়েটা বড় জ্বালাচ্ছে। আমাকে ওর ঘর পরিষ্কারের কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। মেসেজই করতে দিচ্ছে না।''

''তাই তো বলছি...মেসেজ করার দরকার নেই। কথা বলো আমার সঙ্গে...''

''আরে আমাকে একেবারে বেঁধে রেখেছে। ক্লান্ত হয়ে পড়ছি।''

''তোমার মেয়ের তার মায়ের ওপর পুরো অধিকার আছে...আমার কোন অধিকার নেই...''

রিলি পরের আরও কয়েকটি মেসেজ পড়ায়। তাতে বুঝি কম্পানি ছেলেটিকে ছয় মাসের জন্য মেক্সিকোতে পাঠাবে। সেখান থেকে ফিরে একটা প্রোমোশন নিয়ে সে জয়েন করবে অন্য কম্পানিতে। ইন্ডিয়াতে অথবা বাইরে।

এক জায়গায় দেখি রিলি লিখেছে, ''আমি সাধারণত বই পড়তে পছন্দ করি কিন্তু চাকরিতে জয়েন করার পরে সেটা আর তেমন হয়ে উঠছে না। এটা আমার জন্য একটা হতাশাজনক ব্যাপার।''

''তুমি কি ধরনের বই পড়তে ভালবাস?''

''মানুষকে নিয়ে লেখা বই।''

''যদি তাই হয় তাহলে আমি মনে করি মানুষের সঙ্গে কথা বলতে তোমার আরও বেশি আগ্রহ থাকা উচিত...''

রিলির কথা, ''মাঝে মাঝে মনে হয় আমি নিজের সঙ্গে প্রতারণা করছি। প্রতারণা করতে করতে হারিয়ে ফেলছি নিজেকেই।''

''একে বলে এভলিউশন। এটা অনবরত আমাদের মধ্যে হতেই থাকে। খারাপ কিছু নয়।''

''এমন এভলিউশন স্বাভাবিক প্রজাতির জন্ম দেয়! আমি তাদের মধ্যে পড়তে চাই না।''

''ওহ্, তার মানে তুমি সমস্যাটা আগেই বুঝে ফেলেছ। বুঝে পরিবর্তন আনতে চাইছ। নিজেকে অধিকতর ভালোর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার চাইতে প্রশংসনীয় কিছু তুমি নিজের জন্য করতে পারো না।''

রিলিকে বলি, ''বাহ্, বুদ্ধিমান ছেলে তো!''

আজকাল যেমন অনেক মেয়ে স্বনির্ভর হয়েও স্বামীর ঘাড়ধাক্কা খেয়ে সমাজের ভয়ে, আরও বেশি অসুরক্ষার ভয়ে এবং ছেলেমেয়ের কথা ভেবে সেই স্বামীর পায়েই পড়ে থাকে তেমনই অনেক মেয়ে অতীত ভুলে এগিয়ে যায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। অনেক মেয়ে শুধু স্বামীকে শারীরিক সুখ দিয়েই খুশি হয় না, নিজেরাও চায় সেই সুখ এবং সেই সুখ পেয়েও একঘেয়েমিতে নিরাশ হয়। নিরাশ হয়ে অথবা

অন্য কারও ভালবাসার মোহে বেরিয়ে যায় বন্ধন থেকে। আবার অনেক মেয়ে মানসিক স্থিরতা বজায় রেখে স্বামীর মধ্যে অন্য ভালো লাগার জায়গাকে বাঁচিয়ে রেখে নিরুপদ্রব জীবন কাটিয়ে দিতে পারাটাকেই জীবনের চরম সফলতা বলে মনে করে। প্রথম দলে অনিন্দিতা ও সোনালি পড়ছে দ্বিতীয় দলে আমি পড়ছি এবং শেষ দলে রিলি পড়ছে। সুতপা আগে তৃতীয় দলে ছিল, এখন রিলির দলে যোগ দিয়েছে।

ছেলেটি আসে অবশেষে। রিলি তাকে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে যায়। আমি বাইরে থেকে ওদের কথাবার্তার আওয়াজ পাই, বেশ জোরে জোরে। রিলি তার জামাকাপড়, জুতো, ব্যাগ, কসমেটিকস, জুয়েলারি, আসবাবপত্র, যাবতীয় সংগ্রহের বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছে। নিজের স্টুডিও-ঘর নিয়ে প্রশংসা শুনতে খুব ভালবাসে সে। ছেলেটি করছিলও প্রশংসা। ঘর দেখানো হলে সে ছেলেটির সঙ্গে ডিনারে বেরিয়ে যায়। আমার ডিনার হয় না। চোখে ঘুম নেই। সন্দীপের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে নেই। ভীষণ উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করি—কি হল কি হল ভাবি। সে ফিরল রাত এগারোটায়। বলল, ''হবে না মনে হচ্ছে।''

''কেন?''

''বিশেষ স্পার্ক ফিল করলাম না।'' আমার মুখে হতাশা ফুটে উঠেছে, সেটা লক্ষ্য করেই রিলি আমাকে এক দুর্বল আশ্বাসে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল, ''চিন্তার কিছু নেই। ছেলেটিও বুঝতে পেরেছে। আমরা আপাতত বন্ধু হয়ে থাকব। দেখা যাক, যদি পরে মনে হয়...।''

পরের বেশ কিছুদিন রিলি ছেলেটিকে নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করল না। শেষে আমিই জিজ্ঞেস করলাম। রিলি বলল, ''ডিজগাস্টিং!''

''কেন?''

''ক্যাবে আমার নাম নিয়ে মজা করেছে।''

বেচারা। রিলি নিজের অপছন্দ জানিয়ে দিলেই হয়ত শুধরে যেত, কিন্তু সেই সুযোগটিই সে পেল না।

কলকাতায় খুব গরম পড়েছে এবং তার খবর আমি অনেকের কাছেই পাচ্ছি। সন্দীপও বলেছে খুব অসহনীয় অবস্থা। কলকাতার গরমের মধ্যে বসে বসে কিংবা শুয়ে শুয়ে তার সংজ্ঞার পরম ভালবাসাকে হাতড়ে বেড়াচ্ছে সন্দীপ। আমাকে জিজ্ঞেস করছে, ''কখন কোথায় থেকে কিভাবে পাব তা?''

''আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে তুমি সব পাবে সন্দীপ *অবশ্যই বিয়ে নামক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েই* কিন্তু মরে গেলে কিছু পাবে না।''

''আমি জানি ডিয়ার...''

অনবরত মেসেজ করছে সে। অনবরত আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, আমার স্পর্শ পেতে চাইছে। সকাল পাঁচটা থেকে শুরু করে রাত বারোটা পর্যন্ত সে একই

কথা বলছে, ''তুমি আমাকে মেরে ফেলছ রূপা। কি করি বলো। বলো না প্লীজ, কল করো, আমি আর পারছি না।"

''কিচ্ছু করতে হবে না তোমাকে। আমি আছি," প্রতিশ্রুতি দিই কিন্তু বুঝতে পারি না কি করে থাকব আমি ওর সঙ্গে। কি পরিচয় নিয়ে। সন্দীপ আমায় কল করতে বলছে। আমি জানি কল করলেই সে আবার ওইসব ভালবাসাবাসির কথায় যেতে চাইবে। কি লাভ হবে তাতে? কি প্রগতি আসবে আমাদের সম্পর্ককে স্থায়ী করার পথে? কেন সে সরাসরি জানাচ্ছে না আসলে কি চাইছে সে আমার কাছে? এর আগে একবার সে আমায় বলেছিল ওর সঙ্গে থাকলে আমার খুব অসুবিধে হবে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন। সে বলেছিল, ''আমার অল্প টাকার মধ্যে তোমাকে ম্যানেজ করতে হবে।" আমার তো তাতে কোন আপত্তি নেই। সে আমাকে ভালবাসলে, আমাকে ছেড়ে থাকা সম্ভব নয় বুঝলে আমার চেহারাও আমাদের সম্পর্কের পথে বাধা হওয়া উচিত নয়। তাহলে একমাত্র ওর ডিভোর্সের শর্ত ছাড়া আমাদের বিয়েতে আর কোন শর্ত বেঁচে রইল না। এবং বিয়ে যদি হবেই তাহলে বিয়ে পর্যন্ত আমরা আমাদের শারীরিকভাবে কাছে আসার বাসনাকে দমন করে রাখতেই বা কেন পারব না! আর কেনই বা ততদিন তা সম্ভব হচ্ছে না ভেবে 'তুমি আমাকে মারছ' বলে কাতরাতে থাকব! জীবনে অনেক ভালবাসা পেয়েছি। মরীচিকা হয়ে এসেছে সব, মরীচিকা হয়ে উধাও-ও হয়ে গেছে সব। এবার যদি সত্যিই ভালো কিছু আমার দিকে আসার জন্য পা বাড়িয়ে দিয়েছে ধীরে ধীরে ভারি পদক্ষেপ ফেলে আসুক তা, আমার কাছে এসে শিকড় গেড়ে বসুক। পালিয়ে তো আমি যাচ্ছি না। আর যদি বিয়ের আগে পালিয়েই যাই তাহলে তো সব চুকেই গেল। দুর থেকেই দূরে চলে গেলাম। ক্ষতি তো কিছু নেই! ওর ধনসম্পত্তি হাতিয়ে নিয়ে তো যাচ্ছি না। ওর পুরুষত্ব, ওর সম্মান ছিনিয়ে তো নিয়ে যাচ্ছি না। এতদিন পর্যন্ত আমি ওর সঙ্গে যা করেছি ওর পীড়াপীড়িতেই করেছি। আমি সম্পর্কের যে সাধারণ সমীকরণ বুঝি তা সন্দীপ বোঝে না।

সন্দীপকে আশ্বস্ত করে রাগও হয় আমার। বলি, ''তোমার ডিভোর্সের ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি করো এবং তারপর তোমার মনের মতো একজন মহিলাকে বিয়ে করো। একজন পুরুষ একমাত্র তার স্ত্রীকেই সবসময়ের জন্য পাওয়ার আশা করতে পারে। কথাটি আমাদের মেয়েদের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। এই দেখো না আমার দুটো বিয়ে সফল হল না। তবু আমি বিয়ে নামক ইনস্টিউশনের প্রতি শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র হারাইনি। এটাই আমাদের সভ্য দুনিয়াতে একজন পুরুষ এবং একজন নারীর কাছাকাছি আসার একমাত্র সম্মানীয় রাস্তা। সেক্ষেত্রে আমাকে যদি তুমি তোমার উপযুক্ত না মনে করো চলবে।"

এসব কথা বলতে আমার মন চায় না। আমি সন্দীপকে ছাড়তে চাই না। চাই না সন্দীপও আমাকে ছাড়ুক। আমি তাকে শুধু বাজিয়ে দেখতে চাই।

সন্দীপ বলে না যে সে আমাকে বিয়ে করবে, বিয়ে করে আমারই চিরসাথী হয়ে থাকবে। সে বলে, ''না না আমার শুধু তোমাকেই প্রয়োজন। কল করো। কল করো। প্লীজ কল করো।"

এই প্রয়োজন শব্দটার অর্থ কি? মন বলে সে আমাকে রক্ষিতা হিসেবে পেতে চাইছে। আহত হয় আমার সম্মান। আমারও ওর সঙ্গে খেলতে ইচ্ছে করে। ''দেখো সন্দীপ, তোমার কম টাকা নিয়ে আমি উদ্‌বিগ্ন নই। আমি উদ্‌বিগ্ন আমার কম আস্থা নিয়ে। হাজব্যান্ডের সঙ্গে থাকার অভ্যেস একদম ছুটে গেছে।'' বোঝাতে চাই সে আমাকে বিয়ে করতে কি অস্বীকার করবে! আমিই চাই না বিয়ে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? নিশ্চয় নয়।

কলকাতার গরম সন্দীপের মাথাটাকেও গরম করে ফেলছে। প্রাকৃতিক আবহাওয়ার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া মিলিয়েছে হাত। সে অফিসে কোন পদ পাচ্ছে না। আমি বুঝি না অফিসের লোকগুলোর ওর সঙ্গে এত শত্রুতা কেন। সন্দীপ বলেছে আগে একবার সে একজনকে বারি মেরেছিল। তারও মানে আমি বুঝিনি। জিজ্ঞেস করেছি, ''অফিসে কি তোমরা মারামারি করো?''

''না না, বারি মেরেছিলাম মানে প্রোমোশন আটকে দিয়েছিলাম।''

''ওহ্।''

''সে এখন কয়েকজনকে নিয়ে আমার বিরুদ্ধে দল বানিয়েছে। ওদের পারিবারিক বন্ধুত্বও রয়েছে। একে অন্যের বউয়ের সঙ্গে...আমি বলতে পারব না ওসব...''

''তাই নাকি!''

পারিপার্শ্বিক গরম আবহাওয়ার মধ্যে সন্দীপের নিজের স্ত্রীয়ের সঙ্গে ঝামেলার ব্যাপারটাও এসে পড়ছে। সন্দীপ তার স্ত্রীকে আর কোন টাকাপয়সা দিতে চায় না। কিন্তু তাই বলে তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির খবর পেয়ে স্ত্রী যে আরও টাকা দাবি করবে না তার কি নিশ্চয়তা আছে! স্ত্রী কিভাবে সন্দীপের সম্পত্তির অনুমান লাগাতে পারে, কিভাবে সন্দীপের পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর, সিবিল রেকর্ড বা আই টি আর তাকে সাহায্য করতে পারে, কিভাবে সে পেতে পারে সেসব রেকর্ড তা নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করে সন্দীপ। তারপর বেশ কয়েক ঘণ্টার বিরতি। মেসেজ করি, ''তুমি ঠিক আছ তো?''

উত্তর পাই, ''এখন পর্যন্ত ঠিকই আছি কিন্তু যে কোন সময় পাগল হয়ে যেতে পারি...''

''কেন?''

''তোমার জন্য।''

''তুমি আমাকে খুব আনস্মার্ট বানিয়ে দিচ্ছ জানো?''

''কি করবে তাহলে?''

''মেয়ের সঙ্গে আউন্ধের একটা কোরিয়ান রেস্টরেন্টে ডিনারে যাব।''

''হুঁ। সেখানে অক্টোপাস আর বানরের মাথা তোমার স্মার্টনেস বাড়িয়ে দেবে...''

''তাই?''

''কোরিয়ান খাবার স্বাস্থ্যকর...শুনেছি তোমাদের আউন্ধে হার্টের একটা হসপিটাল আছে...প্রেমিকরা সব বুকে ব্যথা নিয়ে সেখানে হাজির হয়। আমারও বুকে এখন খুব যন্ত্রণা হচ্ছে...''

রাতে সন্দীপ বোনকে নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকে, আমার সঙ্গে কথা বলে না। এমন

রাতগুলো একেবারে ফাঁকা যায়, বড় অভিমান নিয়ে কাটে। আজকের রাতটা ফাঁকা হলেও একটু অন্যভাবে কাটালাম। একটি কবিতা লিখলাম। অভিমানের কবিতা।

সত্যিই ভালোবাসো আমাকে?
তাহলে কেন করো না ঘোষণা সর্বসমক্ষে?
ঠিক আছে, নাই বা করলে ঘোষণা। মানলাম তুমি বাকপটু নও।
যদি ভুল করে কারও সামনে এসে যাও,
যদি আমি থাকি পাশে,
যদি আলাদা হয়ে যাওয়ার সুযোগ না আসে,
যদি কেউ প্রশ্ন করে বসে মহিলাটি কে?
কেন দাও না আমার আসল পরিচয়—তোমার আমি ভালোবাসা যে!
লাজুক তুমি।
পারো না। জানো তো আমার নাম—আমি রূপশ্রী গোস্বামী।
বলো তুমি, আমি পরিচিত।
বলো তুমি, আমি বন্ধুর মতো।
যদি তা-ই হয়ে থাকি কেন বেপরোয়া হাতে
স্বাদ নিতে আসো?
ভালোবাসো?

সকালে ওর গুড মর্নিং মেসেজ পাই। কবিতাটা ওকে শোনাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু হল না। আমার মন খুব খারাপ করছে। কি করে জানি না একটু আগেই মোবাইল থেকে সন্দীপের-আমার সমস্ত মেসেজ ডিলিট হয়ে গেছে। ওকে ফোন করলাম, ''মেসেজগুলো পাঠাও প্লীজ।'' অনিন্দিতা গতকাল পুনেতে এসেছে। আজ আমার বাড়ি আসবে। অনেক বছর বাদে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। ফোনে অনেক কথা হয়েছে তবু মনে হচ্ছে কিছুই হয়নি। যেন সেগুলো স্বপ্ন ছিল। এটা বাস্তব। বাস্তবে আমি ওর সঙ্গে স্বপ্ন নিয়েও কথা বলব। অনেক খাবার-দাবার বানিয়ে ডাইনিং টেবিল সাজাবো। একসঙ্গে খাব। ছবি তুলব। তাই আজকের দিনটা আমার কাছে এক বিশেষ দিন। এই বিশেষ দিনের শুরুতেই এমন অঘটন ঘটল।

আমার অনুরোধ পেয়ে ফোনের ওপাশের সন্দীপের ভারি গলা আরও ভারি হয়ে গেল। 'পারব না' বলে কয়েক সেকেন্ডের জন্য চুপ করে রইল সে।

''প্লীজ।''

''কি করে এত মেসেজ তোমাকে পাঠাবো?''

''স্ক্রিনশট নিয়ে দু'তিন দিনে পাঠাও।''

''অসম্ভব।''

''কেন এমন করছ?''

''তোমাকে বেশি চিনলামই না। মাত্র কয়েকদিন হল কথা বলছি...''

চেনো না! আহত হলাম খুব। ''ওহ্, ভয় পাচ্ছ তোমাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারি ভেবে? আজ ওগুলো হারিয়ে গেছে তাই? এতদিন তো সব আমার কাছেও ছিল।

তখন ভয় পাওনি?" চুপ সে। ''আর আমাকে বিশেষ না চিনেই আমাকে চুমু খাওয়া, জড়িয়ে ধরা এমনকি তোমাদের ভাষায় সেই আদর করার ইচ্ছেও তুমি রাখলে? হেলো...বলো। কি করে ইচ্ছে হল তোমার? হেলো...হেলো...কি হল? হেলো..."

সন্দীপ লাইন কেটে দিয়েছে। মনের যন্ত্রণা প্রকাশ করার জন্য একটাই রাস্তা বেঁচে রইল—মেসেজ।

''তুমি এমন করলে আমি হারিয়ে যাব।"

কোন উত্তর নেই।

''সম্পর্কটা যদি এতই খারাপ করলে তাহলে থাক, পাঠাতে হবে না। সেগুলো থেকে রোমাঞ্চকর স্বাদ আমি নিতেও পারব না। তুমি একাই রাখো, একাই দেখো, একাই আফসোস করো, একাই পাগল হও, একাই খুঁজে বেড়াও। আমাকে আর পাবে না। আমি ফ্রী।"

কোন উত্তর নেই।

''আমার কাছে বেশ কিছু স্ক্রিনশট আছে। চাইলে বাকিগুলোও হয়ত পেয়ে যাব। কিন্তু থাক সে চেষ্টাও আমি করব না।"

কোন উত্তর নেই।

''সাধারণত স্বামী-স্ত্রীর ডিভোর্সের পরে মুখ দেখাদেখি বন্ধ করে দেয়। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে তেমন কিছুই হয়নি। লোকে জেনে অবাক হয়—এটা কি করে সম্ভব! আমি সম্ভব করেছি। আমি রাজার এই বিশ্বাস অর্জন করেছি যে বুদ্ধি দিয়ে, পরিশ্রম দিয়ে, টাকা দিয়ে তাকে সাহায্য করার ব্যাপারে আমি অদ্বিতীয়া। আমার ব্যক্তিগত জীবনে এটাকে একটা বড় সাফল্য বলে আমি মনে করি।"

কোন উত্তর নেই।

''আমি জানি না কতটা কষ্ট তুমি তোমার পরিবারের জন্য উঠিয়েছিলে। পরম শান্তি পেতে গেলে ভালবাসার কাছে নিজেকে সঁপে তো তোমাকে দিতেই হবে সন্দীপ। জীবনের সব প্রতিকূলতায় তার সঙ্গ পেতে গেলে নরম তো তোমাকে করতেই হবে তোমার ওই রুক্ষ নিষ্ঠুর মনকে।"

''এগ্রীড।"

''নাটক বন্ধ করো। তুমি একটা বিদঘুটে লোক।"

অনিন্দিতা ঘরে ঢুকেই সন্দীপকে নিয়ে পড়ে গেল, ''ভিডিও কল কর, মালটাকে দেখব।" ওকে জানাই, সম্ভব নয়। সকালেই ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে।

''কেন?"

বললাম কারণ।

''ঝগড়াটা কালকে করলে কি ক্ষতি হত? না না, তুই ফোন লাগা।"

''এখন কিছুতেই সম্ভব নয় অনিন্দিতা।"

খুব হতাশা নিয়ে সে লাঞ্চ করে। হতাশা নিয়ে গল্প করে। আমি আমাদের দু'জনের ফটো হোয়াটসআপে দিই—ডি পি। কিছুক্ষণ বাদে মোবাইলে টুং টাং আওয়াজ শুনি।

মেসেজ ঢুকেছে সন্দীপের, 'বিদঘুটে মানে কি? ঘুটের মতো কোন জিনিস?"

অনিন্দিতা বলে, ''উত্তর দে। দেখ যদি আমার সঙ্গে কথা বলাতে পারিস।"

''আশা রাখিস না। অনেক হল লোকটির সঙ্গে..."

সন্দীপের আরেকটা মেসেজ, ''বিদঘুটে মানে? বেখাপ্পা, উদ্ভট, অপটু, বেয়ারা, এলোমেলো, ন্যালাখ্যাপা, নড়বড়ে, নড়েভোলা, বেমানান, বেসদৃশ, অসমঞ্জস, খাপছাড়া, বেঢপ, বেডৌল, অসমাঙ্গ, অসংগঠিত, অসম্বন্ধ?"

''দেখেছিস কত খেটেছে তোর জন্যে? চার পাঁচটা ডিকশনারি খুঁজে বের করেছে মানে!" হাসে অনিন্দিতা, ''ওই দেখ একটা গানও পাঠিয়েছে দেখছি—আমি দূর হতে তোমারে দেখেছি আর মুগ্ধ এ চোখে চেয়ে থেকেছি। আমার ওকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে রে।"

আমার ডিপি ডাউনলোড করে পাঠায় সন্দীপ, ''তোমার সঙ্গে এটা কে—সোনালি নাকি অনিন্দিতা।" তারপর তিনটে মেসেজ—কি হল?

—গালাগালি দাও।

—কিছু বলো।

''কর না ফোন। বলেছে তো। গালাগালি দিতেই না হয় কর। তোর মিষ্টি গলা শোনার জন্য পাগল হয়ে গেছে বেচারি। প্লীজ," বড্ড পেছনে পড়ে অনিন্দিতা।

সন্দীপকে লিখি, ''ভিডিও কল করো, বলছি মানে।"

রিলির ঘরের আড়াই বাই ছয় আয়নার সামনে অনিন্দিতা এবং আমি দাঁড়াই। দেখি নমুনা ওপাশে তার বিছানার উপর সেই চিরাচরিত হাতকাটা গেঞ্জি ও শর্টস পরে বসে আছে। সকালে সে আমাকে অপরিচিত বলে ঠুকরে এতটাই দূরে সরিয়ে দিয়েছে যে এখন আয়নার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সেই দূরত্ব এতটুকু কম হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। অনিন্দিতাকে হাত ধরে টেনে আড়ালে নিয়ে আসি, ''কি করি?"

''কি করি মানে? কথা বল!"

''অনেক দূরের মনে হচ্ছে যে..."

''তা তো হবেই। আয়নাটা যে মাঝখানে রয়েছে। ওটাকে সরিয়ে দে, কাছে এসে যাবে।"

''তুই একটা পাগল! ওটা সরে গেলে আরও কিছু থাকবে না।" *সত্যিই তো! আমি সবসময় সন্দীপকে আয়নাতেই দেখেছি। সবসময় সে আমার সামনে মরীচিকা হয়েই এসেছে তাহলে। কিন্তু আসল সন্দীপও তো আছে। কলকাতায় গেলেই আমি তার দেখা পাব। না, পাব না দেখা। আজ সে কথায় আমাকে অপরিচিত করে দিয়েছে। তার মানে বাস্তবের সন্দীপও আমার কাছে সেই মরীচিকা হয়েই থেকে যাবে। মরীচিকা...মরীচিকা...মরীচিকা...*

''কি ভাবছিস?"

''কিছু না তো!"

''আরে, মালটা ওদিকে বসে বসে বোর হচ্ছে।"

তাই তো! বোর হচ্ছে তো সন্দীপ! আয়নার সামনে আবার দাঁড়াই। দেখতে পাই ওর নড়েচড়ে বেড়ানো জীবন্ত ছবি। আমি আজ একেবারেই স্বাভাবিক হতে পারছি

না। মনের গ্লানি একেবারেই কমছে না। এমন কোনই বাক্য রচনা করতে পারছি না যা উচ্চারিত হয়ে কানে বেজে ওকে প্রিয়তম বলে মনে করতে সাহায্য করবে। বরং সকালের ঘটনার সূত্র ধরে অপ্রিয় কথা বলাটাকেই সহজতর লাগছে। ''বিদঘুটে মানে হল মিন। খুব মিন তুমি।''

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে লাইটার জ্বালালো। আগুন লাগালো তাতে। সিগারেটে একটা লম্বা টান মেরে ঘরের অন্যপাশটাতে হেঁটে যেতে যেতে বলল, ''কোন মিন? মিন মিডিয়ান মোডের মিন?''

অনিন্দিতা অপ্রস্তুত হয়ে আয়নার পরিধির বাইরে চলে গেছে। ওকে টেনে নিয়ে এসে আরেকবার সন্দীপের সামনে দাঁড় করালাম। সন্দীপকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওর গালে একটা চুমু দিলাম। বললাম, ''এ আমার খুব প্রিয়।''

ড্রপ করে দিলাম কল। অনিন্দিতা বলল, ''আমার কিন্তু মালটাকে দারুণ লেগেছে। কি কুল রে!''

পরদিন সকাল সাতটার আগেই সন্দীপ আমাকে হারিয়ে যাওয়া চ্যাটগুলো এক্সপোর্ট করল। চ্যাটকে ফাইল করে এভাবে যে এক্সপোর্ট করা যায় তা আমার জানা ছিল না। মিডিয়া ফাইল ছাড়া চ্যাটের বড় অংশটাই ঢুকে পড়ল আমার মোবাইলে। সন্দীপ লিখল, ''এই ছোট মনের লোকটির কাছ থেকে তুমি আর কি আশা করো?'' ওর দয়াপরায়ণতা আমার রাগকে ভেঙে দিয়ে অভিমানের জন্ম দিয়েছে। ''কিছু দিতে হবে না। তুমি তো আমাকে বেশি চেনোই না।''

''কল করো না।'' একটা গানের লিঙ্ক পাঠায় সে—

চুরা লিয়া হ্যায় তুমনে যো দিল কো,
নজর নহী চুরা না সনম...।''

সেই রাতেই, রাত আটটা একান্নতে সন্দীপ আমাকে একটা কবিতাও পাঠালো—

এম এ পড় বি এ পড় কিংবা এসো এম ফিল করি,
সব শিক্ষাই অসম্পূর্ণ, আসল শিক্ষা বি এর পরে,
বউই হল বিবাহিতের সত্যিকারের শিক্ষাগুরু,
প্রথম ছ'মাস নবীন বরণ, তারপরেতেই পড়া শুরু।
ভুলিয়ে দিয়ে আগের পড়া দিদিমনি কড়া কড়া
এমন লেকচার দেবে ক্লাসে, বুঝতে পারবে দু'তিন মাসে,
বাইরে যতই সিংহ সাজো ঘরে তুমি আস্ত গরু।

রাত দশটা আঠাশে সে আমাকে তার বিছানায় টেনে নিয়ে গেল। ডেভিড এম বাসের লেখা 'স্ট্র্যাটেজিস অফ হিউম্যান মেটিং' অর্থাৎ 'মানব সঙ্গমের কৌশল' ঢুকিয়ে দিল আমার হোয়াটসআপে।

তার পরদিন অনিন্দিতার সামনে খুব হাত-পা ছুঁড়লাম, ''লোকটি বড় কুল তাই না? লোকটি বড় কুল! তুই বুঝতেই পারছিস না ওর বউ ওকে কেন ছাড়তে চাইছে!''

''সত্যিই বুঝতে পারছি না। কিন্তু কথা হল লোকটাকে কুল বলতে বলতে তুই এত অস্থির হয়ে পড়ছিস কেন?''

''কেননা কাল রাতে সে আমাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছে।''

''আরেব্বা! কি করেছে রে মালটা?''

''আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে...''

''কি করে? সে কি এসেছে এখানে? তোর ঘরে আছে এখন?''

''স্ট্র্যাটেজিস অফ হিউম্যান মেটিং-এর পিডিএফ ফাইল পাঠিয়েছে।''

''ফাইল পাঠানো আর বিছানায় শোওয়ানো এক হল?''

''আমার তো একই লাগে। ফাইল যখন পাঠিয়েছে বিছানায় আমার সঙ্গে ওসব করার ছবিও নিশ্চয় সে দেখেছে।''

''কি সুন্দর দেখ। আমি তো ওর রোমান্স দেখে হয়রান হয়ে যাচ্ছি। কি করলি তুই উত্তেজিত হয়ে?''

''ফোন করতে বলেছি।''

''গালি দিতে?''

''না, আমাকে এসব পাঠিয়েছে কেন জিজ্ঞেস করতে।''

''কি বলল সে?''

''হোয়াটসআপ ভিডিও কলে এসেছিল। গেঞ্জি আন্ডারওয়ার পরা কার্টুন মুখে প্রশান্ত হাসি নিয়ে বলেছে বইটাতে শুধু মেটিং ওয়ার্ডটাই অশ্লীল আছে। আর কিছু অশ্লীল নেই।''

মাঝে মাঝে খুব হতাশ লাগে। দিনরাত সবসময় একটাই প্রশ্ন আমার মনে উঁকি মারে—কি চায় সে আমার কাছে? এক মুহূর্তের জন্যও প্রশ্ন আমার পিছু ছাড়ে না। কি চায়? অনিন্দিতা বলে, ''বিয়ে করতে চায়। তা না হলে বউ নিয়ে কবিতাটা পাঠাতো না।''

''কিন্তু বিয়ের জন্য তো আগে মনের ভিখারি হওয়া দরকার।''

''আরে বাবা, আর কত বড় ভিখারি হবে! চুরা লিয়া হ্যায় তুমনে যো দিল কো—এর মানে কি হয়?''

''বিয়ে হলে বউ সশরীরে আদর ভালবাসার থালা নিয়ে বিছানায় উপস্থিত হবে। সন্দীপ বিবাহিত, এই অভিজ্ঞতা তার থাকা উচিত। বিয়ের আগে রিহার্সালের কোন প্রয়োজন হয় না। টিউশন পড়ানোর প্রয়োজন হয় না।''

''হয়ত আগের বউয়ের সঙ্গে অখুশি...''

''চুপ কর তুই। সে বলেছে আগের বউ খুব কমপিটেন্ট ছিল।

''তাহলে নিশ্চয় সে তোকেও একই রকম কমপিটেন্ট দেখতে চাইছে।''

''আমার ভালো লাগছে না, একদম ভালো লাগছে না। বিবাহিত জীবনে সেক্স ছাড়া আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকে। সেসব নিয়ে তো সে কখনও কোন আলোচনা করে না! তাহলে তার চোখে বউ কি শুধু একটা সেক্স মেশিন?...কথাটা পুরনো কিন্তু তাই-ই কি?''

ঘা খাওয়া আত্মসম্মান নিয়েই আমি আবার সন্দীপের কাছে ফিরে যাই। আবার শান্ত মাথায় কথা বলার চেষ্টা করি, ''জানো তো একটি বিয়েকে তখনই সফল বলে মানা হয় যদি দেখা যায় তাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই বারবার একে অন্যের প্রেমে পড়ছে।''

সন্দীপ কোন সাড়া দেয় না আমার সফল বিয়ের বর্ণনায়।

''আমি বিয়ের পরে অনেকবার তোমার প্রেমে পড়ব সন্দীপ।''

বেশ কিছু সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়। কোন উত্তর পাই না। এখন অনিন্দিতা নেই সামনে। থাকলে নিশ্চয় বলত, তোর বারবার প্রেমে পড়ার কথা শুনে মালটা নিশ্চয় গরম হয়ে ওশায়রুমে মাল ফেলতে গেছে।

''প্রত্যেক বছর তোমার প্রেমে পড়ব, প্রতেক মাসে তোমার প্রেমে পড়ব...প্রত্যেক দিন। তুমি কোন বিপদে পড়লে, অসুস্থ হলে তোমার জন্য আমার বিশেষ ভালবাসা থাকবে সন্দীপ। তুমি কোন ব্লান্ডার করলেও থাকবে।''

''ব্লান্ডার!''

''হ্যাঁ ব্লান্ডার। তুমি তো ব্লান্ডারই করো। এই যে আমাকে হিউম্যান মেটিং-এর বই পাঠালে—এটা ব্লান্ডার না তো কি? তোমার বান্ধবী, তোমার পুরনো প্রেমিকা তোমাকে বিয়ে করতে চাইলে তুমি রাজি হওনি—এটা ব্লান্ডার না তো কি সন্দীপ? এত কিছু ব্লান্ডারের পরেও তো আমি তোমাকে ভালবাসছি। বান্ধবীকে নিয়ে তুমি যা বলেছ তা যদি সত্যি হয় তাহলে আমার আরও কিছু প্রশ্ন আছে। প্রথমত, তুমি বিবাহিত হয়েও সেই মেয়েটিকে তোমার সঙ্গে এভাবে কেন জড়িয়ে ফেললে? একবার নয়, বারবার কেন জড়ালে? আর যদি বারবারই জড়ালে স্ত্রীর প্রতি স্তিমিত হয়ে আসা ভালবাসাকে কেন নিভিয়ে দিলে না? কেন জীবনসাথী বানালে না মেয়েটিকে? সে তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে কেন বললে তোমার স্ত্রী তো কিছু অন্যায় করেনি? তুমি হয়ত আমার কথাকে মানতে চাইবে না। বলবে, সত্যি কথাই বলেছি। তাহলে আমার প্রশ্ন—তোমার স্ত্রী কোন অন্যায় না করে থাকলে তাকে সেই সম্মানের আসন থেকে কেন সরিয়ে দিয়ে বান্ধবীর সঙ্গে সম্পর্ক করলে? একবারও মনে হল না যে তার প্রতি এটা অবিচার হচ্ছে? নাহ্, কোথাও তো গরমিল আছে তোমার মধ্যে।''

মেয়েটির কথা সন্দীপ আমায় বলেছিল কিন্তু তার সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতার কথা বলেনি। আমি অনুমান করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ''কি হয়েছিল ওর সঙ্গে?''

সে বলেছে, ''হয়েছিল কিছু।''

''হয়েছিল কিছুর মানে? কি হয়েছিল?''

''ওই কিছু হয়েছিল। তোমাকে শুনতে হবে না।''

অনিন্দিতা আমাকে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে, ''মেয়েটির কথা কিন্তু ভালো করে শুনে নিস। তাই আমিও নাছোড়বান্দা। ''গার্ল ফ্রেন্ড ছিল সে?''

''হ্যাঁ।''

''গার্ল ফ্রেন্ড মানে কি জানো?''

''তুমি বলো।''

''শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে যাওয়া বান্ধবী।''

''তাহলে তাই। ওর ব্রেস্ট ক্যানসার হয়েছিল। ক্যানসারটা আসলে আমিই ধরেছিলাম—বলেছিলাম এখানে শক্ত শক্ত লাগছে—আমিই ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম, বায়োপসি করিয়েছিলাম। চিকিৎসার সময় আমারই ঘরে রেখেছিলাম...''

''কেন?''

''সে নিজেই থাকতে চেয়েছিল। আমি তো আর তাড়িয়ে দিতে পারি না।''

সন্দীপ বলেছিল মেয়েটি তাকে রোজ অনেকবার ফোন করত। তার অফিস আওয়ার, জরুরি মিটিং, অ্যাসাইনমেন্ট কিছুর ধার ধারত না। আমি জানি এরকম হয়। বয়ফ্রেন্ড প্রতারণা করলে এরকমই হয়। সব লুটে নিয়ে বিয়ে করতে অস্বীকার করাকে তো প্রতারণাই বলে। বয়ফ্রেন্ড যতই গার্লফ্রেন্ডের সংস্পর্শে থাকুক, রোজ ফোন করুক, মাঝে মাঝে দেখা করুক একে প্রতারণা ছাড়া অন্য কিছু বলে আখ্যায়িত করা যায় না। মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা এক অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক দশা। না পারে সে বয়ফ্রেন্ডকে ভুলতে না পারে তার রক্ষিতা হয়ে থাকতে। তাই বারবার তাকে ঠোকা দিতে থাকে।

মেয়েটির ব্যবহারে সন্দীপও অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিভাবে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি করে পালানো যায় ভাবতে ভাবতে সন্দীপের মাথায় একটি বুদ্ধি খেলে যায়। সে মেয়েটিকে পিএইচ ডি করার পরামর্শ দেয় এবং সেব্যাপারে সাহায্যও করে। ব্যস, ধীরে ধীরে ব্যস্ত হয়ে পড়ে মেয়েটি তার পড়াশোনা নিয়ে। রেহাই পেয়ে যায় সন্দীপও।

সেই রাতে আমি স্বল্প পোশাকে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলাম। শুনছিলাম মন দিয়ে ওর কথা। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল। ঠাণ্ডা লাগছিল খুব। বরফ হয়ে যাচ্ছিল হাত পা। হাত পা গরম রাখতে আমি এপাশ ওপাশ করছিলাম খুব। তাতে গায়ের ওপর থেকে চাদর সরে সরে যাচ্ছিল, আমি অনবরত চাদরকে বুকের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গলাকেও ঢেকে দিচ্ছিলাম। সন্দীপ তা লক্ষ্য করে বলেছিল, ''কি করছ বারবার...এমন এমন?'' চাদরের অভাবে খালি হাতটাকে সে আমার মতো করেই নড়িয়েছিল, ''ইশ্, আমি যদি তোমার চাদর হতে পারতাম।''

সন্দেহ এবং অনাস্থা বড় তাড়া করছিল আমাকে—সে কি আমার সঙ্গেও এমনই করবে? রাতে অসংলগ্ন কথা বলেছিলাম অনেক। কখনও বলছিলাম তোমায় অনেক ভালবাসি, কখনও বলছিলাম একদম ভালবাসি না। কখনও বলছিলাম দেখা করব, কখনও বলছিলাম দেখা করব না। কখনও বলছিলাম বিয়ে করব, কখনও বলছিলাম বিয়ে করব না। ওই যে বলেছি, অসংলগ্ন কথা বললে ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়ে যায় সেই রাতে আরেকবার আমার ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

ফোন রেখে দেখি রাত সওয়া একটা। সাধারণত এত সময় পর্যন্ত জাগে না সন্দীপ। ঘুমের সমস্যায় সে ভুগেছিল খুব। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত ঘুম, ধরা দিতে চাইত না। সন্দীপ বলে এটা নাকি বয়সের ধর্ম। অনেক কষ্টে রাতে নিয়মানুবর্তিতা বজায় রেখে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে তাকে। তাই আর বিরক্ত করতে মন চাইল না। কিন্তু মনও তার ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়ে যাওয়ার কষ্টে মুষড়ে পড়েছিল। কাজেই মাঝামাঝি একটি উপায় বের করি। ওকে একটি মেসেজ ছাড়ি ভোরে উঠেই পড়ে নিতে পারবে বলে। মেসেজে লেখা থাকে, ''সন্দীপ, তোমার অতীত নিয়ে আমার কোন কিছু বলার নেই। তুমি তোমার সব কথাই আমাকে জানিয়ে হাল্কা হতে পারো। হতে পারে তুমি আমার থেকে অনেক বেশি পরিণত। আমি তোমার কোমল

অনুভূতিগুলোর খেয়াল রাখব, প্রতিশ্রুতি না ভেঙে তোমার প্রয়োজনে কাজে আসার চেষ্টা করব।"

সকালে সে লেখে, "বুঝলাম। তাহলে আমরা এগোতে পারি..."

"কি ব্যাপারে বলো।"

"কিছু না তোমাকে দেখতে চাইছি। কেমন লাগছ তুমি এখন দেখতে?"

"কুৎসিত লাগছি। চেঞ্জ করে ফেলেছি..."

"কি চেঞ্জ করেছ। মন?"

না না মন নয়। "কি বলতে চেয়েছিলে তুমি সন্দীপ? বলো না প্লীজ।" *বিয়ের ব্যাপারে কি?*

"বিশেষ কিছু না। কাল রাতে বেড-শীটে মোড়া তোমার মুখটা খুব সুন্দর লাগছিল।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, ওই মুখটা খুব সরল সাদাসিধে ছিল।"

"খুব সরল আমি নই, বুঝি সবই। তবে বিশুদ্ধ বলতে পারো।"

"কল করো।"

"লজ্জা করছে। কালকে কি সব রাবিশ কথা বললাম।"

"রাবিশ দিয়ে রাব করা খারাপ জিনিস নয়।"

"এই বাজে কথা বলবে না প্লীজ।" আবার ভয় হয়। আবার রাগ হয়। বলি, "তুমি তোমার বউ এবং গার্লফ্রেন্ড দু'জনকেই প্রতারণা করেছ সন্দীপ। তুমি কেবলমাত্র দূর থেকেই আমার ভালবাসা পাওয়ার যোগ্যতা রাখো।"

"আমি কারও কাছ থেকেই কিছু পাওয়ার যোগ্যতা রাখি না।" সন্দীপ লিখল, "সম্পর্কটা হল একটা পেঁয়াজের মতো—বিশ্বাস এবং যত্নের অনেক স্তর দিয়ে মোড়া। স্তরগুলোকে ছাড়াতে গেলে তুমি চোখে জল ছাড়া আর কিছুই পাবে না।"

অনেকের মুখেই আমি অনেক উপমা শুনি। বেশিরভাগই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। যার উপমা দেওয়া এবং যাকে নিয়ে দেওয়া সেই দুটো জিনিস নিজের নিজের জায়গায় নিজের বিশেষত্ব নিয়ে বসে আছে মনে হয়। এখানেও তাই হল। কোথায় পেঁয়াজ আর কোথায় সম্পর্ক! পেঁয়াজ তার খোলস দিয়ে মোড়া থাকে এবং সম্পর্ক জোড়া থাকে তার সেতু দিয়ে। সেতুরও প্রকার আছে, যেমন—জন্মের সেতু, বিবাহের সেতু, চুক্তির সেতু। সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হলে সেতুর উপর সন্দীপের সেই বিশ্বাস ও যত্নের প্রতিশ্রুতি চড়িয়ে তার সঠিক চর্চা প্রয়োজন। চর্চা ভুল হলে প্রতিশ্রুতি সেতু থেকে পিছলে পড়ে যাবে আর তার ধাক্কায় ভেঙে যাবে সেতু। আর যদি বিশ্বাস ও যত্নের চর্চাই না হয় তাহলে প্রতিশ্রুতিতে জং পড়বে। সেক্ষেত্রেও প্রতিশ্রুতি এবং সেতুকে ভেঙে যাওয়া থেকে বাঁচানো যাবে না। আমি সন্দীপকে বলি, "এটা কার কথা? তোমার?" আমার তো মনে হয় সম্পর্ক হল একটা চকলেট। যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পর্কে লিপ্ত মানুষগুলো বেঁচে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পর্ক তথা চকলেট তাদের মিষ্টি স্বাদ পরিবেশন করে।"

অবশ্য অনেকসময় এটাও হয় যে মানুষ বেঁচে আছে কিন্তু তারা আর সম্পর্কে

লিপ্ত নেই। সেক্ষেত্রে তাদের সম্পর্ক অতীত হয়ে গিয়ে তাদের মাঝখানে তিক্ততার বৃষ্টি ঝরায়। খুব বেশিদিন হল না, কিন্তু সুতপা এবং সমীকরণের সম্পর্কটাও এমনই অতীত হয়ে গেল। এই জন্যই বুঝি আমি সম্পর্ককে চকলেটের সঙ্গে তুলনা করলে সন্দীপ বলেছিল ক্যান্ডি ক্রাশ খুব ভয়ংকর।

সুতপা এবং সমীরণ দু'জনারই ডিভোর্সের কেস চলছে। ওদের ব্যাপারটাও অনেকটা সন্দীপের মতো। এমতবস্থায় সমীরণ সুতপাকে সিঁদুর পরার অনুমতি তো দিয়ে ফেলেছিল কিন্তু সে রেজিস্ট্রি ম্যারেজের কথা কিছু বলছিল না। তার পরিবর্তে প্রেম-ভালবাসার কথা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। সেও সন্দীপের মতো সংযম ধরে রাখতে পারে না। সুতপা পারে না তার রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে। আমার মতো। একদিন সমীরণ সুতপাকে জিজ্ঞেস করে, ''তুমি আমাকে কি করে আদর করবে বাবু?' প্রেমিক আদর পাওয়ার লোভে মাঝে মাঝে তুই থেকে তুমির সিঁড়িতে চড়ে যায়।

''কি করে, তুই-ই বল।''

''পাখির পালক দিয়ে?''

''ঠিক আছে। পাখির পালক দিয়ে।''

আরেকদিন সে জিজ্ঞেস করে, ''তুমি আমাকে কি করে আদর করবে বাবু?''

''কি করে, তুই বল।''

''ময়ূরের পালক দিয়ে?''

''ঠিক আছে, ময়ূরের পালক দিয়ে। বড় পালক বেশি জায়গা জুড়ে সুড়সুড়ি দেবে তাই না বাবু?''

''ঠিক বলেছ।''

আরেকদিন জিজ্ঞেস করে, ''তুমি আমাকে কি করে আদর করবে বাবু?''

''কি করে, তুই বল।''

''না বাবু, আমি অনেকবার বললাম। এবার তুমি বলো।''

''সেন্টার ফ্রেস দিয়ে।''

''সেন্টার ফ্রেস তো চিপকু চিপকু সোনা!''

''আরে ওটা তোমার মুখে ঢোকাবো। তা না হলে স্মুচিং হবে না। তোমার মুখের দুর্গন্ধ আমায় বাধা দেবে।'' স্মুচিং-এর কথা 'তুমি'তে উত্তরণ বিনা রসহীন লাগে তাই সুতপা এবার আর তুই-এ আটকে থাকেনি।

''সেন্টার ফ্রেস তোমাকেও খেতে হবে বাবু।''

''না বাবু, আমাকে খেতে হবে না। আমার মুখ থেকে ডিওড্রিনের গন্ধ বেরোয়। ওটা তোমার চমৎকার লাগবে দেখো।''

এমনিতেই অভিষেককে ছেড়ে রজতকে বিয়ে করার শাস্তি ভোগ করছে সুতপা। জীবনসঙ্গী হিসেবে ভুল মানুষের নির্বাচন তাকে ভয়ানক শারীরিক এবং মানসিক কষ্ট দিয়েছে, মেয়ে এবং তার বাবার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। সুতপা মনে করে তার মেয়ের মুখ থেকে হাসি উধাও হয়ে যাওয়ার জন্য সে-ই দায়ী। এক অসম্ভব পাপ করেছে সে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু কি করে করতে হবে সে নিজেও

জানে না। তবে সমীরণের ভালবাসার ফাঁদে পরে নিশ্চয় নয়। মানুষ চেনা বড় দায়। রজতের মতো পাঁচ বছর ধরে চেনা মানুষটি বিয়ের পরই হঠাৎ অচেনা হয়ে যাওয়াতে এখন আর কাউকেই বিশ্বাস করার সাহস হয় না। তাদের মুখে বিয়ের নামে আদর ভালবাসার কথা শুনলে গা ঘিনঘিন করে। ভয় করে। সে বলেছে, ''আমি এবার সমীরণের সঙ্গে দ্য এন্ড করব। অনেক হল শালা হারামজাদার সঙ্গে, প্রেম না বাল...।''

সেদিন সন্দীপের সঙ্গে আমার দ্য এন্ড হতে হতে হল না। সে আমাকে জানিয়ে বোনের বাড়ি গিয়েছিল। বলেছিল পরদিন সকালে ফিরবে। উদ্দেশ্য এটাই যে আমি যেন ওকে ওর না ফেরা পর্যন্ত ফোন না করি। কিন্তু আমি তা মানলাম না। বিকেলে অনিন্দিতার আসার কথা ছিল। রাতে আমার সঙ্গে ডিনারের পরিকল্পনা কিন্তু সে এল না, আমাকে সঙ্গ দিতে পারল না। কোন কারণে ঘরেই আটকা পড়ে রইল। তাই পরদিন সকালে আমি সন্দীপকে ফোন করেই বসলাম। সে রিসিভ করল শুধু জানানোর জন্য যে একটু পরে ঘরে ফিরেই সে আমার সঙ্গে কথা বলবে। বোনের বাড়ি থেকে গুড মর্নিং মেসেজও সে দেরিতে পাঠিয়েছিল। সারাদিন ওর সঙ্গে আমার আর কথা হল না। বুঝতে পারছি না মতিগতি। রাত আটটা চল্লিশে ওকে মেসেজ করি, ''তুমি কি চাইছ আমি তোমাকে ব্লক করে দিই? আমি তোমাকে বলেইছি যে আমি কাউকে ধোঁকা দিই না। তাই জিজ্ঞেস করছি।''

''কেন ব্লক করবে? তুমি শুধু ভিডিও কলে আপত্তি জানিয়েছ।''

''তা জানিয়েছি। তুমি তোমার বোনের সামনে আমাকে চিনতে চাও না। আর ভিডিও কলে ওইসব করতে চাও। তুমি এভাবে আমার সম্মান তো নষ্ট করছই, তোমার নিজেরও সম্মান নষ্ট করছ। আমি সম্মান দিতে এবং সম্মান নিতে পছন্দ করি। তুমি হয়ত অন্যকিছু। আমিও সবকিছু পেতে পছন্দ করি কিন্তু সসম্মানে।''

''আমি জানি। তুমি কলকাতায় এলে আমরা চেষ্টা করব।''

এই সময়গুলোতে সন্দীপ ওর রাগের ওপর পুরো নিয়ন্ত্রণ রাখে। কিন্তু আমি ভাবি আমি কলকাতায় এলে কি চেষ্টা করবে সে? আমাকে সম্মানের সঙ্গে হাসিল করতে? কিছুতেই সম্ভব নয়। একটা কথাই ঘুরে ফিরে আসে—ওর এখনও ডিভোর্স হয়নি। সম্মান এবং হাসিল শব্দ দুটোকে একসঙ্গে জুড়তে হলে অপেক্ষা তো ওকে করতেই হবে।

বলি, ''তোমার ভাইবোনদের দিকে তাকিয়ে দেখো। তারা যা কিছু পাচ্ছে তাদের স্বামী বা স্ত্রীর কাছে পাচ্ছে। এমন নিশ্চিত পাওয়া থেকে নিজেকে দূরে রেখে তুমি সুখ পেতে পারো না সন্দীপ। তাছাড়া ওরা সবাই নিজেদের পরিবার নিয়ে ব্যস্ত। অন্য প্রয়োজনেও কে কতটাই বা তোমার কাছে আসতে পারবে!''

''এটা তোমার ভাবনা...''

হ্যাঁ, এটা আমারই ভাবনা। তুমি তো তোমার কি ভাবনা খোলাখুলি বলছ না। অথচ শারীরিক ভালবাসার দিকে এগিয়ে যাচ্ছ অনেক দূর, এগিয়ে যেতে চাইছ আরও দূর। মন বলছে ডিভোর্স না হলেও তোমার কোন অসুবিধে হবে না, বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ না হয়েও আমার শরীরের সঙ্গে তোমার শরীর মিলিয়ে দিতে তোমার কোন অসুবিধে হবে না। অসুবিধে হবে না কয়েকদিন বা কয়েকমাস পরে আমাদের

বোঝাপড়ায় হঠাৎ করে অন্ত টেনে দিতেও। তোমার যেমন কিছুতেই কোন অসুবিধে নেই আমার তেমন সবটাতেই অসুবিধে আছে সন্দীপ। সুতপা বলে আজ রজত তাকে জনসমাজে যতই গালি দিয়ে বেড়াক রক্ষিতা বলার হিম্মত করে না, কারণ সে রজতের বৈধ স্ত্রী।

''তুমি ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটে এসেছ উপযুক্ত জীবনসঙ্গী খুঁজতে তাই না? এভাবে একা একা অসম্পূর্ণ অস্তিত্ব নিয়ে ঘুরে বেরিয়ো না প্লীজ।''

রাত পেরিয়ে গেল। তার কোন উত্তর পেলাম না। পরদিন সকালে গুড মর্নিং মেসেজ এল।

রিলি বলে, ''প্রেম ভালবাসায় হাগিং কিসিং-এর কথা হলে সবসময় না না করতে নেই। রাগ দেখাতে নেই। তাহলে ছেলেরা ভাববে মেয়েটি একবারে সন্ন্যাসীনি। একে বিয়ে করা যাবে না।'' জিজ্ঞেস করে, ''বুঝলে তো মাম্মা কি বললাম?''

''না।''

''ওহ্, এত সিম্পল জিনিস...এই নাও বিফ বার্গার...তোমাকে আজ রান্না করতে হবে না।''

রিলি বন্ধুর সঙ্গে ডিনারে বেড়িয়েছিল। রেস্তোরাঁয় গিয়ে আমার প্রতি সহৃদয় হয়েছে। তাই এই উপহার। বলি, ''কিচেনে রেখে দাও।''

''শুনলে তো আমি কি নিয়ে এসেছি?''

''হ্যাঁ, বিগ বার্গার।''

''এটা বিগ বার্গার না মাম্মা...বিফ বার্গার...বিফ!''

''বিফ বার্গার! আমি এসব খাব না রিলি। তার চেয়ে আমার নিজের বানানো ভেজ স্যান্ডউইচ ভালো।''

''তুমি বিগ শুনেছ। তাই ভাবছিলাম এত কুল কেন, কোন রিয়াকশন নেই!'' হা হা করে হাসে সে। ''এখন শোনো, যেটা বলছিলাম...তুমি সন্দীপের সঙ্গে প্রেম করছ তাই তো? কাজেই তোমাকে...''

''একটু ভুল হল। ম্যাট্রিমোনিতে সিরিয়াস লোকজন মূলত বিয়ের উদ্দেশ্যে যায়। সেখানে গিয়েই আমার...''

''তা হোক। লোকজন এমনিতেও প্রেম করে ওই বিয়েরই কথা মাথায় রেখে।''

ঠিকই বলছে সে। রিলি শুধু পরিণতই নয় অনেকক্ষেত্রে আমার চেয়েও পরিণত। তাই তার কথা মাথায় রেখেই সন্দীপকে জিজ্ঞেস করি, তোমার ফিলিংস-এর উপাদানগুলো কি কি? সে বলে, সাইকোলজিক্যাল, ফিজিক্যাল এবং ফিজিওলজিক্যাল। আমি তীব্র সাইকোলজিক্যাল লাভ-এর বহিঃপ্রকাশ কিরকম হতে পারে তা ব্যাখা করি, ''তুমি তোমার বিছানাটার ধারে বসে থাকবে...পা দুটোকে মাটিতে রেখে...তোমার ভালবাসা তোমার কাছে এসে দাঁড়াবে...তোমার মাথাটাকে দু'হাতে ধরে একটু পেছনে ঠেলে দেবে সে...তুমি অবুঝ বালকের মতো তাকিয়ে থাকবে তার মুখের দিকে কোন প্রত্যাশা নিয়ে...তোমার ভালবাসা তার মুখটাকে ধীরে

ধীরে তোমার মুখের কাছে নামিয়ে নিয়ে এসে তোমার কপালে গভীর স্নেহ থেকে ছোট্ট করে একটু চুমু দেবে।" সন্দীপকে পাঠানোর আগে অনিন্দিতাকে পড়ে শুনিয়েছি মেসেজ। সে নিরাশ হয়ে বলেছে, তোর দ্বারা কিস্যু হবে না। এটাকে কি বলে জানিস?

"কি?"

"মায়ের বাচ্চাকে ঘুমপাড়ানি ভালবাসা।"

তবু পাঠিয়েছি। সন্দীপ তাতেই খুশি। আশা নিয়ে জিজ্ঞেস করে, "তারপর?"

"তারপর কি আমি জানি না।"

"খুব সুন্দর কথা বলেছ। তারপর কি হবে?"

"জানি না বলছি তো। সাহিত্যের রোমাঞ্চকর বর্ণনা তুলে ধরেছি মাত্র।"

"আমি তো সেটাই বলছি...।" বড্ড চালাক সে।

আমি ওকে বলে, "তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।"

"কলকাতায় এসো।"

"না আমরা প্রথমে অ্যানগ্রিয়াতে চড়ব।"

"না আগে কলকাতায় দেখা হবে।" আলাদা লাগল ওকে। সন্দীপ অ্যানগ্রিয়াতে চড়ার জন্য ব্যাকুল ছিল। বলেছিল আমি গ্রীন সিগন্যাল দিলেই সে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে চলে আসবে। সন্ধ্যাবেলায় সে জানালো অফিসের ব্যাপার নিয়ে একটু হতাশ আছে। রাতেই একটা চিঠির উত্তর তৈরি করতে হবে।

"বলো না কি হয়েছে। তোমাকে অন্ততপক্ষে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারলেও খুশি হতাম। যদি তোমার মনে হয় ব্যাপারটা খুব জটিল হয়ে যাচ্ছে আমাকে জানাও। আমি এক সপ্তাহ পরেই কলকাতায় চলে আসব।"

ফোন করল সন্দীপ। "এক্সপ্ল্যানেশন চেয়ে অফিস থেকে আমার একটা পারফরম্যানস রেকর্ডের কপি ওরা ঘরে পাঠিয়েছে।"

"আমি তাহলে তোমাকে ডিস্টার্ব করব না। পরে কথা হবে। যদি মনে করো সাবজেক্ট নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করবে তাহলেও ঠিক আছে।"

"না। আগে দেখি নিজে কি করতে পারি।"

রাতে আবার সে ফোন করে। বলে, "ওরা চিঠিটা পোস্ট করেনি। কারও হাত দিয়ে পাঠিয়েছে। আমি বাড়িতে না থাকায় দারোয়ানকে দিয়ে রিসিভ করিয়েছে। এটা ঠিক নয়। অফিশিয়াল চিঠি ডাক মারফৎ আসা উচিত।" আমি সন্দীপের সঙ্গে একমত হতে পারি না। আমার মনে হয় চিঠিতে প্রেরকের সঠিক ঠিকানা, স্ট্যাম্প, সই থাকলে এবং তা অ্যাকনলেজমন্টের সঙ্গে রিসিভড হয়ে থাকলে ভুল তো কিছু নেই।"

"তুমি যেটাকে ঠিক ভাবছ সেটা কোর্টে গেলে ভুল প্রমাণ হয়ে যেতে পারে..." কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে সে আমাকে বোঝায়।

মানি, "হতেই পারে। তবে সবকিছু নির্ভর করছে উকিল কিভাবে যুক্তি দিয়ে তার মতামতকে ব্যাখ্যা করছে তার ওপর।"

কথা শেষে সন্দীপ মেসেজ করে, "কখনও তোমাকে অনেক স্বচ্ছ এবং সুন্দর

লাগে আবার কখনও তুমি অনেক দুর্বোধ্য হয়ে পড়ো। আমি ঠিক বুঝতে পারি না তুমি আসলে কেমন।"

"আমি সততার সঙ্গে বাঁচতে ভালবাসি। শুধু জংলী সেক্সকে ভয় পাই। তাই কেউ এমন সেক্সের কথা বললে প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করি।"

"আমার মনে হয় না কেউ তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।"

"আমি তা বলতে চাইনি। সেক্স নিয়ে অকারণ আলোচনাও আমার অপছন্দ। *ছেলেদের মুখে সেক্সের কথা শুনতে শুনতে তিতিবিরক্ত হয়ে গেছি। যা হওয়ার তা তো হবেই। সঠিক সময় এলে স্বাভাবিক স্রোতে বয়ে গিয়েই হবে। মুখে না বললেও।* তুমি আমার কাছে সবসময় নতুন থাকবে। মানসিক স্থিরতা আমার এতটাই বেশি।"

"এটা কি করে সম্ভব?"

"অসম্ভবই বা কেন?"

"রাত হয়ে গেছে? এখন ঘুমনো প্রয়োজন।"

আমার এখন ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না। আমি আবেগগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। মনে হচ্ছে সন্দীপের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে আসতে পিছিয়ে যাচ্ছি। ভালো লাগতে লাগতে লাগছে না। শান্তি পেতে পেতে পাচ্ছি না। নাহ্, তাকে আমার প্রকৃত সত্তা বোঝানোর জন্য আরও সরলতার প্রকাশ দরকার।

"তুমি আমাকে নিয়ে পুরো রিসার্চ করো। সব জায়গায়—যেখানে যেখানে আমি থেকেছি। কাউকে প্রবঞ্চনা করার খবর তুমি পাবে না।"

"কি প্রয়োজন?"

"তুমি বললে এটা কি করে সম্ভব তাই। আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট-এর মেসেজ বক্স, হোয়াটসআপ, জিমেল ঘেঁটে দেখতে পারো। অপ্রীতিকর কিচ্ছু নেই কোথাও।"

পৌনে ছয় ঘণ্টার ব্যবধানে সে গুড মর্নিং করে। আমি আমার গভীর ভালবাসা জাহির করি ওর কাছে। অনেকক্ষণ বাদে সে উত্তর দেয়, "জীবনটা একটু জটিল হয়ে পড়েছে।" বুঝতে অসুবিধে রইল না যে অফিস সংক্রান্ত ব্যাপারে সে বিপর্যস্ত। বলে, "গত উনিশ বছর আমাকে এমন কোন ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়নি।" তারপর সারাদিন কোন খবর নেই। রাতে জানতে চাইলাম সমস্যা কোন সমাধানের দিকে এগিয়েছে কিনা। সে বলল, "না। আমার এখন এর পেছনে সময় দিতে হবে কিন্তু মনও লাগাতে পারছি না।"

"এই অসময়ে আমি তোমার জন্য কিছু করতে চাইছি।"

"না, আমার সমস্যা আমাকেই সামলাতে হবে। দেখা হলে সামনাসামনি বসে আমরা আলোচনা করব।"

ভারত ম্যাট্রিমোনিতে তিনমাসের জন্য জন্য তিনরকমের প্যাকেজ ছিল—ক্লাসিক, ক্লাসিক অ্যাডভান্টেজ এবং ক্লাসিক প্রিমিয়াম। তিনটের জন্য বেস্ট অফার মানে ডিসকাউন্টেড

রেট ছিল ক্রমান্বয়ে চার হাজার তিনশো টাকা, চার হাজার পাঁচশো টাকা এবং চার হাজার আটশো টাকা। ক্লাসিকে চল্লিশটি ফোন নম্বর আমি দেখতে পাব এবং তিরিশজনকে মেসেজ করতে পারব। ক্লাসিক অ্যাডভান্টেজে পঞ্চান্নটি ফোন নম্বর দেখতে পাব এবং চল্লিশজনকে মেসেজ করতে পারব। ক্লাসিক প্রিমিয়ামে সত্তরটি ফোন নম্বর পাব এবং পঞ্চাশজনকে মেসেজ করতে পারব। সবকটিতেই মেল আনলিমিটেড। আমি ক্লাসিক প্লেনটাই পছন্দ করেছিলাম। ভেবেছিলাম বেশি লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে কি হবে! এই কটা লোকেরই ধকল সামলাই আগে।

সত্যিই ধকল। অ্যাকাউন্ট খুলতে না খুলতেই মোবাইলের ডিউটির চাপ বেড়ে যায়। যখন তখন বিবাহে ইচ্ছুক অথবা বিবাহের ধ্বজা রেখে প্রেম-বন্ধুত্ব-সুতপার ড্যাশ করতে ইচ্ছুক অনেক লোকের ফোন আসে যেমন শৈবাল ঘোড়াই, নির্মল দাস, পিনাকি-মিনাকি-দীপঙ্কর-রামলাল-কমলাকান্ত-বিশ্বেশ্বর-বিশ্বনাথ। এছাড়া চেনাপরিচিত লোক, বন্ধু-বান্ধবের অফিশিয়াল আনঅফিশিয়াল ফোন তো থাকেই। এসবের সঙ্গে যোগ হয়েছে ভারত ম্যাট্রিমোনির অফিসের ফোন। দিনে কম করে হলেও পাঁচ থেকে ছয়বার বিরক্ত করে ওরা। একবার টাকা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলেছি। আরে তিনমাস একটু শান্তিতে থাকতে দে! তা নয়, আরও টাকা খাওয়ার জন্য ভিখারির মতো পেছনে পড়ে আছে। প্রত্যেকবার নম্বর আলাদা হওয়ায় বুঝতে পারি না। ভাবি কারও কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকতে পারে। অনেক সময় এমন হয় যে অকাজের ভেবে যে কল রিসিভ করি না সেটাকেই পরে অনেক জরুরি ছিল বলে জানি এবং যখন জানি তখন আফসোস করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। তাই কোন ঝুঁকি না নিতে চেয়ে ট্র্যাফিকের মাঝখানে স্কুটার থামিয়ে কল রিসিভ করি, শুনি ওপাশ থেকে কেউ বলছে, ''ম্যাম্ আমি সৌরভ ঘোষ ভারত ম্যাট্রিমোনি থেকে বলছি...।'' কোন অফিশিয়াল আলোচনার মাঝখানে এক্সকিউজ মী বলে কল রিসিভ করি, শুনি কেউ বলছে, ''ম্যাম, আমার নাম অনুপ্রভা, আমি ভারত ম্যাট্রিমোনি থেকে বলছি...।'' স্নানের মাঝখানে ভেজা গায়ে টাওয়েল জড়িয়ে বেডরুমে এসে কল রিসিভ করি, শুনি কেউ বলছে, ''আমি ভারত ম্যাট্রিমোনি থেকে রাহুল সরকার বলছি...।'' বিরক্তি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রেখে দিই ফোন।

প্রথমদিন একটু বেশি সময়ের জন্য ফোন কানের কাছে ধরে রেখেছিলাম। একটি মেয়ে ছিল ওপাশে। বলেছিল, ''আপনার জন্য আমাদের কাছে অনেক রেসপন্স আসছে। আপনি চাইলে আমরা আপনার হয়ে পার্টির সঙ্গে কথা বলব।''

''কথা বলে কি করবেন?''

''কথা বলে আপনার জন্য বেস্ট সিলেক্ট করে আপনাকে প্রতি সপ্তাহে দুই থেকে চারজনের প্রোফাইল পাঠাবো। আপনার যদি তাঁদেরকে দেখে পছন্দ হয় এবং তাঁরাও যদি আপনার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক হন তাহলে আপনার বাড়িতে না হলে তাঁদের বাড়িতে আপনাদের মিটিং-এর ব্যবস্থা করব।''

''অতি উত্তম। আমার না চাওয়ার কি আছে! বলুন না কথা।''

''কিন্তু ম্যাম্, তার জন্য আপনাকেও তো কিছু করতে হবে...''

''কি করতে হবে? আমাকে কলকাতায় আসতে হবে? দেখুন অনেক পার্টি আছে

যারা আমার কাছাকাছি থাকে। আপনি তাদের সঙ্গে আমার কথা বলিয়ে দিন।"

"না না, সেটা কোন সমস্যা নয়..."

"তাহলে সমস্যাটা কি?"

"আমাদের একটা ম্যানেজার অ্যাপয়েন্ট করতে হবে...উনি তো আর বিনে পয়সায় কাজ করবেন না..."

"ও আমাকে তার জন্য টাকা দিতে হবে বুঝি?"

"একজ্যাক্টলি। আপনি তিনমাসের প্যাকেজ নিয়েছেন তো। তিনমাসের জন্য আমি আমাদের ডিসকাউন্টেড রেট বলছি...চৌদ্দ হাজার টাকা..."

"চৌদ্দ হাজার!"

"ম্যাম্, আমরা আসলে আঠারো হাজার চার্জ করি। আজকে আমাদের অফার চলছে...তাই আপনি এই সুবিধেটা পাচ্ছেন..."

"আমার দরকার নেই প্লীজ।"

দরকার আমার না থাকলেও ভারত ম্যাট্রিমোনির আছে। ভারত ম্যাট্রিমোনি ভারতের কোথায় কোথায় অফিস খুলে রেখেছে, কতজন লোককে কাজে নিয়োগ করে রেখেছে কে জানে! সবাইকে মাইনে দিয়ে পুষতে হবে, পুষে বিশাল পরিমাণ লাভ ওঠাতে হবে, দেশের কোণে কোণে তৈরি করতে হবে ম্যাট্রিমোনির অফিস। তাই তারা আমাকে ফোন করা বন্ধ করে না। অফারের ওপর অফার কানে গোঁজার চেষ্টা করে। মনে হয় ওদের ওখানে আই ডি খুলে বিশাল অপরাধ করে ফেলেছি, সুতরাং শাস্তি আমাকে পেতেই হবে। কতবার বলেছি আপনারা আমাকে ফোন করবেন না। দরকার হলে আমি নিজেই আপনাদের সঙ্গে কথা বলে নেব কিন্তু কে কার কথা শোনে! বিরক্তি ঝাড়তে মাঝে মাঝে খুব গালি দিতে ইচ্ছে করে। দিইও গালি, "আপনাদের যদি এতই টাকাপয়সার টানাটানি তাহলে হাতে বাটি নিয়ে রাস্তায় ভিক্ষে করতে বসুন।" এমন কথা শুনলে তাদের আবার আত্মসম্মান ঘা খায়। মেয়ে হলে তো কথাই নেই। উল্টে গালি দেওয়ার জন্য বারবার ফোন করতে থাকে। একশোবার মানা করা স্বত্ত্বেও তারা হাজার বার ফোন করতে পারে কিন্তু আমি একবারের জন্যেও বিরক্ত হতে পারি না। জবরদস্তির ওপরই চলে সব।

নাসিকের শ্রীগোপাল চক্রবর্তী নামে একজন বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার কয়েকদিন ফোনে কথাবার্তা হয়েছিল। ব্যংকে চাকরি করতেন। যে কোন শহরের মেয়েকে বিয়ে করে সেখানেই স্থায়ীভাবে থেকে যেতে পারবেন ভেবে ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট নিয়েছেন। উনি বলেছিলেন, "জানেন তো ম্যাডাম, ভারত ম্যাট্রিমোনি আমার কাছ থেকে সাড়ে সতেরো হাজার টাকা খেয়েছে। ম্যানেজার অ্যাপয়েন্ট করেছিল...পার্সোনাল কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজার। আমি তো প্রথম কয়েকমাস নিজে কোথাও যোগাযোগ করিনি, ওদের ওপরই নির্ভরশীল ছিলাম। ওরা এমন এমন সব মেয়ের ফটো পাঠাতো যাদের দেখে মনে হত ওই সব জায়গা থেকে উঠে এসেছে। যাই হোক, তাদের মধ্যে থেকেই আমি একটি মেয়েকে পছন্দ করেছিলাম, তার সঙ্গেও নিগোশিয়েট করে দিতে পারেনি। কয়েকমাস পরে ভাবলাম না এভাবে আর চলবে না। এবার আমাকেই যোগাযোগ করতে হবে।"

মিস্টার শ্রীগোপাল চক্রবর্তী কটা ফোন নম্বর ব্যবহার করতে পেরেছিলেন তা আর জিজ্ঞেস করা হয়নি। আমি তখন তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানতে একটু বেশি আগ্রহ নিয়েছিলাম—উনি ঠিক কি করেন, ঘরে আর কে কে আছেন, পছন্দ-অপছন্দ কি ইত্যাদি। জানি প্রোফাইলে দেওয়া আছে তবু। জিজ্ঞেস করেছিলাম তাঁর ডিভোর্সের কারণ। উনি বলেছিলেন, ''আমার সঙ্গে শোবে না।''

''আমার সঙ্গে শোবে না মানে?''

''আরে, বুঝতে পারলেন না ম্যাডাম? আমার বউ আমার বিছানায় শুতে চাইত না। মাত্র চৌদ্দ দিন ওর সঙ্গে ছিলাম। অনেক রাগারাগি করে। কিন্তু ওইভাবে কি মজা আসে?'' চৌদ্দ দিন পরে আমিই বলেছিলাম এভাবে আর থাকা যাবে না...''

''কেন এমন হল?''

''জানি না ম্যাডাম। কৃষ্ণনগরের মেয়ে। একদম ফালতু। কোর্টে আমার বিরুদ্ধে ক্রিমিন্যাল কেস উঠেছিল। বলা হয়েছিল আমি নাকি ওর ওপর মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার করেছি। আমাকে এবং আমার মা-বাবাকে আরেস্ট করা হয়েছিল। যা হোক করে আমরা বেল পেয়ে গিয়েছিলাম। পরে সে মেন্টেন্যান্সও দাবি করেছিল আমার কাছে। আমি দিতে চাইনি। কেস জিতে গিয়েছিলাম কিন্তু সেই চৌদ্দ দিনের পর আমার চৌদ্দ বছর লেগেছিল ওর কাছ থেকে উইদাউট মেন্টেন্যান্স ছাড়া পেতে। আমার আনন্দের সময়টা পুরো নষ্ট করে দিয়েছে সে। বাজে মহিলা একটা।''

''ওহ্।''

''যাকগে, যা হয়েছে হয়েছে। আমি এখন একটা সুন্দর জীবন চাই। আমার খুব বিয়ে করার ইচ্ছে ম্যাডাম।''

''আমার মনে হয় সরকারি চাকরি ছেড়ে আপনি ঠিক করেননি।''

''এত টাকা কে খাবে ম্যাডাম? আমি একজিকিউটিভ লেভেলে ছিলাম। দু'লাখ টাকা স্যালারি নিয়ে রিটায়ার করেছি। আমার আড়াই কোটি টাকার এফ ডি আছে, পেনশন আছে, দুটো দোকান ভাড়াতে দেওয়া আছে। মাসের উপার্জন তিন লাখের কম নয়। এছাড়া আমার নাসিকের বাড়িটা বিক্রি করলে আমি দেড় কোটি টাকা পাব। মুম্বাইতেও একটা ফ্ল্যাট আছে। আপনি কোথায় সেটল হতে চান? মুম্বাইতে, কলকাতায়, পুনেতে যেখানে বলবেন সেখানেই আমি চলে আসব।''

''টাকার জন্য নয়। দিনের কিছু সময় বাইরে এনগেজড থাকা দরকার। সারাদিন ঘরে বসে বসে কি করবেন?''

''ঘরে অনেক কিছু করার আছে ম্যাডাম। আপনি আমাকে বিয়ে করলে আপনাকে কোন কাজ করতে হবে না। আমি সব কাজ পারি। রান্নাও। আমরা একসঙ্গে একই থালায় খাব, একসঙ্গে বসে গল্প করব, ঘুরতে যাব। দিনের চব্বিশ ঘণ্টা আমি আপনার সঙ্গেই থাকব. আপনি চাইলে আমি আপনার পা-ও টিপে দেব...''

''ছাড়ুন, আর এগোতে হবে না। আমাকে তো কাজে বাইরে বেরোতে হয়। তখন আপনি ঘরে বসে কি করবেন?''

''আপনি জানেন না ম্যাডাম, আমারও বাইরে অনেক কাজ থাকে। আমি কতগুলো গরীব বাচ্চার পড়াশোনার খরচা বহন করি। এছাড়া কিছু সামাজিক সংস্থার সঙ্গেও

আমি জড়িয়ে আছি। সেসব কাজ অবশ্য আমি যে কোন শহরে থেকেই করতে পারি...”

এতদিন ম্যাট্রিমোনি সাইটে আছেন...আপনার আর কোন মহিলাকে পছন্দ হয়নি?”

‘‘তনিমা সান্যালের নাম শুনেছেন?”

‘‘না।”

‘‘তনিমা সান্যাল হলেন টিভি স্টার। ওঁর সঙ্গে কথা হচ্ছে গত একবছর ধরে। কলকাতায় আমি ওঁর বাড়িতেও গেছি। কিন্তু বিয়ের কথা এখনও ফাইনাল হয়নি।”

‘‘কেন?”

‘‘সারাদিন শুটিং নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকেন। সময় দিতে পারেন না। তার ওপর গত ডিসেম্বরে ওঁর মা মারা গেছেন। একবছর না পেরোলে তো বিয়ে করতে পারবেন না। সে আমি না হয় অপেক্ষা করে নেব কিন্তু উনি তো খোলাখুলি কিছুই বলছেন না। অথচ আমাকে পছন্দ হয়েছে বলে জানিয়েছেন।”

‘‘আচ্ছা।”

‘‘আর একটি মহিলা...দমদমে থাকেন। চাকরি করেন। বছর সতেরো আঠারোর একটা মেয়ে আছে। উনিও দেখতে সুন্দর। ওনার ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝি না ম্যাডাম। ডিভোর্সের পরেও হাজব্যান্ডকে নিয়ে চিন্তা করেন। হাজব্যান্ড নাকি অসুস্থ, এই অবস্থায় ওনাকে ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছেন না। উনিও সময় চাইছেন। কিন্তু আমি আর দেরি করতে চাইছি না।”

‘‘ব্যস, এই দু’জনই আছেন?”

‘হুঁ’ করে হাসেন শ্রীগোপাল, ‘‘আর আপনি আছেন। আপনি চাইলে আমি পুনেতে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারি। আপনি ঘুরতে ভালবাসেন তো?”

‘‘নিশ্চয় ভালবাসি।”

‘‘আমি আগামী মাসে ইউ এস এতে যাচ্ছি দিন পঁচিশের জন্য।”

শ্রীগোপালকে আমার খুব পছন্দ হয়নি। বয়সটা একটু বেশি লেগেছে। বয়সের ছাপ ওঁর চেহারায় বেশ স্পষ্ট। শ্রীগোপালের কথাবর্তায় আমার মনে হয়েছিল উনি যে কোন সময় বিয়ের পিড়িতে বসার জন্য তৈরি আছেন। শুধু পাত্রীর রাজি হওয়ার অপেক্ষা। তাই অনিন্দিতাকে বলি, তোর ডিভোর্স হওয়া থাকলে এখনই একটা ভালো পাত্র দিতে পারতাম। সে জিজ্ঞেস করে, ‘‘আমাকে গছাতে চাইছিস কেন? তোর ওকে বিয়ে করতে কি হল?”

‘‘আমি আপাতত নতুন কাউকে নিয়ে আর ভাবতে পারছি না।”

‘‘বয়স কত?”

‘‘আটান্ন বছর।”

‘‘এই আমি বুড়ো বর চাই না রে,” নেকু নেকু স্বরে বলে অনিন্দিতা। ‘‘মালটার ডিভোর্স কেন হল জিজ্ঞেস করেছিলি।”

‘‘করেছিলাম।” আমার কাছে শ্রীগোপালের অতীতের কাহিনী শুনে সে আমাকে সাবধান করে, ‘‘একে ছাড় একে ছাড়। একে ছেড়ে দে বলছি রূপা। একে না ছাড়লে পরে এ কিন্তু তোকে ছাড়বে না। লোকটি বিছানায় বউ-এর স্বাদ একদমই

পায়নি। শৈবাল ঘোড়াই-এর মতো।"

''সেটা নাও হতে পারে। হায়দেরাবাদের একটি মেয়ে নাকি ওঁকে ফোন করে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনার তো বয়স অনেক হয়েছে। আপনি কি আমাকে সাটিসফায়েড করতে পারবেন? আমার সেক্স-এ খুব ইন্টারেস্ট।"

''তা মালটা কি বলেছে? পারব না?"

''মহিলাটির সঙ্গে শ্রীগোপালের কি কথাবার্তা হয়েছে শোন—"

শ্রীগোপাল ঃ আপনার আগের হাজব্যান্ড কি সক্ষম ছিলেন না?

মহিলা ঃ ওর নাইট ডিউটি থাকত।

শ্রীগোপাল ঃ আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনার আগের হাজব্যান্ড কি সক্ষম ছিলেন না?

মহিলা ঃ বলছি তো ওর রোজ নাইট ডিউটি থাকত।

শ্রীগোপালঃ যারা নাইট ডিউটি করে তাদের নিশ্চয় বাচ্চা হয় না, তাই না?"

মহিলা ঃ কি বোঝাতে চাইছেন আপনি? আমার ছেলেমেয়ের বাবা কি অন্য কেউ?"

শ্রীগোপাল ঃ একদমই নয়। তার মানে উনি সক্ষম ছিলেন। তবু আপনার...ঠিক আছে, আসুন আমরা দেখা করে কথাবার্তা বলি।"

অনিন্দিতা বলে, ''তাহলে? আমি তো ভেবেছিলাম তুই বলবি মালটা শুনে ভয় পেয়ে গেছে। তা তো হল না। শোন বয়স বাড়লে ছেলেদের সেক্স বাড়ে।"

''আরে শোন আগে। আমার কথা এখনও শেষ হয়নি।"

''বল।"

''উনি বলেছেন মেয়েটি দেখা করার জন্য কলকাতায় এসেছিল। তাকে মিটিং পয়েন্ট, সময় বলে উনি নাকি আর সেখানে যাননি। বিট্রে করে দিয়েছেন।"

''এ বাবা! এ তো আরেক সমস্যা! মালটার মধ্যে পুরুষত্ব অফ অন হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। যখন পুরুষত্ব হারিয়ে ফেলে তখন পালিয়ে বেড়ায় আর যখন ফিরে পায় তখন বিয়েপাগল হয়।"

''সেটা নয়। আমার মনে হয় লোকটি একটি ভদ্র হাজব্যান্ড হতে পারেন। আরেকটা কেস আছে।"

''কি?"

''একজন মহিলা সরাসরি সেক্সের কথা বলতে লজ্জা পেয়েছেন। বলেছেন, আমার বাচ্চা চাই।"

''কি উত্তর দিয়েছে মাল?"

''অনুমান কর।"

''তখন ওর পুরুষত্বের কোন স্টেজ ছিল আমি কি করে জানব?"

মেয়েটিকে শ্রীগোপাল কি বলেছেন জানি না। আমাকে বলেছেন, ''তাঁর আগের হাজব্যান্ড থেকে পাওয়া তিনটে বাচ্চা আছে। আচ্ছা বলুন তো ম্যাডাম এই বয়সে তাঁর আবার বাচ্চার কি প্রয়োজন?"

বিয়ের উদ্দেশ্যে মহিলাদের ক্ষেত্রে বিচরণ করতে করতে শ্রীগোপালের আরও

কিছু খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছে। একজন মহিলা বলেছেন, ''আপনি আগেই মৌলালিতে নতুন ফ্ল্যাট কেন বুক করলেন? বিয়ের পর জয়েন্ট নামে করতে হত।'' একজন বলেছেন, 'আমার একটা ফ্ল্যাট চাই।'' একজন বলেছেন, ''বিয়ের কি প্রয়োজন? কমন প্রপার্টি বানিয়ে আমরা লিভ টুগেদার করতে পারি।''

শ্রীগোপাল বলেন, ''কলকাতা আর আগের মতো নেই ম্যাডাম। মহিলারা আর কোনওরকম বন্ধনে আসতে চায় না। যখন খুশি একসঙ্গে থাকবে, যখন খুশি বেরিয়ে যাবে। দেখতে সুন্দর হলে তো আর কোন কথা-ই নেই। এরা হল সব এক একটা প্রস্টিটিউট।''

তবু উনি সুন্দরী মহিলা চাইছেন। মহিলা আমেরিকা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া থেকে হলে আরও ভালো। চাকরি নেই, কোথাও গিয়ে থাকতে কোন বাধা নেই। শ্রীগোপালের বাবার পরিবারের অনেকে বিদেশেই থাকেন। তেমন হলে উনিও তাঁদের মতো একজন হতে পারবেন। মহিলা উনি পেয়েও যাচ্ছেন অনেক। দিশেহারা হয়ে কাকে পছন্দ করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না।

ম্যাট্রিমোনিতে আই ডি খোলার দেড় মাসের মধ্যেই আমি চল্লিশটি ফোন নম্বরের পঁয়ত্রিশটি দেখে ফেলেছি। সেই পঁয়ত্রিশটির মধ্যে তিরিশটি নম্বর চলেনি। সেটা নিয়ে কাস্টমার কেয়ারে অভিযোগ করতে গেলে ওরা বলে যেগুলো চলেনি সেইসবের 'আই ডি'গুলো পাঠান। একটি নম্বর না চললে তার জন্য আপনি দুটো নম্বরে ডায়াল করার সুযোগ পাবেন। কিন্তু কথা হচ্ছে আমার এত সময়ই বা কোথায় যে প্রত্যহ আই ডি নোট করে কমপ্লেন করতে বসব।

কোনওরকমে তিনমাস অতিক্রান্ত হলে আমার ম্যাট্রিমোনির পেইড মেম্বারশিপ শেষ হয়ে যায়। পেইড মেম্বারশিপ শেষ হলে ওরা আরও বেশি পেছনে পড়ে মেম্বারশিপ রিনিউ করানোর জন্য। উৎসাহ দিতে রোজ গাদা গাদা নোটিফিকেশন পাঠায়।

—এস রায়...যার সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করেছিলেন এখন একজন পেইড মেম্বার।

—শুভ্রাংশু আপনার মোবাইল নম্বরটা দেখেছে। আপনি কি তার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক? ইয়েস অর নো। ইয়েস-এ ক্লিক করতে গেলে মেম্বারশিপ আপগ্রেড করার প্রপোজাল আসে।

—আজ দু'জন নতুন মেম্বার জয়েন করেছে। তাদের প্রোফাইল আপনার প্রোফাইলের সঙ্গে ম্যাচ হয়। আপনি কি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন? আমি শুধু আমার আগ্রহ জানাতে পারি। আগ্রহ পার্টি পর্যন্ত পৌঁছয় কিনা জানতে পারি না। মেসেজ করে ফোন নম্বর দিতে গেলেও সেই একই প্রস্তাব—মেম্বারশিপ আপগ্রেড করুন।

—আপনি মানস বোসের ইন্টারেস্ট অ্যাকসেপ্ট করেছেন। মানস বোসকে নিয়ে আরও জানুন। *কি করে সম্ভব! জানতে গেলে তাকে ফোন না হলে মেসেজ করতে হবে। ফোন, মেসেজের জন্য ভারত ম্যাট্রিমোনিকে টাকা খাওয়াতে হবে।*

টাকা খাওয়ার জন্য ম্যাট্রিমোনি থেকে একটি মেয়ে আবার আমাকে ফোন করে,

''ম্যাডাম, আপনি জানেন কি যে আমাদের পুরনো মেম্বারের কাছ থেকে আমরা আরও কম চার্জ করি?''

''যেমন?''

''যেমন...'' চিবিয়ে বলে মেয়েটি, ''যেমন...এই অর্পণ চার্টটা একটু দে তো রে...'' পাশের কাউকে অনুরোধ করে সে। বোধ হয় নতুন জয়েন করেছে। ''এক মিনট ম্যাডাম, বলছি...হুঁ...আপনি আমাদের পুরনো মেম্বার। তাই এবার তিনমাসের জন্য মানে ক্লাসিকের জন্য আপনাকে দিতে হবে মাত্র চার হাজার একশো টাকা। ক্লাসিক অ্যাডভানটেজের জন্য চার হাজার তিনশো টাকা এবং ক্লাসিক প্রিমিয়ামের জন্য চার হাজার পাঁচশো টাকা। প্রত্যেকটাতেই আপনি দশটা করে বেশি ফোন নম্বর ভিউ করতে পারবেন...।''

''আর এস এম এস?''

''এস এম এস-এর সংখ্যা একই আছে। আসলে আপনার মেল আনলিমিটেড বলে এস এস এসটা আমরা বাড়াইনি।''

''আর যদি ছ'মাসের জন্য মেম্বারশিপ নিতে চাই?''

''ছ'মাসের জন্য ক্লাসিকের রেট হল পাঁজ হাজার পাঁচশো টাকা, ক্লাসিক অ্যাডভানটেজের রেট হল পাঁচ হাজার আটশো টাকা এবং ক্লাসিক প্রিমিয়ামের রেট হল ছয় হাজার একশো টাকা।''

''বাব্বা!''

''পুরনো মেম্বার বলে আপনি অনেক সস্তায় পাচ্ছেন ম্যাডাম। নতুন হলে ছ'হাজার একশো, ছ'হাজার পাঁচশো না হলে ছ'হাজার নয়শো টাকা দিতে হত।''

অনিন্দিতা আমাকে বলে, তিনমাস ছ'মাসে গিয়ে কি করবি? বেশিদিনের প্যাকেজ নে। দেখি একই আই ডি থেকে আমিও কাউকে জোটাতে পারি কিনা।''

''আমি দেখেছিলাম ওদের টিল ইউ ম্যারি বলে একটা প্যাকেজ আছে।''

শুনে সে হা হা করে হেসে ওঠে, ''আরে আমি তো লক্ষ্যই করিনি! বাহ্, দারুণ প্ল্যান তো! দেখগে সন্দীপ হয়ত এবার ওটাই নিয়েছে। বিয়ে তো আর তার করার ইচ্ছে হবে বলে মনে হয় না। তোর সঙ্গে কথা বলে সে যে সুখ পেয়েছে সেই সুখ পাওয়ার জন্য সারাজীবন ধরে মেয়ে খুঁজে বেড়াবে। মালটাকে আগে যত বুদ্ধিমান বলে মনে হয়েছিল এখন ততই বেকুব বলে মনে হচ্ছে। কি ভীমরতিতে এমন করল কে জানে!''

*****

সন্দীপ একটা ভয়ংকর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল সেই রাতেই যে রাতে সে আমায় বলেছিল দেখা হলে সামনাসামনি বসে সে অফিসের সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবে। তার সেই ভয়ংকর সিদ্ধান্তটা আমার মন কিছুতেই মানতে চাইছিল না। মন বলে চলেছিল এটা হতেই পারে না। যে মানুষটা নিজেই নিজেকে আমার এত কাছে নিয়ে এসেছে, মুখে ভালবাসার কথা বলে তার শরীরকে আমার শরীরের সঙ্গে এক করে দিয়েছে সে হঠাৎ এমন করতেই পারে না।

দেখা হলে কথা হবে। তাই বলে ওকে এত বিব্রত দেখে আমি তখন নিশ্চিন্তে

বসে থাকতে পারিনি। জানতে ইচ্ছে করছিল সমস্যাটা কোথায় কিভাবে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কেন দাঁড়িয়ে পড়েছে। কথা বলতে চেয়েছিলাম খুব। ফোন করেছিলাম কয়েকবার। সে তখন অন্য কারও সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত ছিল। অপেক্ষা করছিলাম খালি হলেই সে আমাকে ফোন করবে ভেবে। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত তেমন কিছুই হল না। মেসেজ পাঠালাম 'আমাকে কল করো' লিখে। তবু কল এল না। শেষে আমিই আবার ওকে ফোন করলাম। কেন যে এমন হল—হয়ত গত কয়েকদিন ওর সঙ্গে আদর ভালবাসা নিয়ে টানাটানি না হওয়ার কারণেই হবে, ফোন করেও দ্বিধা এল মনে, স্বল্প আত্মসম্মানও জেগে উঠল। আত্মসম্মান! আত্মসম্মান নাকি লজ্জা! নাকি দুটোই! ঠিক বুঝতে পারলাম না। যে কারণেই হোক ওকে বললাম, ''ফোন করলে না! ভালবাসি, তার মানে এই নয় যে তুমি না চাইলেও আমি তোমার গায়ের সঙ্গে লেগে থাকব।''

সন্দীপ সে কথার জবাব না দিয়ে আমাকে ওর অফিসের কথা শোনাতে শুরু করল এবং তাড়াহুড়ো করে অনেক কিছু বলেও ফেলল। দশটা বেজে গেছে। জিজ্ঞেস করলাম, ''তুমি ডিনার করেছ?''

''না।''

''ডিনার সেরে ফোন করো।''

কিচ্ছু না বলেই হঠাৎ কেটে দিল সে লাইন। সন্দেহ রইল না সে আমার বক্তব্যের মর্মার্থ না বুঝে রাগ করেছে। ভাবলাম ওকে বুঝিয়ে বলব, ''এটা তোমার ডিনারের সময়। তুমি হার্টের পেশেন্ট। শরীরের এত অযত্ন ঠিক নয়। তুমি সিগারেটও ছাড়ছ না। আলোচনা শেষ হতে সময় নেবে। তাই বলেছি।'' কিন্তু সে সুযোগ সে আমায় দিল না। সন্দীপের নম্বর আমার মোবাইলে সেভ করা আছে তবু হারিয়ে ফেলার ভয়ে তাকে একবারে স্মৃতির মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছিলাম। মুখস্থ হয়ে যাওয়া সেই দশটি সংখ্যা চারবার ক্রমান্বয়ে ডায়াল করে গেলাম। রিং হয়ে হয়ে বন্ধ হয়ে গেল ফোন। চারবারই সে আমার উদ্‌বিগ্নতাকে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে উপেক্ষা করল। একবারও ধরল না। তার বদলে ওর একটা মেসেজ পেলাম, ''কাল কথা হবে।''

কাল সকালে তুমি অফিসের তাড়াতে থাকবে। তখন কোনমতেই কথা হওয়া সম্ভব নয়। সারাদিন আমি তোমার ব্যাপারে কিছুই জানতে পারব না। এত উৎকণ্ঠা নিয়ে এতগুলো ঘণ্টা কাটানো খুব পীড়াদায়ক হবে সন্দীপ। ''না আজই। আমি তোমার ডিনার শেষ হওয়ার অপেক্ষা করব।''

কোন উত্তর নেই তার। আবার ফোন করলাম। আবার বেজে বেজে বন্ধ হয়ে গেল ফোন। ধরল না। মেসেজ করলাম, ''একটা ছোট্ট সমস্যা নিয়ে পড়ে আছ।'' *অকারণে রাগ করছ আমার ওপর।*

কোন উত্তর নেই।

''তুমি সত্যিই ভালবাসা বোঝো না। এভাবে প্লেনের ভাড়া দিয়ে কে তোমার জন্য কলকাতায় আসতে চাইবে সন্দীপ?''

উত্তর নেই।

''একজন মহিলা যে এমন নিঃস্বার্থভাবে কোন পুরুষকে চাইতে পারে তা বিশ্বাসই

করতে পারছ না তুমি।"

সে লেখে, ''আমার মনে হয় তোমার সঙ্গে আমার চূড়ান্ত অমিল রয়েছে। সুতরাং আমাদের এখানেই থেমে যাওয়া উচিত।"

কি বলছ? মানুষ কোন পাথর নয় যে তাকে যখন যেভাবে খুশি ব্যবহার করা যায় এবং ব্যবহার করে যখন যেভাবে খুশি ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যায়। ''অমিল! হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আমার অমিল তো রয়েইছে। সেদিন তুমি ভালবাসার সাইকোলজিক্যাল, ফিজিক্যাল এবং ফিজিওলজিক্যাল উপাদানের সঙ্গে আর্থিক উপাদানটি যোগ করনি। হয়ত করতেই চাওনি। সন্তর্পণে এড়িয়ে গেছ। আজ আমি করছি যোগ। প্রয়োজন হলে এই মুহূর্তে আমি তোমার হাতে লাখ টাকা তুলে দিতে পারি।" *এবং...এবং এই অমিলকে সঙ্গে নিয়ে আমি চলতেও পারি। আজকের এই অবস্থায় অস্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই যে তোমার স্বপ্নের সঙ্গে আমি আমার স্বপ্ন মিশিয়ে ফেলেছি। আমি আমার প্রগতি তোমার পথেই বেঁধে ফেলেছি কিংবা তোমার প্রগতি আমার পথে। মিলেমিশে এক হয়ে গেছি আমি তোমার সঙ্গে।*

তবু সে আমাকে তার সঙ্গে এক করে দেখতে চাইল না। লিখল, অমিল অমিলই হয়। সেটা যেমনই হোক না কেন। আমাদের আর কথা চালিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।"

''এমন করো না সন্দীপ। ফোন রিসিভ করে বুঝিয়ে তো বলো হঠাৎ একথা তোমার মনে আসার কারণটা কি। অনেক ভালবাসি তোমায়।"

উত্তর নেই।

''জেদ করো না। দেখো তোমার সঙ্গে অনেক নরম হয়ে কথা বলব, অনেক স্নেহ দিয়ে, অনেক আদর করে। কল করো প্লীজ।"

তারও উত্তর দিল না সে।

''কলকাতায় গিয়ে অনেক ভালবাসব, বোঝাবো তোমাকে সত্যিকারের ভালবাসা কাকে বলে, কেমন হয় তার রূপ, কেমন হয় তার স্বাদ।"

উত্তর দিল না। মে মাসের শেষ রাতের অন্ধকারে ডুবে গিয়ে হঠাৎ ধূমকেতুর মতো হারিয়ে যেতে থাকল ধূমকেতুর মতোই আমার মনের অন্তরীক্ষে ঢুকে পড়া মানুষটি।

সন্দীপ, আমার মন বলেছিল শেষ পর্যন্ত হয়ত এমনই কিছু একটা হওয়ার আছে। তুমি আমাকে প্রথম থেকেই বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছিলে তোমার সঙ্গে আমার কোন স্থায়ী সম্পর্ক তৈরি হওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু ওই যে, মন বড় বেয়াদব, চরম সত্যিগুলো বলতে তার কোন আপত্তি থাকে না অথচ মানতেই যত আপত্তি। বর্ষার ঘোলা জলে ভরে যাওয়া নদীতে আবেগের ভেলায় চড়ে ভেসে চলেছিল সে ক্রমাগত। ভেলাতে মন তার অনুভূতি দিয়ে, চোখ দিয়ে কখনও তোমাকে পেয়েছিল, কখনও পায়নি। কখনও দেখেছিল দূরে—নদীর কিনারায় আমার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে মুখে হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ—কাছে টেনে নেওয়ার অঙ্গীকারবদ্ধ হাসি। কখনও তুমি গুটিয়ে নিয়েছিলে হাত, পেছনে হাঁটতে শুরু করেছিলে। হাঁটতে হাঁটতে কখনও আবার ফিরে এসেছিলে ভেলাতেই। কিন্তু আজ সেই শেষের দিনটি এসেই গেল

বলো? এখন আর তাহলে মন তোমার প্রত্যাবর্তনের আশা রাখতে পারে না তাই না?

অসম্ভব যন্ত্রণাময় রাতকে পার করে দিয়ে প্রকৃতি আমায় উপহার দিয়েছিল এক সকাল। সেই সকালে আমার বইয়ের প্রচ্ছদশিল্পী আমায় জানিয়েছিলেন আমার বই 'পিপাসা যখন'এর একটি রিভিউ বেরিয়েছে বর্তমান চতুস্পর্ণীতে। ছোট্ট রিভিউ। তবু খুশিকে চেপে রাখতে পারিনি। অনিন্দিতা, সুতপা, সোনালি, তাপসদা এমনকি সন্দীপকেও বলেছিলাম আমার খুশির কথা। বাকি সবাই বাধাই দিয়েছিল একমাত্র সে ছাড়া। একবারও বলেনি বেশ। লিখেছিলাম, তুমি আমাদের জন্মদিনটা একসঙ্গে সেলিব্রেট করতে চেয়েছিলে। যদি বলো কলকাতায় আসব।" তারও কোন উত্তর দেয়নি সে।

সন্দীপের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বন্ধ হওয়ার পর একমাস কেটে গিয়েছিল। সেই একমাস আমি প্রকৃত ভালাবাসার সংজ্ঞা খুঁজে বেড়িয়েছিলাম। অনেকের কাছে। একদিন পার্কে একজন বয়স্ক পুরুষ এবং বয়স্কা মহিলাকে অন্তরঙ্গ হয়ে বসে গল্প করতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ''আচ্ছা, ভালবাসা বলতে আপনারা কি বোঝেন?"

মহিলা অচেনা আমার প্রশ্ন শুনে মোটেও খুশি হননি। বলেছেন, ''এখন ঘরে ফেরার তাড়া আছে। কাল এসো বলব।"

''এক মিনিট প্লীজ..."

পুরুষ তার সঙ্গিনীকে বাধা দিয়েছেন, ''একটু দাঁড়াও। সংজ্ঞাটা দিয়েই যাই।" তারপর আমার দিকে ফিরে, ''ভালবাসা হল শর্তহীন অনুরাগ, সীমাহীন অনুরাগ নিয়ে একসঙ্গে থাকার বাসনা, পরস্পরকে সুখী করার প্রচেষ্টা, ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা এবং হারানোর ভয়...ভালবাসা হল..."

সঙ্গিনী ঃ ''আর দেরি করো না। কখন থেকে বলছি এবার উঠতে হবে। তুমি শুনছই না। ডাক্তার বলেছেন ঠিক সাতটায় তোমাকে ছানা খেতে হবে। তারপর হাঁপানির ওষুধ..."

রাস্তায় গল্প করতে করতে হেঁটে যাওয়া প্রেমিক-প্রেমিকাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ''ভালবাসা বলতে তোমরা কি বোঝো?"

আমার প্রশ্ন শুনে তারা অবাক হয়েছিল।

''বলো প্লীজ।"

দেখি প্রেমিক-প্রেমিকা একে অন্যের দিকে চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর প্রেমিকা প্রেমিককে বলল, ''আমি বলতে পারব না। তুমি বলো।"

''একসঙ্গে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা। এটা এমন এক অভিজ্ঞতা যে তোমাকে এক অদ্ভুত অনুভূতি দেবে। তাকে ছাড়া তোমার জীবন একটা খালি পাত্রের মতো লাগবে। তুমি তোমার আত্মীয় এবং পরিচিত সবাইকে তার কথা বলবে এবং তাকে বিয়ের কথা ভাববে।"

''তোমরা বুঝি বিয়ে করছ?"

''হ্যাঁ, আগামী মাসের তিন তারিখে," দু'জনেই বলল। একসঙ্গে। বলতে বলতে দু'জনেরই মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আমাদের সোসাইটির সাত আট বছরের বাচ্চা ছেলেটা, যে দেখতে অসম্ভব সুন্দর কিন্তু একটু মোটা বলে আমি তাকে সামনে সাহেব এবং পেছনে ভোড্‌কা বলি, যে একদিন তার মা আসবে বলে আমাকে এবং রিলিকে লিফটের দরজা খুলে রেখে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছিল এবং অবশেষে মা এলে বলেছিল ''হ্যাই মম্', যার ব্যাপারে রিলি মোটামুটি নিশ্চিত যে সে বড় হয়ে একটা প্লে বয় হবে—তাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, ''তুমি তোমার মাকে খুব ভালবাস তাই না?''

''সিওর।''

''ভালবাসার মানেটা আমাকে বলতে পারবে?''

''ইট ডিপেন্ডস। মম্‌কে না গার্ল ফ্রেন্ডকে?''

''তোমার গার্ল ফ্রেন্ড আছে বুঝি?''

''ইয়েস আই লাভ টিনা।''

''তাহলে গার্ল ফ্রেন্ডকে ভালবাসার মানেটাই বলো।''

''প্লেজার অ্যান্ড পেইন।''

''মানে?''

''বুঝলে না? সঙ্গে থাকলে আনন্দ হয়, না থাকলে কষ্ট।''

''সাব্বাস ভোড্‌কা!''

''ভোড্‌কা! হে, আই ডোন্ট লাইক ভোড্‌কা। ইটস ফর লেডিস...''

''না না, সব্বাস সাহেব।''

সেই একমাস আমি আমার ব্যাপারে সবকিছুই সন্দীপকে জানিয়ে গেছি। একতরফা।

—আজ সুতপা আমার ঘরে ডিনারে এসেছে।

—আজ আমরা লাভাসাতে ঘুরতে যাচ্ছি।

—আজ তাপসদার জন্মদিন সেলিব্রেট করছি।

বলেছি, ''জানো আজ বিকেলে যখন পড়ে আসা সূর্য আকাশে লাল আভা ছড়িয়ে দিয়েছিল, দেখি দুটো পাখি মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। ওরা উড়তে উড়তে অবিশ্বাস্যভাবে নেমে এসে বারান্দার রেলিং-এর উপর আমার সামনে বসল। জিজ্ঞেস করল আমায়, তুমি আমাদের মতো হবে? খুব মনে পড়ছিল তোমাকে।''

বলেছি, জানো আজ মিনাক্ষী দত্ত ফোন করে বললেন বাস্তবের আড়ালে বইটি পড়ে খুব ভালো লেগেছে। ওনার হাজব্যান্ড জ্যোতির্ময় দত্তের সঙ্গেও কথা হয়েছে। এ হল কলকাতার সাহিত্য জগত থেকে আমার এক পরম প্রাপ্তি। আমি তো নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখছি। জ্যোতির্ময় দত্ত আশা করছেন আমার পরের উপন্যাসের পটভূমিতে পশ্চিমঘাট পর্বতমালাও থাকবে...''

বলেছি, ''তুমি আমাকে ভালবেসেছিলে কারণ আমাকে তোমার প্রয়োজন ছিল। এখন আমার তোমাকে প্রয়োজন কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি। প্লীজ কথা বলো সন্দীপ।''

আমাদের সম্পর্কের আপডেট চেয়ে চেয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল সবাই। সবাইকেই 'খুব ব্যস্ত আছি' বলে ডুব মেরেছিলাম। ডুব মেরে এসবই করছিলাম। বুঝতে পারছিলাম সন্দীপ আমার জীবনে আর ফিরে আসবে না। না সে তাকে পরিবর্তন করতে পারবে না আমি নিজেকে। আমাদের মধ্যে অনিতক্রম্য বৈষম্য তো আছেই। তারপর ভাষা খুঁজে এক সন্ধিক্ষণ বেছে ঘোষণা করেছি, ''ওকে ভুলে যেতে হবে।''

সবাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, ''কেন?''

''সে কথা বলতে চায় না।''

''কারণ?''

''খুলে বলেনি কিছু।''

তারপর দেখেছিলাম তাদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে।

সোনালি আমায় বলেছে, ''একে তুই আমার কাঁধে গছাতে চেয়েছিলি?''

—হ্যাঁ, একবারে গ্যারান্টির সঙ্গে।''

—ইশ্, জীবনে অনেক পুরুষের ভালবাসা পেয়েছি। পেয়ে পেয়ে ঘেন্না ধরে গেছে। আর না।''

সুতপা বলছে, ''আমার প্রবাদটাই তাহলে আরেকবার ঠিক প্রমাণ হল। প্রেম না বাল, ড্যাশ ড্যাশ ড্যাশ।''

—সে হয়ত এতটাও খারাপ নয়।

—সরি, মানতে পারলাম না। কাউকে মন থেকে ভালো না বাসলে কাছে ডেকে সত্যি করেই হোক অথবা দূরে থেকে ফোনে ফোনেই হোক মুখে চুমু খাচ্ছি, জড়িয়ে ধরছি, বুকে হাত দিচ্ছি বলে তার শরীরের এত কাছাকাছি আসা কেন? ফোনে ফোনে প্রেমিকার শরীরের সঙ্গে নিজের শরীর মিলিয়ে দেওয়া কেন? সঙ্গমের বই পাঠানো কেন? ভালবাসলেও এভাবে শরীরের স্পর্শ আদায় করার প্রয়োজন হয় না। এমনিতেই পাওয়া যায়। আমার ডাউট ডট কম আমাকে ঠিক কথাই বলেছে—লোকটি একটি ওম্যানইজার।

অনিন্দিতা একটা মেসেজ স্টিকার পাঠিয়েছে। তাতে সুতপার কথারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে—একটু অন্যভাবে, ''যদি আপনার ছেলে বন্ধু আপনার শরীর চায় তাহলে তার হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলুন, এই টাকায় বেশ্যাপাড়ায় গিয়ে নিজের চাহিদা পূরণ করো। আমি বেশ্যা নই। ভালবাসা মনকে প্রাধান্য দেয়। যে আপনাকে বৈধভাবে পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে না তার হাত ছেড়ে দিন।''

—কিন্তু হাতটা তো সে-ই ছেড়েছে।

—কারণ সে বুঝে গিয়েছিল যতটুকু পাওয়া ওই ফোনেই। সামনাসামনি আর কিছুই তোর কাছ থেকে আদায় করা সম্ভব হবে না। এখন নিশ্চয় সে আরেকজনকে ভালবাসার শিক্ষা দিচ্ছে।

—পরস্ত্রী পরপুরুষের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক তো অবৈধ নয়।

—অবৈধ না হলেও সম্মানীয়ই বা কোথায়!

রিলি হেসেছে, ''বলেছিলাম কিনা সব সন্দীপগুলোই...!''

—তোমার সন্দীপের খবর কি?

—সে ওখানে জব নিয়ে নিয়েছে।

—তার মানে ইন্ডিয়াতে আসবে না?

—না। ওর ইন্ডিয়া ভালো লাগে না। বাই দ্য ওয়ে আমি নেক্সট ইয়ার কানাডাতে যাচ্ছি। এম টেক করতে।

একমাত্র তাপসদা চুপ ছিলেন। হয়ত ভেবেছেন আপদ গেছে, এবার তাহলে ওনার সঙ্গে আমার প্রেমটা জমে উঠবে।

অনিন্দিতা আমায় ফোনও করেছে, ''সরি।'' অসম্ভব ঠাণ্ডা গলা।

''কেন?''

''আমিই তোকে মোটিভেট করেছিলাম। খুব চেয়েছিলাম তোদের সম্পর্কটা দাঁড়িয়ে যাক। জানি পুরুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এমনই হয়, যতক্ষণ পায় ততক্ষণ জেনেশুনে অন্ধ হয়ে থাকে, বৈষম্য চোখে পড়ে না। তবু ভেবেছিলাম এই মালটা আই আই টি থেকে নিশ্চয় কিছুটা মার্জিত হয়ে এসেছে।''

কি বলব ভেবে পাই না।

''বুঝতে পারছি না মালের প্রতি তোর এখনও কতটা দুর্বলতা আছে। যদি অনুমতি দিস তাহলে কিছু বলব।''

''আরে বল না।''

''মনে হচ্ছে মালটার মধ্যে সাইকোপাথিক ট্রেইট আছে। যাদের মধ্যে এই ট্রেইট থাকে তারা, তুমি প্রথম সাক্ষাতে কি করতে চাও, অথবা যে কোন সম্পর্কে তুমি কোন জিনিসটাকে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করো ইত্যাদি প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের প্রেক্ষাপট তৈরি করে। সন্দীপের মতো। স্থায়ী সম্পর্ক তাদের আসল লক্ষ্য নয়। তাদের মনের ভালবাসার চাহিদা থাকে না, ভুলের জন্য গভীর আফসোস থাকে না, তারা অন্যকে কষ্ট দিয়ে কষ্ট পায় না, শুধু সেক্সের জন্য সঙ্গী খোঁজে এবং ক্ষণিকের সম্পর্ক নিয়েই খুশি থাকে। অনেক ক্ষেত্রে তারা মহিলা পেয়েও যায়, কারণ তাদের মধ্যে মহিলাদের আকর্ষণ করার ক্ষমতা বেশি।''

সোনালির বান্ধবী বিজয়া একটা বিশাল বড় সুখবর তৈরি করে। সে মানবের প্রতি আর কোন দুর্বলতা অনুভব করছে না। মানব কলকাতায় থাকে। বিবাহিত তবু এতবছর ধরে মোবাইল নামক রিমোট কন্ট্রোলটি দ্বারা বিজয়ার মন জয় করে রেখেছিল সে।

বিগত কুড়ি বাইশ বছর মোবাইল ফোন শুধুমাত্র যে যুবক-যুবতীর প্রেম বৃক্ষের গোড়ায় সার জুগিয়েছে তা নয়। মধ্যবয়সী পুরুষ-মহিলা এমনকি বুড়ো-বুড়ি সবার উপরই করুণা বর্ষণ হয়েছে মোবাইলের। দুনিয়া অনেক পাল্টে গেছে। আগে ইচ্ছে থাকলেও অনেক সময়ই উপায় থাকত না। এখন ইচ্ছে আছে তো উপায়ও আছে। স্মার্টফোনের ওজোন ১৯৭৩ সালের ৩রা এপ্রিল মার্টিন কুপারের ব্যবহৃত সর্বপ্রথম মোবাইলের মতো দুই কেজি নয় যে বুড়ো-বুড়ি সেগুলোকে উঠিয়ে কানে ধরার বা চোখের সামনে রাখার ক্ষমতা রাখবে না। ২০১৯-এর মার্চে দেশে মোট টেলিফোন সাবসক্রাইবারের সংখ্যা মোটামুটিভাবে ১.১৮ বিলিয়ন, মোবাইল সাবসক্রাইবারের সংখ্যা ১.১৬ বিলিয়ন। গ্রামে টেলিডেনসিটি ৫৬.৭৪ শতাংশ। শহরে টেলিডেনসিটি

১৬০.৭৯ শতাংশ—গ্রামের প্রায় তিন গুণ। শহরের পুরুষেরা বেশি আধুনিক, সেসব পুরুষের ন্যায় কিছু আধুনিক মহিলাকে ছেড়ে দিলে শহরের মহিলারা পুরুষদের আধুনিকতার বেশি শিকার।

শুধু ভয়েস কলে যখন মন ভরত না তখন মানবও বিজয়াকে বলত, শাড়ি খোলো, পেটিকোট খোলো, ব্লাউজ খোলো, ব্রা খোলো, আমাকে দেখাও। বিজয়া সব খুলে বসে থাকত আর মানব দেখে দেখে মাস্টারবেট করত। বিজয়া এটা ভেবে সুখী হত যে ওকে জীবনসঙ্গী না বানাতে পারার পেছনে মানবের নিশ্চয় কোন মজবুরি ছিল এবং তার জন্য মানব নিজেও অনেক যন্ত্রণায় আছে। তাই বিয়ের পর একটি মাসের জন্যও তাকে ভুলে থাকতে পারেনি। বউ ঘরে রেখে তার সম্মানটা আসলে সে বিজয়াকেই দিচ্ছে। বিজয়া কষ্টও পেত যখন দেখত মাস্টারবেশনের পরে বেশ কয়েকদিন মানব বিজয়ার ফোন রিসিভ করছে না। এমন সুখ-দুঃখের দোলনায় দুলতে দুলতে শেষপর্যন্ত বিজয়ার সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হল। বুঝতে পারল যে মানব তাঁকে শুধুমাত্র তার সেক্সের প্রয়োজনেই ব্যবহার করছে। তবু সে মানবকে ছাড়তে পারত না, মনের ভালবাসা এমনই জিনিস।

কয়েকদিন পরে বিজয়ার মানবের প্রতি দুর্বলতা অতিক্রম করার কারণটা জানতে পারি। ওর সঙ্গে সি এম-এর পরিচয় হয়েছে। সি এম মানে চিফ মিনিস্টার নয়—চন্দ্রকান্ত মালাকার। বিজয়া তার মহানুভবতায় মুগ্ধ। চন্দ্রকান্ত স্ত্রীর সঙ্গে পাকা বন্ধনে বাঁধা। কিন্তু অন্য মহিলাদেরও দয়া করে বেড়ান। দয়া অর্থ দিয়ে শুরু হয়, শেষ হয় অন্য কিছুতে। ব্লাউজ সেলাই করে আয় হয় বিজয়ার। সাজপোশাক মন্দ নয়। তবু নাকি তার টাকার সমস্যা। চন্দ্রকান্ত সেটা বুঝেছেন এবং দু'হাত বাড়িয়ে তাকে সাহায্য করতে এসেছেন। হাত প্রসারিত হতে হতে বিজয়ার শরীর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। মনের ভালবাসার কাছে হেরে গিয়ে সেই হাতকে গ্রহণও করে নিয়েছে বিজয়া।

অনিন্দিতা বলে, ''এই সব লোক বুঝতে পারে না যে এরা শুধু মেয়েদেরকেই ঠকাচ্ছে না, নিজেদেরকেও ঠকাচ্ছে। যাকগে, ওটাকে ভুলে যা। পরের বার থেকে এধরনের কথা বললে শুরুতেই বাতিল।''

''এত জ্ঞান কোথায় থেকে অর্জন করলি?''

''আমি ইন্টারনেট ঘেঁটে ঠিক বের করে নিয়েছি মালের ভেতরের মালমশলা।''

''মেয়েদের মধ্যেও এই ট্রেইট আছে।''

''পড়িনি। হতেই পারে...তবে আমার মনে হয় না মেয়েদের সংখ্যাটা এত বেশি হবে। তোকে আমাকে দিয়েই বিচার কর না।''

*****

অনিন্দিতার চাপে পড়ে ম্যাট্রিমোনির মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করি, ''আপনাদের টিল ইউ ম্যারি'র প্ল্যানটা বলুন।''

''টিল ইউ ম্যারির প্ল্যানটা আসলে এক বছরের।''

''আপনারা তেমন কিছু লেখেননি তো!''

''দেখুন ম্যাডাম, কোন মেম্বার যদি দশ বছর পর্যন্ত বিয়ে না করে তাহলে আমরা তো আর দশ বছর ধরে কোন টাকাপয়সা না নিয়ে তাকে ছেলে বা মেয়ের প্রোফাইল সাপ্লাই দিতে পারি না...''

''কত পে করতে হবে এক বছরের জন্য?''

''নতুন মেম্বারের কাছ থেকে এক বছরের জন্য আমরা দশ হাজার ন'শো টাকা চার্জ করি। কিন্তু আপনি নয় হাজার ন'শো দিলেই হবে।''

শ্রীগোপালকে আমি নিজেই ফোন করেছিলাম। আমার জানার ছিল উনি কতদিনের জন্য মেম্বারশিপ নিয়েছেন। উনি বললেন, ''ছয় মাসের জন্য নিয়েছিলাম ম্যাডাম। ছয় মাসে ওরা আমার টাকা খেয়ে আমাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। এখন আমার মেম্বারশিপ এমনি পড়ে আছে। আমি তো কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি না। কোন মেয়ে যদি নিজে থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাহলেই কথা বলতে পারি। এই যেমন আপনি করলেন।''

আমি ফোন করাতে শ্রীগোপাল একেবারে স্বচ্ছন্দ্যে আমাকে প্রশ্ন করেন, ''কি সিদ্ধান্ত তাহলে নিলেন ম্যাডাম?'

''কি নিয়ে?''

''আমাকে বিয়ের ব্যাপারে?''

''কেন? আপনার তনিমা সান্যালের কি হল?''

''ওঁকে দিয়ে হবে না ম্যাডাম। আচ্ছা বলুন তো, যেই মহিলাটি ঘরেই থাকেন না তাঁকে নিয়ে আমি সংসার করব কি করে?''

''আর দমদমের মেয়েটি?''

''খুব রগচটা। অবশ্য সুন্দরী মহিলাদের রাগ একটু বেশিই থাকে। সেটাও আমি মেনে নিতাম কিন্তু উনি তো এখনও মনস্থিরই করতে পারেননি। আমি মাঝখানে দু'দিনের জন্য কলকাতায় গিয়ে দু'জনের সঙ্গে দেখা করে এসেছি।''

''এদিকে আমাকে না দেখেই ঠিক করে ফেলেছেন। আমি রাজি থাকলে আপনিও কোন আপত্তি করবেন না? বেশ তো!''

''দেখেও অনেককে চিনলাম, না দেখেও চিনলাম। কাজেই এখন আর দেখাতে না গিয়ে কথাবার্তার ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছি...''

''না দেখে কাকে চিনলেন? আমাকে?

''আপনাকে চিনেছি, আরেকজনকেও চিনেছি?''

''আরেকজন?''

''হ্যাঁ ম্যাডাম। আপনাকে বলেছিলাম না যে আমার ইউ এস এতে যাওয়ার কথা। ওটা আসলে মেয়ে দেখার জন্যই ছিল। গতকাল থেকে মনটা খুব খারাপ জানেন? অনেক আশা ছিল মেয়েটির ওপর। কিন্তু সে খুব আহত করেছে আমাকে। গতকাল ফোন করে বলেছে ওকে পাঁচ লাখ টাকা পাঠাতে হবে। মেয়েটি বাঙালিই কিন্তু এত যে নিচু মনের আমি তা এতদিন ধরে নিয়মিত কথা বলেও বুঝতে পারিনি। আচ্ছা সে আমার কে বলুন তো? শুধুমাত্র বিয়ের কথা হচ্ছিল। বিয়ে তো হয়নি। কোন অধিকারে আমার কাছ থেকে সে টাকা চায়!''

—যেই অধিকারে আপনারা বিয়ের কথাতেই মেয়েদের কাছ থেকে তাদের শরীর চান, তাদের পা টিপে দেবেন বলেন সেই অধিকারে।

—আমি তো আপনার সেবা করার কথাই বলেছি।

—হলই বা। পায়ে হাত না দিলে পা টেপা যায় না। পাটা শরীরেরই একটা অংশ। একদিনের পরিচয়েই একজন পুরুষের মুখ থেকে এসব কথা শুনলে আমার খুশি হওয়া উচিত কি? বিয়ে শব্দটা কানে গেলেই মহিলার গায়ে হাত দেওয়ার লোভ সামলানো যায় না তাই না? আপনার তো অনেক টাকা। আমি নাই-বা চাইলাম, আপনি কি একবারও বলেছেন 'আপনার নামে বাড়ি করে দেব, গাড়ি করে দেব। আপনার কোনই আর্থিক সমস্যা হতে দেব না?' হিসেব তাহলে সমান সমান হয়ে গেল। বিয়ের কথায় পুরুষ মহিলাদের শরীর নিয়ে টানাটানি করে এবং মেয়েরা ছেলেদের টাকা নিয়ে টানাটানি করে।

''চুপ করে গেলেন যে! কিছু ভাবছেন ম্যাডাম? বলুন না বিয়ে করবেন আমাকে?''

''এই মুহূর্তে কিছু বলতে পারছি না।''

শ্রীগোপালের সঙ্গে আমি নিজের ব্যাপারে একদমই আগ্রহী ছিলাম না। কারণ শুধু তাঁর চেহারায় বয়সের ছাপই আমার অপছন্দ নয়, তাঁর নামটিও অপছন্দ। শ্রীগোপালের কাছে আমার চেয়ে বেশি টাকা থাকতে পারে, সম্পর্কের ব্যাপারে লোকটি বিশ্বাসযোগ্য হতে পারেন অর্থাৎ এখন উনি ম্যাট্রিমোনির বাজারে পা রেখে একশোটা মেয়ে নিয়ে ভিরমি খেলেও বিয়ের পর শুধরে যেতেই পারেন কিন্তু লোকটির সঙ্গে একদিন কথা বলেই বুঝেছি তাঁর মধ্যে সেই ব্যক্তিত্বের ছিটেফোঁটা নেই যেই ব্যক্তিত্ব আমার পছন্দ।

অনিন্দিতা জিজ্ঞেস করে, ''আর কোন শ্রীকে পেলি না?''

''পেয়েছিলাম কয়েকটা। তোকে বলা হয়নি। একজনের নাম ছিল শ্রীমান। দেখতে মোটামুটি। মুম্বাই আই আই টি থেকে পাশ করা, আসানসোলে থাকে, বিশাল ব্যবসা, বছরে চার কোটি আয়। তিনদিনেই কেটে গেছে।''

''কেন?''

''লোকটি বড় চিরচিরে। নিজেকে নিয়ে কোনকিছুই ঠিকঠাক বলতে চায় না।''

''আর?''

''শ্রীধর। সুদর্শন পুরুষ। নাগপুরে থাকে, তারও ব্যবসা, তারও বিশাল আয়। এর সঙ্গে এক সপ্তাহ টিকেছিল।''

''কাটল কেন?''

''যখন তখন ফটো পাঠাতে বলত। ফটো দেখে রূপের তারিফ করত। আর আমি থ্যাঙ্ক ইউ না বললে রেগে যেত।''

''আর?''

''শ্রীকুমার। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ পি এইচ ডি, দুর্গাপুরে একটি সরকারি কলেজে পড়ায়, দু'লাখ টাকা মাইনে।''

''সে কি অপরাধ করল?''

''লোকটি বড্ড কালো। তাতেও হয়ত আমার বিশেষ অসম্মতি থাকত না। কিন্তু

বড্ড বেশি কথা বলে।"

"আর?"

"আর একজন পুনেতেই থাকে? তার সঙ্গে আমি দেখাও করেছিলাম।"

"আরে বাহ্! কি হল তার সঙ্গে?"

"বয়স পঁয়ষট্টি। ভালো ক্লাসিকাল গান গায়। যোগা টিচার। ম্যাট্রিমোনি থেকেই আলাপ হয়েছিল। তবু আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম যে আপাতত গান এবং যোগা নিয়ে আলোচনার জন্যই আমাদের দেখা হবে। আমি তাকে সন্দীপের কথাও বলেছিলাম। বলেছিলাম সন্দীপ আমাকে মানসিকভাবে অসুস্থ বলেছে। শুনে লোকটি জিজ্ঞেস করেছে, কেন? তুমি তার সঙ্গে এক বিছানায় থাকতে চাওনি বলে?"

"এই মালটা সভ্য মনে হচ্ছে..."

"না কথাশেষে সে আমার গালে চুমু খেয়ে দ্রুতগতিতে হেঁটে পালিয়ে গেছে। আমি তাকে চড় মারারও সুযোগ পাইনি।"

"ম্যাট্রিমোনি থেকে ডিলিট মার তোর নাম।"

"কেন?"

"বুঝতে পেরেছি না তুই কাউকে পাবি, না আমি কাউকে পাব। আমার মেয়েকে একটা চাকরি পেতে দে। দু'জন একসঙ্গে থাকব। কাটিয়ে দেব বার্ধক্য।"